পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

গবেষণা শিরোনাম

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন (১৯৪৭-২০০০) : একটি পর্যালোচনা।

The Reflection of Islamic Ideologies on the National Education Policy of Bangladesh (1947-2000): An Analysis

466243

Dhaka University Library
466243

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দিন
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গবেষক
মুহাম্মদ আমান উদ্দীন মুজাহিদ
রেজি নং-১১৪
শিক্ষাবর্ষ:২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন (১৯৪৭-২০০০) : একটি পর্যালোচনা ।

The Reflection of Islamic Ideologies on the National Education Policy of Bangladesh (1947-2000): An Analysis

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত
পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ ২০১২

466243

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দিন
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মুহাম্মদ আমান উদ্দীন মুজাহিদ
রেজি নং-১১৪
শিক্ষাবর্ষ:২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মুহাম্মদ আমান উদ্দীন মুজাহিদ কর্তৃক দাখিলকৃত "বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন (১৯৪৭-২০০০): একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোথায়ও এবং কোন ভাষাতে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

466243

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

২৬/১১/১২

ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দিন
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন (১৯৪৭-২০০০): একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম যা **প্রফেসর ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দিন**, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি ইতঃপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী লাভ করার বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করা হয়নি।

২৬।০২।১২

মুহাম্মদ আমান উদ্দীন মুজাহিদ
রেজি নং-১১৪
শিক্ষাবর্ষ:২০০৯-২০১০
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যার অশেষ মেহেরবানীতে এ অভিসন্দর্ভটি লেখা সম্ভব হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রফেসর ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দীন স্যারের প্রতি। আল্লাহর মেহেরবানী, স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ছাড়া এ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। (আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দীন স্যার কর্তৃক গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণ ও এর যাবতীয় বিষয়ে গাইড লাইন না পেলে গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করা ছিল সত্যিই খুব দুরূহ)।

গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে শুরু থেকে আমাকে যাঁরা সহযোগিতা করে ও উৎসাহ যুগিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের সবার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গবেষণা কাজে ব্যবহৃত লাইব্রেরী এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী, বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার, এডাব লাইব্রেরী, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামী ব্যাংক শরিয়াহ কাউন্সিল লাইব্রেরী।

আমি কৃতজ্ঞ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন-এর কাছে যারা আমাকে গবেষণা বৃত্তি প্রদান করেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ,সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি, যাদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র ভিত্তিক মতামত গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহকালে সারা দেশের বহু সংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাকে প্রশ্ন উত্তর ও লিখিত মতামত প্রদান করে উৎসাহ, পরামর্শ দিয়ে নানাবিধ সহযোগিতা প্রদান করেছেন, যাদের প্রত্যেকের নাম এ ক্ষুদ্র পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমি তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার পরিবার পরিজনের কাছে যারা কেবলমাত্র আমার গবেষণা কর্মের স্বার্থে নানা ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাদের ত্যাগ ও সহযোগিতা না পেলে গবেষণার এ কাজে পা বাড়ানো আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না। যার কথা বিশেষ ভাবে না বললেই নয় যিনি সর্বক্ষন আমার গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করেছেন আমার জীবন সঙ্গীনি আসমা চৌধুরী।

সর্বোপরি মহান আল্লাহ্র অসীম রহমতের জন্য শুকরিয়া আদায় করে সবার জন্য দোয়া করছি যারা আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন, আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা	১০
প্রথম অধ্যায়	১২
প্রাচীন বাংলার পারিচিতি	১২
বাংলাদেশ পরিচিতি এবং বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষানীতি	২২
বাংলাদেশের অভ্যুদয়	২২
বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও সীমানা	২২
ভৌগলিক পরিচিতি	২৩
অবস্থান	২৩
বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা	২৪
ভূ-প্রকৃতি	২৪
সীমানা	২৪
বাংলাদেশের শিক্ষানীতির পরিচয় ও প্রেক্ষাপট	২৫
শিক্ষানীতির পরিচয় এবং বাংলাদেশের শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক	২৭
শিক্ষানীতি কি	২৭
বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি	২৮
শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের বিপর্যয় ও হিন্দু-উত্থান	৩১
শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য	৩২
বাংলাদেশের শিক্ষা সংকটের উৎস	৩২
বিরাজমান সংকটের স্বরূপ	৩৩
বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য	৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৭
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার পরিচয়	৩৭
শিক্ষার পরিচয়	৩৭
শিক্ষার সাধারণ বিশ্লেষণ	৩৭
মানবতার কল্যাণ সাধনই প্রকৃত শিক্ষা	৩৭
শিক্ষার শব্দগত বিশ্লেষণ	৩৯
শিক্ষার পারিভাষিক বিশ্লেষণ	৪০
শিক্ষার ব্যাপক অর্থ	৪১
শিক্ষা সম্পর্কে পাশ্চাত্য মতাদর্শ	৪২
শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের মতামত	৪৩
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪৫
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার বিশ্লেষণ	৪৬
শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক ধারণা	৪৭
শিক্ষার কাজ	৪৭
শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা	৪৮
শিক্ষার লক্ষ্য কি?	৪৮
শিক্ষার সর্বজনীন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪৯
ইসলামী শিক্ষা	৫০
ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ভূমিকা	৫৩
ইসলামী শিক্ষা এবং আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষার মধ্যে তুলনা	৫৪
ইতিহাস সাক্ষী	৫৪
ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য	৫৬
কুরআনের আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য	৫৮
হাদিসের আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য	৬১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ৬৩
বিভিন্ন সময়ের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ৬৩
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর শিক্ষা বিস্তার ৬৩
খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের শিক্ষাব্যবস্থা ৬৩
মুয়াবিয়া (৬৬১-৬৮০) ৬৫
ইয়াজিদ (৬৮০-৬৮৩) ৬৫
দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (৬৮৩-৬৮৪) ৬৫
মারওয়ান (৬৮৪-৬৮৫) ৬৫
আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫) ৬৫
ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রিঃ) ৬৬
সোলায়মান (৭১৫-১৭ খৃঃ) ৬৬
দ্বিতীয় ওমর (৭১৭-৭২০) ৬৬
হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রিঃ) ৬৬
দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪) ৬৭
দ্বিতীয় মারওয়ান (৭৪৪-৭৫০ খ্রিঃ) ৬৭
উমাইয়া যুগে শিক্ষাব্যবস্থা (৬৬১-৭৫০) ৬৭
Abbasids time (750-1258) ৬৯
আল-মনসুর (৭৫৪-৭৫৫) ৬৯
আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫) ৭০
খলিফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯) ৭০
আল-আমীন (৮০৯-৮১৩) ৭০
আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩) ৭০
পরবর্তী শাসকগণ (৮৩৩-১২৫০) ৭০
আব্বাসীয় আমলে শিক্ষাব্যবস্থা ৭০
মোগল আমলে ইসলামী শিক্ষা ৭২
ভারতীয় উপমহাদেশ ৭২

চতুর্থ অধ্যায় ৭৫
ধর্ম ও নৈতিকতাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৭৫
যুক্তরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অবস্থান ১০২
স্কটল্যান্ড ১০৪
নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ১০৫
ওয়েলস ১০৫
ইংল্যান্ড ১০৬
জাপানের বর্তমান পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষার উপাদানসমূহ ১০৭
স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে নৈতিক শিক্ষা ১০৮
নিজ সম্পর্কিত ১০৮
অন্যের সাথে সম্পর্কিত ১০৮
প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যের সাথে সম্পর্ক ১০৯
গোষ্ঠী এবং সমাজের সাথে সম্পর্ক ১০৯
প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা ১১০
বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে নৈতিক শিক্ষা ১১১
দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা ১১১
জাপানের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান ১১২
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়	১২২
বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা কমিশন	১২২
হান্টার কমিশন রিপোর্ট (১৮৮২)	১২২
ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯০২ খৃ.	১২২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, ১৯১২	১২৩
হার্লে কমিটি ১৯১৫ খৃঃ	১২৫
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (স্যাডলা) কমিশন, ১৯১৯ খৃ.	১২৫
শামসুল হুদা কমিটি, ১৯২১ খৃ.	১২৬
হার্টোগ কমিটি রিপোর্ট, ১৯২৯ খৃ.	১২৭
সাইমন রয়েল কমিশন	১২৮
মুসলিম এডুকেশন এডভাইজরি (মোমিন) কমিটি, ১৯৩১-৩৪ খৃ.	১২৮
উড-এ্যাবোর্ট রিপোর্ট, ১৯৩৭ খৃ.	১২৯
ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা (জাকির হোসেন) কমিটি, ১৯৩৭ খৃ.	১৩০
মাদ্রাসা শিক্ষা (মওলা বখ্শ) কমিটি, ১৯৪১ খৃ.	১৩০
যুদ্ধোত্তর ভারতে শিক্ষা উন্নয়ন (সার্জেন্ট প্রকল্প), ১৯৪৪ খৃ.	১৩২
প্রাক-স্বাধীনতা শিক্ষা সংস্কার (১৯৪৭-১৯৭১)	১৩২
বৃটিশ শাসনোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা (১৯৪৭-১৯৭১খৃ.)	১৩২
মাদ্রাসা সিলেবাস (সৈয়দ মুয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন) কমিটি, ১৯৪৭খৃ.	১৩২
পাকিস্তান আমলে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি পুনর্গঠন (মুহাম্মদ আকরাম খান) কমিটি, ১৯৪৯-৫১	১৩৪
পূর্ববঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা উপদেষ্টা (আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী) কমিটি রিপোর্ট-১৯৫৬ খৃ.	১৩৫
পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার (আতাউর রহমান খান) কমিশন, ১৯৫৭	১৩৬
জাতীয় শিক্ষা (এস.এম. শরীফ) কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫৯ খৃ.	১৩৭
ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, ১৯৬৩-৬৪ খৃ	১৪১
ছাত্র-সমস্যা ও কল্যাণ সম্পর্কীয় (হামুদুর রহমান) কমিশন রিপোর্ট, ১৯৬৬ খৃ.	১৪২
পাকিস্তানের নতুন (এয়ার ভাইস মার্শাল এম.নূর খান) শিক্ষানীতি, ১৯৬৯ খৃ.	১৪৩
পাকিস্তান সরকারের নতুন (শামসুল হক কমিটি) শিক্ষানীতি, ১৯৭০ খৃ.	১৪৫
স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন (১৯৭১-২০০০)	১৪৬
কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট, মে, ১৯৭৪ খৃ.	১৪৬
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, ১৯৭৬ খৃ.	১৪৯
ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম (ডঃ এম. এ. বারী) কমিটি, ১৯৭৭ খৃ.	১৫১
অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি, ১৯৭৯ (জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ)	১৫৩
বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা (মফিজ উদ্দিন) কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ	১৫৬
মাদ্রাসা শিক্ষা (ডঃ এম.এ.বারী) কমিটি, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ	১৫৯
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭	১৬১
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০	১৬৯
শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০০২	১৭৩
জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩	১৭৬
জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০	১৭৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	১৮৬
মতামত জরিপ ও ফলাফল	১৮৬
শিক্ষানীতি কেমন হওয়া উচিত?এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এর ছাত্র শিক্ষক ও বিশিষ্ট জনদের লিখিত মতামত	১৯০

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়	২০১
শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যসূচিতে ধর্ম তথা নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা	২০১
মাধ্যমিক সিলেবাস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	২০৮
উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাস , উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-২০০৯	২১০
অষ্টম অধ্যায়	২১৫
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা	২১৫
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	২১৫
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা:	২১৫
প্রাথমিক শিক্ষা:	২১৫
মাধ্যমিক শিক্ষা:	২১৬
বৃত্তিমূলক শিক্ষা	২১৬
ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা	২১৬
মাদ্রাসা শিক্ষা	২১৬
শিক্ষক শিক্ষণ	২১৭
উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা	২১৭
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক	২১৮
পরিবেশ রচনা	২১৮
জনমত গঠন	২১৯
মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা	২১৯
প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো:	২১৯
প্রশিক্ষিত শিক্ষকমন্ডলী	২১৯
বর্তমান অবস্থায় কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণ	২১৯
চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা	২১৯
প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা:	২২৩
সহায়ক গ্রন্থাবলী	২২৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় গোটাজাতি সত্ত্বার কাঠামো। যেকোন জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নতি-অগ্রগতি নির্ভর করে ঐ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। জাতির আশা-আকাঙ্খা মূল্যবোধ ঐতিহ্যের আলোকে গড়ে ওঠে একটা দেশের শিক্ষানীতি। কেননা জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণ, জাতীয় আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কার্যকর নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তি তৈরি করাই হলো শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য।

মুসলিম দেশের শিক্ষানীতির মূলনীতি বা রূপরেখা কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে Organization of -Islamic Conferenceএর তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে (২৫-২৮ জানুয়ারি ১৯৮১) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণ মতৈক্যে উপনীত হন। এগুলো হল-

(ক) মুসলিম সংস্কৃতিকে সু-সংহত করা।
(খ) নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটিয়ে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করা।
(গ) ইসলামী নীতি ও আদর্শকে মুসলিম জাহান তথা সারা বিশ্বে প্রচার করা।[১]

মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে একটি শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রাণ অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর নিকট সমাদৃত। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের কাংঙ্খিত স্বাধীনতা। দুঃখজনক হলেও সত্য স্বাধীনতার দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছরেও আমাদের দেশের একটা স্থায়ী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। সম্প্রতি বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ নামে একটি শিক্ষানীতি প্রনয়ণ করেছে।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত যে সকল শিক্ষা কমিশন গঠন হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট, মে, ১৯৭২।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রনয়ণ কমিটির রিপোর্ট,১৯৭৬ইং।
- ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্কিম (ড. এম.এ. বারী) কমিটি, ১৯৭৭ইং।
- অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি, ১৯৭৯ (জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ)।
- ড. আব্দুল মজিদ খান রিপোর্ট,১৯৮৩ইং।
- বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা (মফিজ উদ্দীন) কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৮ইং।
- মাদরাসা শিক্ষা (ড. এম.এ. বারী) কমিটি ১৯৮৯ খ্রিঃ।
- জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (প্রফেসর এম. শামসুল হক) ১৯৯৭ইং।
- জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০০।
- শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি, জুলাই-২০০২।
- জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ (প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে)।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০।

এ যাবৎ কাল বিশেষভাবে (১৯৪৭-২০০০) পর্যন্ত যে সকল শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে তার রিপোর্টে ইসলামী নীতি ও আদর্শের তথা ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতিফলন কতটুকু আছে এবং শিক্ষানীতি প্রণয়নে ধর্ম ও নৈতিকতার সমন্বয় কীভাবে করা যায় সে সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রদানই গবেষণার উদ্দেশ্য।

আমরা মনে করি, যে জাতির শিক্ষাব্যবস্থা তাদের বিশ্বাসের সাথে সংগতিবিহীন, সে জাতি কখনও সৃজনশীল কর্মক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না; জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে না। ফলে নিজের অজান্তেই তাদের স্বকীয়তা জাতিসত্ত্বা ও নৈতিকতা লোপ পেতে থাকে। এ থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

---

[1]Declaration of the 3rd Summit Conference of the Muslim Heads of States held in Holy City of Makkah, Saudi Arabia, Organize by the organization of Islamic Conference (25-28 January 1981)|

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণায় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টসমূহে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা-সম্পর্কিত যে সমস্ত সুপারিশ এসেছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত মতামত জরিপ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বের আলোকে সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।

প্রত্যেক শিক্ষাব্যবস্থারই একটি আদর্শিক ভিত্তি রয়েছে আর সে ভিত্তি হল ধর্ম। ধর্ম মানুষকে অনুশাসন দেয়, ধর্ম মানুষকে নির্ভরতা দেয়, ধর্ম মানুষকে আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করে অর্থাৎ মানুষ যে পৃথিবীতে জীবনযাপন করবে সেই জীবনযাপনের অধিকার সে ধর্ম থেকে অর্জন করবে। ধর্ম মানুষকে মানবিক হতে বলে, সংবেদনশীল হতে বলে। সব ধর্মই মানুষকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী শিক্ষা দেয়। আর সে কারণেই শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ, শের-ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে শতকরা প্রায় ৭৫% ছাত্র/ছাত্রী তারা তাদের শিক্ষাক্রমে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে চান। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটবৃন্দ সমাজ ও জাতির মেধাবী সন্তান সন্দেহ নেই। এ গ্রাজুয়েটবৃন্দই সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সামরিক বা বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ বা সমাজের অন্যান্য দায়িত্বশীল পদসমূহে প্রায়শই অনিয়ম দুর্নীতির কথা শোনা যায়। পাশাপাশি কিছু সৎ, যোগ্য মানবিক ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বের কথাও আলোচিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি ধর্ম ও নৈতিকতার উপাদানসমূহ বিদ্যমান থাকে এবং শিক্ষার সকল স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা যায় তাহলে আশা করা যায় আমাদের শিক্ষার্থীবৃন্দ অনেক বেশি সৎ, যোগ্য মানবিক ও দেশপ্রেমিক রূপে গড়ে ওঠবেন এবং দেশ ও জাতি তাদের নেতৃত্বের সুফল ভোগ করবেন।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি চূড়ান্ত হোক আমরা তা আশা করি। এ পর্যন্ত যতগুলো শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ইসলামী নীতি ও আদর্শ তথা ধর্ম বা নৈতিকতা প্রতিফলিত হয়েছে কিনা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ইতোপূর্বে এ বিষয়ে মৌলিক কোন কাজ হয়নি বলে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন (১৯৪৭-২০০০) একটি পর্যালোচনা বিষয়ে গবেষণা করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতির সকল স্তরে যদি ধর্ম ও নৈতিকতা শীর্ষক কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে এ গবেষণা সফল ও সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
প্রাচীন বাংলার পারিচিতি

সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বিশাল ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে বিধাতার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। ঐতিহাসিক যুগে তো বটেই প্রাক ঐতিহাসিক যুগেও বিধাতার অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ এদেশের প্রতি সকলের আর্কষণ ছিল। এই আকর্ষনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি দু'দিক থেকে এদেশের সহিত তাদের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছে।

১. ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে[২]
২. রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের মধ্য দিয়ে[৩]

ঐতিহাসিকদের মতে-এই দুটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই দ্রাবির, শক, হুন, আর্য, আরব, পাঠান, মোগল, এবং সর্বশেষ ইউরোপীয়, খ্রীষ্টানদের আগমন ঘটে এদেশে।

এদেশের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ভূমির উর্বরতা, স্বাস্থ্যের অনুকূল জলবায়ু এদেশের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রাচুর্য এবং অল্পায়াসে জীবিকার্জনের অগণিত সুযোগ সুবিধা আগুন্তক দিগকে এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আবহমান কাল হতেই প্রলুব্ধ করেছে এবং বিদেশী আগুন্তকদের মধ্যে সর্বশেষ আগত ইউরোপীয় খৃষ্টানরা ব্যতীত সকলে এদেশে স্থায়ী ভাবে তাদের বসতি স্থাপন করে এবং কালক্রমে এদেশেরই অধিবাসী হিসেবে পরিগণিত হয়। এদেশের জলবায়ু আচার ব্যবহার রীতি-নীতি তাদের দেহ ও মনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে যে আজ তাদের আলাদা করে চিনবার উপায় নেই[৪]। পক্ষান্তরে বিদেশাগত খৃষ্টানরা এদেশকে কখনও আপন করে নিতে পারেনি। শাসন শোষনের জন্য যতটুকু আবশ্যক তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক স্থাপনের কোন চেষ্টাও তারা করেনি যার ফলশ্রুতিতে শাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার বহুপূর্বেই তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন উঠে। পূর্ববর্তীদের অনুকরণে খ্রীষ্টানরা যদি এদেশকে আপন করে নিতো তা হলে এদেশের হিন্দু, মুসলামান, বৌদ্ধ, জৈন পারশীক ও শিখেরা সম্মিলিত ভাবে তাদের শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতো কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এই সংগ্রামের ফলশ্রুতি হলো ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি দেশের নতুন চিত্রায়ন বিশ্বের মান চিত্রে।[৫]

বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচয় যথার্থ ভাবে তুলে ধরার স্বার্থে নিম্নোক্ত ক্রমধারা অনুসরণ প্রয়োজন-

ক. বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান।
খ. বাংলা নামের উৎপত্তি ।
গ. বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক প্রকৃতি ও ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য।।
ঘ. বাংলাদেশের নদ-নদী ।
ঙ. বাংলাদেশের জনপদ।
চ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা।
ছ. বাংলাদশের জলবায়ু।
জ. বাংলাদেশের শিক্ষা।

---

[২] মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম (১৫৯৯-১৯৪৭), পৃষ্ঠাঃ ১৭, প্রকাশ-১ডিসেম্বর ১৯৬৯ প্রকাশক, নাসাস, ঢাকা।
[৩] প্রাগুক্ত-১৭
[৪] প্রাগুক্ত-১৯
[৫] প্রাগুক্ত-২০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এর আয়তন ১,৪৩,৯৯৮,৬০ বর্গ কি: মিটার বা ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল। বাংলাদেশ নদী বিধৌত এক দেশ। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত উপ-মহাদেশে অবস্থিত তিন দিক ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দেশ। আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর ৯০তম দেশ।[৬]

ভৌগোলিক অবস্থান

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ ২০°-৩০ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮° থেকে ৯২°-৫৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বাংলাদেশ উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি ও আসাম,পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গ ও বিহার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ দিকের বঙ্গোপসাগর বাদ দিলে বাংলাদেশের অপর তিনটি প্রান্ত ভারতের নানা রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ আসাম, উত্তর পূর্ব কোণ ঘেষে রয়েছে মায়ানমারের কিয়দংশ।

সীমানা

আজকে বাংলাদেশের সীমানা বলতে আমরা যা বুঝি, প্রাচীন যুগে সে সব এলাকা, বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। তবে মোটামুটিভাবে প্রাচীন বাংলার সীমানা এভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে: উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্রগ্রাম শৈল শ্রেণী এবং পশ্চিমে বিহারে রাজমহল পাহাড় ও কিলিঙ্গ। এ চতুর্সীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই প্রাচীন বাংলা নামে পরিচিত।[৭] স্বাধীনতা উত্তর কালে এর সীমানার তিন দিকেই ভারত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার , আসাম ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার (বার্মা), পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিবঙ্গ। আমাদের বাংলাদেশে স্বাধীনতার বয়স খুব কম হলেও এর অতীত ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। সে জন্য বাংলাদেশ নামটি কখনও পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ, কখনও বাংলা কখনও পাকিস্তান (পূর্ব) ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। তাই প্রায় আড়াইশ বছরের অতীত ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, নানা সংঘাত, বিবর্তন, উত্থান পতনের বেড়াজাল পেরিয়ে এদেশের আয়তন ও সীমা বার বার বদলেছে। এক সময় বাংলাদেশ বিহার উড়িষ্যা আসাম আর পশ্চিম বাংলা জুড়ে অবস্থিত ছিল।

১৯৪৭ খৃ. ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র দেশের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তান তৎকালীন পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ ছিল, যা পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। যদিও পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ১৮০০ কিলোমিটার। তবুও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা এতদূর থেকে এদেশটিকে শাসন করত (১৯৪৭-১৯৭১ খৃ.)। ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানে বাংলাদেশের সীমান্তরেখা স্থলভাগ ও সমুদ্র উপকূলসহ মোট ৩১৬১ মাইল। এর মধ্যে ভারতের সাথে এই সুদীর্ঘ সীমান্তের অধিকাংশই নদী বা পর্বতের দ্বারা বেষ্টিত হলেও প্রকৃত সীমান্ত রেখার বেশীর ভাগ অংশ কোন প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা চিহ্নিত নয়।[৮] ভূ-প্রকতিকগত অনুসারে এদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

ক.পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল;

খ.উপকূলীয় অঞ্চল ও

গ.নিম্ন গাঙ্গের অববাহিকা অঞ্চল।

---

[৬] আব্দুল মান্নান তালিব, **বাংলাদেশে ইসলাম,** (ইফাবা , ১৯৮০ খৃ.) পৃ. ১৫।

[৭] বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে। ১৯৭১ খৃ. মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষাণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন -১৯৭৪ এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লেখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লেখিত এলাকা, তদবহির্ভীত বাংলাদেশের সীমাভুক্ত হইতে পারে। **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান,** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কর্তৃক প্রকাশিতা, ১৯৯৯ খৃ (প্রথম ভাগ, প্রজাতন্ত্র অংশ দ্র.)।

[৮] মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, **বাংলাদেশের অর্থীনেতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল,** (ঢাকা-১৯৯৮ খৃ.) পৃ. ২২-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ক. পার্বত্য ও নিম্ন পাহাড়িয়া অঞ্চল ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়' সিলেটের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়, চট্টগ্রামের হুমাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরো পাহাড়িয়া অঞ্চল (বাংলাদেশের একদশমাংশ) সহ অন্যান্য পাহাড়িয়া অঞ্চল বুঝানো হয়।

খ. উপকূলীয় অঞ্চল বৃহত্তর খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টাগ্রাম জেলা নিয়ে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চল বুঝানো হয়। দেশের সীমান্তে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত বিধায় তীরবর্তী সকল জেলাই হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল। ছোট বড় অনেকগুলো দ্বীপ এ অঞ্চলেই অবস্থিত । ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, বোয়ালখালী, মহেশখালী, নিঝুম দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ বিশেষভাবে উলেল্যোগ্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমাহার এ অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য সুখ ও দুঃখের লীলাভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

গ. নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল দেশের উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলোর অধিকাংশ স্থান জুড়ে এ সমভূমি অবস্থিত । হিমালয় পর্বতমালা হতে নদীবাহীত পলল দ্বারাই এ অঞ্চল গঠিত । তিস্তা আত্রাই করতোয়া প্রভৃতি নদীবাহিত পলি জমা হয়ে এ ঢালু ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে এ অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার (১০০ফুট)। বর্ষাকালে এর সামন্য অংশ পানিতে প্লাবিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের ভূমিকে প্রকৃতগত ভাবে আরও কয়েকটি ভাগোভাগ করা যায়। যেমন, প্লাবন সমভূমি, বদ্বীপ, অঞ্চলীয় সমভূমি, সক্রিয় বদ্বীপ, মৃতপ্রায় বদ্বীপ, স্রোতজ সমভূমি ইত্যাদি। এসব অঞ্চল সমূহের মধ্যে বনাঞ্চলের পরিমাণ ৫লক্ষ ৫০হাজার একর । যা মোট ভূমির শতকরা ১৬.১২ ভাগের সমান। সুন্দরবন বাংলাদেশের বড় বনাঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ও অন্যান্য জেলায়ও অনুরূপ বনাঞ্চল রয়েছে।[৯]

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

বাংলাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ষোল কোটি।[১০] অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান, শতকরা ১৫ ভাগ হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনবসতি পূর্ণ দেশ। ভাষা 'বাংলা'। অধিবাসীদের অধিকাংশ কৃষিনির্ভর। সে অনুযায়ী অর্থনীতির মেরুদন্ড হচ্ছে কৃষি। জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৭৫৫জন। মাথাপিছু আয় ২৮৩ মার্কিন ডলার। মুসলিম বিশ্বে জনসংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় মুসলিম রাষ্ট্র। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশী। ১৯৬১ খৃ. থেকে ১৯৭৪ খৃ. এদেশের ২.৭০% হারে ১৯৭৪ খৃ. থেকে ১৯৮৪ খৃ. পর্যন্ত বার্ষিক ২.৩১ জন। তবে ১৯৯১ খৃ. বৃদ্ধির হার ২.০৬%।[১১]

বাংলাদেশের জলবায়ু

বাংলাদেশের গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল ঠান্ডা ও শুষ্ক। এখানকার জলবায়ু পুরোপুরি মৌসুমী। এদেশে ছয়টি ঋতু আছে। ঋতুগুলো হচ্ছে, গ্রীষ্ম, বর্ষা শরৎ হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫৪ সেন্টিমিটার (বর্ষাকাল) অন্যান্য ঋতুতে -২০৩ সেন্টিমিটার। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। স্থলভূমির শতকরা ২০ ভাগ নদী। ভারতের অধিকাংশ নদী বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি প্রবাহের মূল উৎসস্থল ভারতে । ভারত থেকে প্রবাহিত নদীগুলো বাংলাদেশে প্রবেশের পর নানা নামে নামকরণ করা হয়েছে। দক্ষিণের সাগরাভিমুখে প্রবাহিত বড় নদীগুলো হচ্ছে-পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফূলী। এছাড়া আরও অনেক নদী বিভিন্ন নামে প্রবাহমান আছে। ব্রহ্মপুত্র নদী ভারত থেকে ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করতে ১০০০ এক হাজার মাইল অতিক্রম করতে হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূবাঞ্চলের

---

[৯] মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, **অর্থনেতিক আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল,** (ঢাকা-১৯৯৪ খৃ.) খৃ. ৫৭।

[১০] আদমশুমারী রিপোর্ট ১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১০,৬৩,১৪,৯৯২ জন। তম্মধ্যে পুরুষ ৫,৪৭,২৮,৩৫০ জন, হমিলা ৫,১৫৮৬,৬৪২ জন। **বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরো,** (আদমশুমারী রির্পোট ১৯৯১ খৃ.) মে ১৯০৪ খৃ. প্রকাশিত।

[১১] ১৯৯৭ খৃ. বিশ্বের মুসলিম দেশ সমূহের জনসংখ্যা অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার লোকসংখ্যা ২০ কোনটি উর্দ্ধে, পাকিস্তানের জনসংখ্যা ১৪ কোনটি উর্দ্ধে এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৩ কোনটি উর্দ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

নদী-নদীর পরিমাণ বেশী।দেশে মোট ২০৩টি ছোট বড়-নদী রয়েছে। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাদেশকে তিন ভাগে করা যায় ।:-

১. লাল মাটিতে গঠিত প্রাচীন ভূমি;
২. পলি মাটিতে গঠিত মোটামুটি প্রাচীন ভূমি
৩. পলি মাটিতে গঠিত নিম্নভূমি ।[১২]

বাংলা নামের উৎপত্তি

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ, ভৌগোলিক সীমারেখা, শাসক গোষ্ঠী এবং জনসাধারণের সামাজিক সংস্কৃতির যে ইতিবৃত্ত জানা যায়, তাতে অতটা সুস্পস্টভাবে বাংলা বা বাংলাদেশ নামের উচ্চারণ দৃষ্ট হয়না ।[১৩] এ দেশে বসবাস করেছে ব্যঙ্গগোষ্ঠী, অষ্ট্রিকজাতি,মোংগল, দ্রাবির ভেডি বা ভেডি প্রতিম নামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। জাতিভেদে তারা শাসন কেরেছে অথবা শাসিত হয়েছে। প্রাক আর্য জাতির মধ্যে নিষাদ, কিরাত দ্রাবির জাতিপ্রাচীন বঙ্গে তাদেও সভ্যতা বিস্তার করেনি ।[১৪] বাংলা নামের উৎপত্তিগত আলোচনায় ইতিহাসবিদের মধ্যে সময়ের ব্যবধানে মতামতগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

* মোগলপূর্ব আমল
* মোগল আমল
* ইংরেজ শাসনামল

মোগলপূর্ব আমল

মোগলপূর্ব যুগে 'বাঙ্গালা' সমস্ত ভূখণ্ডের নাম সূচনা করতো কি? এই প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের সময় 'বাঙ্গালা' নামে একক কোন দেশ ছিল না। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস রচনার সময় 'বাঙ্গালা' নামের উল্লেখ করেন নি; বরং বরেন্দ্র, রাঢ় এবং বঙ্গ নামে বাংলার জ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লৌখনৌতি ও বঙ্গকে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন এবং যথাক্রমে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে বুঝিয়েছেন। বঙ্গের সাথে সমতট (সকনত)-এর উল্লেখও তিনি করেছেন ।মিনহাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বারণী সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সমগ্র দেশ নয়, এর অংশ বিশেষের উল্লেখ প্রসঙ্গে। পরবর্তী ঐতিহাসিক শামস্-ই-সিরাজ আফীফ সুলতান শাম্‌স-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ্‌কে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা', 'শাহ্-ই-বাঙ্গালিয়ান' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' রূপে আখ্যা দিয়েছেন।

সুলতান ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাংলায় একচ্ছত্র অধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর পূর্বে অন্য কোন মুসলমান শাসক দীর্ঘকাল বাংলার সমগ্র ভূখণ্ড শাসন করেছেন একথা জোর দিয়ে বলা যায় না ।তিনি অধিপত্য বিস্তার করেন এবং বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেন। এই স্বাধীনতা প্রায় দু'শো বছর ধরে অক্ষুণ্ন ছিল। তাই ইলিয়াস শাহ্ মুসলমান সুলতানদের মধ্যে প্রকৃত অর্থেই প্রথম 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' বা 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা' ।[১৫]

মোগল আমল

মোঘল সম্রাট আকবরের সভাসদ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল ফজল তাঁর আইনে আকবরী গ্রন্থে বাংলা নামটির উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মোগল আমলে এই ভূ-ভাগই 'সুবা বাঙ্গালা' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। আবুল ফজল এই প্রদেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে, অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে হুগলি জেলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০

---

[১২] মোঃ জাকারিয়া, **বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ**, (ঢাকা, ১৯৭২ খৃ) পৃ.-১৮ ও **মানচিত্রে কেমন আমার বাংলাদেশ**, বিশ্ব সাহিত্য ভবন (ঢাকা,১৯৭২ খৃ.) পৃ. ২৮।
[১৩] আহমেদ শরীফ, বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা ঃ বর্ণমিছিল,১৯৭৮ ইং) ১ম খন্ড,পৃ.১
[১৪] তোফায়েল আহমেদ,যুগে যুগে বাংলাদেশ (ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান,১৯৭৭ইং) পৃঃ১৪
[১৫] রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ডঃ এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃঃ ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এই সুবা পূর্বে ও উত্তরে পর্বতবেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে সুবা বিহার। কামরূপ ও আসাম সুবা বাঙ্গালার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। আবুল ফজল বাঙ্গালাহ নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ 'বাঙ্গালা'র আদি নাম ছিল 'বঙ্গ'। প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকান্ড আল নির্মাণ করতেন ; এ থেকেই বাঙ্গাল' বা বঙ্গালাহ' নামের উৎপত্তি। এ এলাকা কখনও কখনও অঞ্চল ভিত্তিতে নামধারণ করেছে। যেমন বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, পুন্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ়, গৌঢ় ইত্যাদি।[১৬]

নীহাররঞ্জন রায় অবশ্য আবুল ফজলের ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে বলেন। নদীমাতৃক বারীবহুল দেশে বন্যা ও জোয়ারের স্রোত রোধের জন্য ছোট বড় বাঁধ (আল্) নির্মাণ কৃষি ও বাস্তু ভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য। সুতরাং 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে 'আল্' যুক্ত হয়ে 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গাল' নামকরণ খানিকটা যুক্তিসঙ্গত।[১৭]

ইংরেজ শাসনামল

ইংরেজ শাসনকালের বেঙ্গল', যা ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রযুক্ত ছিল, উপরে আলোচিত ভূখণ্ডকেই বোঝাত। ইংরেজদের বেঙ্গল' অন্যান্য ইউরোপীয়দের(বিশেষ করে পর্তুগীজদের) বেঙ্গালা থেকেই নেয়া হয়েছে। এই নামটিই তার আধিপত্য বিস্তারের সময় পেয়েছিল বা এই ভূভাগ ইউরোপীয়দের কাছে এই নামেই পরিচিত ছিল। ষোল ও সতেরো শতকে ইউরোপীয়দের লেখনীতে বেঙ্গালা নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সীজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩-১৫৮১) 'বেঙ্গালা' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চাটিগানের ১২০ মাইল দুরে অবস্থিত 'সোন্দিব দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। ডুজারিক (১৫৯৯) প্রায় ২০০ লীগ উপকূল বিশিষ্ট 'বেঙ্গালা' দেশের উল্লেখ করেছেন। স্যামুয়েল পচার্স (১৬২৬)-এর বর্ণনায়ও বেঙ্গালা রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে। র‍্যালফ ফিচ (১৫৮৬) 'বেঙ্গালা' দেশে 'চাটিগান', 'সতগ্রাম' (সপ্তগ্রাম), 'হুগেলী'(হুগলি) এবং'তাণ্ডা (রাজমহলের নিকটবর্তী) শহরের উল্লেখ করেছেন। পূববর্তী ইউরোপী ভ্রমনকারীরা 'বেঙ্গলা/ বেঙ্গেলা/ বাঙ্গালা' রাজ্যও ঐ নামের একটি শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মার্কোপোলো (১৩ শতক)' ওভিংটন ,ব=ুভ (১৬৫০) এবং সসেন (১৬৫২) 'বেঙ্গালা'শহরের উল্লেখ করেন। রেনেল এই নামের শহরের উল্লেখ করেছেন কিন্তু এর অবস্থিতি সম্পর্কে নি:সন্দেহ ছিলেন না।

গ্যাষ্টলদি (১৫৬১) তাঁর মানচিত্রে চাটিগামের পশ্চিমে 'বেঙ্গালা'র অবস্থিতি দেখিয়েছিলেন । পর্তুগীজ ভাথেমা, বারবোসা (১৫১৪) বা জোয়াও দ্য ব্যারোসের (১৫৫০) বর্ণনায় 'বেঙ্গালা' রাজ্য ও বাঙ্গালা শহরের উল্লেখ রয়েছে। 'বেঙ্গালা' শহরের অবস্থিতি সম্পর্কে পন্ডিতবর্গের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও 'বেঙ্গালা' রাজ্য যে 'বাংলাদেশ অঞ্চলকে বোঝাত সে বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই।[১৮]

এছাড়াও ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, প্রাচীন কাল হতে বঙ্গ এবং বঙ্গাল দেশের নাম হতেই কালক্রমে সমগ্র দেশের বাংলা নামকরণ হয়েছে। বর্তমানকালে বাংলাদেশের অধিবাসিদেরকে যে 'বাঙ্গাল' নামে অভিহিত করা হয়, তা সেই প্রাচীন 'বঙ্গাল' দেশের স্মৃতিই বহন করছে।[১৯]

রিয়াদুস্ সালাতিন গ্রন্থ প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসায়েন সলীম তাঁর গ্রন্থে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিহাসে এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন।যেখানে তিনি সেমিটিক ভাষায় আল শব্দের অর্থ আওলাদ বা সন্তান সন্তুতি বা বংশধরকে কেন্দ্র করে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ অর্থে (বা+আল) বাঙ্গাল বা বঙল অর্থ্যাৎ বং এর আওলাদ বা বংশধর। শব্দের উৎপত্তিটাকেও হিসাবে আনা দরকার । হযরত নুহ (আ) এর যুগে যে মহা প্লাবন সৃষ্টি হয়, তাতে দুনিয়ার কাফিরকুল সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হযরত নুহ (আ) এর সাথে তাঁর অনুসারী মুষ্টিমেয় মুসলমানরা রক্ষা পেয়ে যান। পরবর্তী কালে তাদের সাহায্যেই পুনরায় দুনিয়ার বুকে মনুষ্য বসতি স্থাপনে

[১৬] প্রাগুক্ত
[১৭] প্রাগুক্ত
[১৮] প্রাগুক্ত
[১৯] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মনস্থ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রদের দিকে দিকে প্রেরণ করতে থাকেন। হামের প্রথম পুত্র 'হিন্দু, দ্বিতায়ী জনের নাম 'সিন্দ' তৃতীয় জনের নাম 'হাবাস'; চতুর্থ জনের নাম 'জানায', পঞ্চম জনের নাম বার্বার এবং ষষ্ঠ জনের নাম 'নিউবাহ' । যে সকল এলাকায় তারা জনবসতি স্থাপন করেন তাঁদের স্ব স্ব নামানুসারেই সে সব অঞ্চলের নামকরণ করা হয়। হিন্দের জৈষ্ঠ পুত্র ছিল 'পূরব'। তার বিয়ালি-শ জন পুত্র সন্তান ছিল। অল্প কালের মধ্যে এদের বংশ বৃদ্ধি পায় ও তারা বিভিন্ন দেশে বসতি গড়ে তোলেন। যখন তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে যায় যখন তাঁরা সমগ্র এলাকা পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নিযুক্ত করেন। হিন্দের পুত্র 'বং' (বঙ্গ) এর সন্তানেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। এই ধরে সুত্র 'বং' এর সঙ্গে আল্ যুক্ত করে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দটার উৎপত্তির বিষয়টি বাদ দেয়া যায় না । বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বা এর পূর্ব থেকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দেশটির অবস্থান ছিল সমুদ্রের নিকটবর্তী। হতে পারে এ দেশের অধিবাসী বঙ্গ এর যথার্থ আওলাদ বা বংশধর হওয়ার দাবীদার ছিল।[২০]

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আবুল ফজলের 'বাঙ্গালা' বা ইউরোপীয়দের 'বেঙ্গালা' তার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আগে, এমনকি মুসলমান-পূর্ব যুগে, এই ব্যাপক অর্থে 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা'র ব্যবহার পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে 'বঙ্গ' বা 'বঙ্গাল' দ্বারা বাংলার অংশবিশেষকে নির্দেশ করা হতো। তাই 'বাঙ্গালা' নামের প্রচলন ইলিয়াস শাহ্-এর সময় থেকেই শুরু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুকুমার সেন 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙ্গালা' বা বাঙ্গালাহ্'র উৎপত্তি হয়েছে, 'বাঙ্গালা' নামটি মুসলমান অধিকারকালে সৃষ্ট এবং ফারসি 'বাঙ্গালাহ্' থেকে পর্তুগীজ 'বেঙ্গালা' ও ইংরেজি 'বেঙ্গল' এসেছে বলে মত প্রকাশ করেন।

(ক) পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র

পুণ্ড্র/পৌণ্ড্র পূর্বাঞ্চলীয় জনপদসমূহের মধ্যে সুপ্রাচীন নাম। পুণ্ড্রদের আবাসস্থলই পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত হয়েছিল। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে উলি-খিত 'পুদ্নগল' (পুণ্ড্রনগর) ও বগুড়ার মহাস্থান যে অভিন্ন এবং পুণ্ড্রনগর যে পুণ্ড্রদের আবাসস্থল পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।পুন্ড্রবর্ধন বলতে, পশ্চিমে গঙ্গা (পদ্মা স্রোত) থেকে পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত ভূভাগই পুণ্ড্রবর্ধন। রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ অনেক সময় ভৌগলিক অস্তিত্বসমূহের পরিমণ্ডল বৃদ্ধি করেছে–এ সত্যের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত পুণ্ড্রবর্ধন।[২১]

পুণ্ড্রের সাথে সহ-অবস্থান করছে আর একটি প্রাচীন ভৌগোলিক সত্তাঃ বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' অভিধানে বরেন্দ্রী ও পুণ্ড্র অভিন্ন বলা হয়েছে। বেশ কয়েকটি লিপি-প্রমাণে একথা বলা যায় যে বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনেরই অংশবিশেষ। 'রামচরিত' কাব্যে পালদের 'জনকভু' বরেন্দ্রীর বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, এর দক্ষিণে ছিল গঙ্গা ও পূর্বে করতোয়া এবং 'পুণ্ড্রবর্ধনপুর' ছিল বরেন্দ্রের প্রধান নগর। মিনহাজের 'তাবকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে 'বারিন্দ্র' বলে (বরেন্দ্র) লখ্নৌতি রাজ্যের (মুসলমানদের প্রাথমিক সাম্রাজ্য নিঃসন্দেহে উত্তর বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) গঙ্গা-পূর্ববর্তী এলাকাকে নির্দেশ করা হয়েছে।[২২]

(খ) সুহ্ম ও রাঢ়

দশম শতাব্দী থেকে বিভিন্ন লিপি ও সাহিত্যিক সূত্রে রাঢ়ের দুটি অংশের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। দাক্ষিণাত্যেরচোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোলের (১০১২-১০৪৪ খ্রিস্টাব্দ) তিরুমুলাই লিপিতে তাঁর উত্তর ভারত অভিযানের যে বিবরণ রয়েছে তা থেকে রাঢ়ের দুটি অংশ ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সম্ভবত অজয় নদী উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়-এর মধ্যে সীমা নির্দেশ

[২০] ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (গবেষণা বিভাগ) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ:২৫

[২১] প্রাগুক্ত

[২২] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করতো। মোটামুটিভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্তই হয়তো বিস্তৃত ছিল রাঢ় দেশ।[২৩]

(গ) গৌড়

'গৌড়' নামটি সুপ্রাচীন ও সুপরিচিত হলেও এর অবস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা কষ্টসাধ্য। বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহের যুগে পরিমণ্ডল সম্প্রসারণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'গৌড়'। এর খ্যাতি এতোই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সমস্ত বাংলাকেই গৌড়দেশ বলে সময়ে সময়ে আখ্যা দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। পূর্ব ভারতীয় দেশসমূহের সামগ্রিক নাম হিসেবে এমনকি উত্তর ভারতের আর্যাবর্তের নাম হিসেবেও গৌড়ের ব্যবহার দেখা যায়। বাংলা-বিহার অঞ্চলের অনেক নরপতিই 'গৌড়েশ্বর' নামে খ্যাত ছিলেন। সেনবংশীয় রাজারা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করেছিলেন। ব্যাপক অর্থে 'গৌড়' বলতে অনেক সময় বাংলা ভাষা-ভাষী সমগ্র অঞ্চলকে বোঝাতো। আদি গৌড়াঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণই (শশাঙ্ক থেকে পাল যুগ পর্যন্ত) এই ব্যাপকতা দানের প্রধান কারণ।[২৪]

'গৌড়' জনপদ সম্পর্কে একথা বলা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে এর অবস্থিতি ছিল পশ্চিম বাংলার অংশ বিশেষ। মালদা-মুর্শিদাবাদ-বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই এর আদি পরিচিতি। কোন সময় হয়তো দক্ষিণ দিকে সমুদ্র পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটেছিল। শশাঙ্কের রাজত্বকালেই এরবিস্তৃতি; হয়তো উত্তর বাংলা এবং আড়িষ্যা পর্যন্ত গৌড় বিদেশী সূত্রে 'গৌড়েশ্বর' বা গৌড়রাজ' বা গৌড়েন্দ্র' বলে উলে-খের কারণ। গৌড়ের সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের প্রমাণ স্বরূপই 'গৌড়ীয় রীতি', যা সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টিতে স্বীকৃতি পেয়েছিল।[২৫]

(ঘ) বঙ্গ

উপজাতীয় নাম হিসেবে 'বঙ্গ'-এর প্রাচীনতম উল্লেখ 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে যেখানে 'বঙ্গ' ও 'মগধ'দের কথা বলা হয়েছে। 'বৌধায়ন ধর্মসূত্র'-এ আর্যসভ্যতা বহির্ভূত এবং কলিঙ্গদের প্রতিবেশী হিসেবে 'বঙ্গ'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। পুরানে প্রাচ্যদেশের তালিকায় বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। রামায়ণে অযোদ্ধার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ বলে বঙ্গদের উল্লেখ করা হয়েছে। কৌলিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গের 'শ্বত-স্নিগ্ধ' বসেত্রর উল্লেখ আছে। মহাভারতের 'দিগ্বিজয়' অংশে ভীমের 'পুণ্ড্র' থেকে বঙ্গদের আক্রমণের কথা রয়েছে। উপরে উল্লেখ থেকে মনে হয়, 'বঙ্গ' ছিল পূর্বাঞ্চলীয় সুপরিচিত একটি দেশ।

কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে বঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রঘু 'সুহ্ম'দের পরাজিত করে 'বঙ্গ দের উৎখাত এবং 'গঙ্গাস্রোতেরহন্তরেষু' অঞ্চলে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। একই শ্লোকে 'বঙ্গ দের 'নৌষাধনোদ্যতান' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু'র ব্যাখ্যা হিসেবে একথা স্বীকৃতি পেয়েছে যে, এতে গঙ্গা-স্রোত-অর্ন্তবর্তী ভূ-ভাগকেই বোঝানো হয়েছে। গঙ্গার দুই প্রধান স্রোত অর্থাৎ ভাগীরথী ও পদ্মার স্রোত-অন্তর্বর্তী এলাকা যে ত্রিভুজাকৃতি ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে তাই 'বঙ্গ'দের অঞ্চল, যেখানে রঘু নৌসাধনোদ্যত বঙ্গদের পরাস্ত করে জয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। এই অঞ্চলই সম্ভবত টামেলীর 'গঙ্গারিডাই'।[২৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি সূত্রে সাগর থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ 'বঙ্গ' বলে বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর যে প্রবাহ ময়মনসিংহের ভেতরদিয়ে প্রবাহিত হতো, সম্ভত এই প্রবাহই বঙ্গের উত্তর ও পূর্বসীমানির্ধারণ করতো। এই সূত্রে বঙ্গের সীমা দক্ষিনে সুন্দরবনাঞ্চলেরপূর্বপ্রান্ত থেকে উত্তরে ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র প্রবাহ পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব। আবার বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতে বঙ্গের নাব্যভাগের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল এলাক বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'বৃহৎ সংহিতাৎ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের 'উপবঙ্গ' জনপদের উল্লেখ করেছে। সতেরো শতকের 'দিগ্বজয় প্রকাশ' গ্রন্থের উল্লেখ থেকে 'উপবঙ্গ' বলতে যশোর ও তৎসংলগ্ন বনভূমিকে (সম্ভবত সুন্দরবন) বোঝাতো বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

---

[২৩] প্রাগুক্ত
[২৪] প্রাগুক্ত
[২৫] প্রাগুক্ত
[২৬] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ করা প্রাসাঙ্গিক হবে যে, বাংলায় মুসলমান শাসন বিস্তাওেরর প্রাথমিক পর্যায়ে 'বঙ্গ' বলে বাংলার দক্ষিণ-পয়র্ব অংশকেই বোঝানো হতো। মিনহাজের বর্ণনায় লক্ষণ সেনের 'বঙ্গ' ও সকনতে (সমতটে) আশ্রয় নেয়ার কথা কিংবা গিয়াস উদ্দীন ইউজ কর্তৃক 'বঙ্গ' থেকে কর আদায় করার যে সক উল্লেখ রয়েছে তা সবই বৌদ্ধ যুগ পেরিয়ে মুসলিম যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে তো ছিলই, খুব সম্ভবত 'বঙ্গালাহ' নামের বিকাশ পর্যন্তই ছিল।

(ঙ) বঙ্গাল

বঙ্গের সঙ্গে আর একটি নাম সাধারণত বলা হয়ে থাকে-বঙ্গাল। ধ্বনিগত দিক থেকে উভয়ের মিল আছে এবং সম্ভবত রঙ্গেরই অংশ বিশেষ ছিল বঙ্গাল। 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে প্রাকৃত 'আল' যোগ করে 'বঙ্গাল' হয়েছে এবং বঙ্গের অন্ত র্ভূক্ত কোন বিশেষ এলাকার অর্থে বঙ্গাল।

বঙ্গাল-এর ব্যবহার মূলত দক্ষিণী লিপিতে। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমুলাই লিপিতে উলি-খিত চোল অভিযান দক্ষিণ রাঢ়ঘ থেকে বঙ্গাল দেশে এসেছিল (যেখানে বৃষ্টি কখনো থামে না) এবং গোবিন্দ্রচন্দ্রকে পরাজিত করেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর দুই/একটি লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গালের পাশাপাশি উল্লেখ দেখা যায়। এইসব উল্লেখ থেকে পণ্ডিতগণ 'বঙ্গাল'-কে বঙ্গের অংশ বা বঙ্গের সমুদ্র তটশায়ী দক্ষিণভাগ বা সমস্ত পূর্ব-বঙ্গ বলে মনে করেছেন, কিন্তু বঙ্গালের অবস্থিতি নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। তবে একথা বলা বোধ হয় খুন অযৌক্তিক হবে না যে বাংলার বাইরে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, বঙ্গ ও বঙ্গাল খুব একটা পৃথক চিন্তায় ব্যবহৃত হয়নি। বঙ্গ বলে যে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগকে চিহ্নিত করা সম্ভব তাই 'বাঙ্গাল' বলে উলি-খিত হয়েছে; এই উল্লেখ যে খুব একটা বিশেষ অঞ্চল নির্দেশক ছিল এমন কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়।[২৭]

(চ) সমটত : পট্টিকেরা

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার আর একটি জনপদ সমতট। নামটি বর্ণনাসুচক। চতূর্থ শতাব্দীর সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত করদ রাজ্যসমূহের মধ্যে নেপাল, কর্তৃপুর, ডবাক, কামরূপ ও সমতটের উল্লেখ রয়েছে। কালিদাসের 'রঘুবংশ-এর কাব্যের নায়ক সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন বলেই মনে করা হয় এবং তাহলে সমুদ্রগুপ্ত 'বঙ্গ' এলাকা জয় করেছিলেন বলে ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে পুর্ব সীমান্তবর্তী সমতট বঙ্গের পুর্বে অবস্থিত বলেই নির্দেশ করতে হয়। বৃহৎসংহিতায় পণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, বর্ধমান এবং বঙ্গের সঙ্গে 'সমতট' জনপদের উল্লেখ আছে। সপ্তম শতাব্দীর সমতটে এসেছিলেন য়ুয়ান চোয়াং। কামরূপ থেকে দক্ষিণ দিকে ১২০০/১৩০০ লি দূরে সমূদ্রপকূলে অবস্থিত নিচু ও আদ্র সমতটের কেন্দ্র শহরের পরিধি ছিল ২০ লি। তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিদ্যমান অবস্থার যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি কুমিল-ার লালমাই অঞ্চলে বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রেই এসেছিলেন এবং এই অঞ্চলে ইদানীং প্রত্নতাত্তিক খনন ও আবিষ্কার এই বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বিস্তারিত চিত্র আমাদের সামনে উদঘাটিত করেছে।

সমতটের ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ইৎসিং প্রণীত ছাপ্পান্ন জন চৈনিক বৌদ্ধ শ্রমণের ভারত পরিভ্রমণের বিবরণে। ইৎসিং তাঁর বিবরণে সপ্তম শতাব্দীল শেষার্ধে শেংচি নামক শ্রমণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন, যিনি সমতট অঞ্চলে রাজভট নসামক রাজার কথা উল্লেখ করেছেন। এই রাজভট ও খড়ুগ রাজবংশ সম্ভূত 'রাজরাজভট্ট' এক ও অভিন্ন এবং খড়ুগ বংশ তাদের রাজধানী কর্মান্ত (কুমিল-া শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বড় কামৃতা) থেকে শাসন করতো বলে মনে করা হয়। কুমিল্লা শহরের ১৪ মালি দক্ষিণে অবস্থত দেউলবাড়ি গ্রামে প্রাপ্ত 'শর্বাণী' মূর্তি লিপি প্রমাণে এ্ সনাক্তকরণ আরো দৃঢ় হয়।

---

[২৭] রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ডঃ এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কুমিল-া শহরের ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কৈলান গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীধারণরাতের তাম্রলিপিতে তাঁদেরকে 'সমতটেশ্বর' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েরেছ। তাঁদের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল 'ক্ষীরোদা' নদীর তীরবর্তী 'দেবপর্বত'। খড়গ-পরবর্তী যুগে কুমিল-া অঞ্চলে শাসন করতো 'দেব' রাজবংশ এবং তাঁদের লিপিতেও ক্ষীরোদা তীরবর্তী দেবপর্বতের উল্লেখ রয়েছে। এই অঞ্চলে পরবর্তী রাজবংশ 'চন্দ্র'দেব তাম্রলিপিতেও সমতট ও দেবপর্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসব লিপি প্রমাণ পর্যালোচনা করে দেবপর্বত ও ক্ষীরোদী নদী সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। 'দেবপর্বত' খুব সম্ভবত নিকটবর্তী মরা নদী 'ক্ষীরা' যার খাতের কিছু চিহ্ন এখনও বিদ্যমান।

উপরের আলোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, মেঘনা-পূর্ববর্তী অঞ্চলই সমতট বলে পরিচিত ছিল এবং এই অঞ্চলের কেন্দ্র ছিল কুমিল-ার নিকট 'লালমাই' এলাকা। তবে একেবারে নির্দিষ্ট করে সমতটের সীমা নির্ধারণ সম্ভব নয়, ত্রিপুরা-নোয়াখালি অঞ্চলই (যা সমুদ্র নিকটবর্তী ছিল) সম্ভবত প্রাচীন সমতট। কালপ্রবাহে সমতটের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রসারের ফলে (বিশেষ করে চন্দ্রবংশের রাজত্বকালে) হয়তো কোন সময়ে 'সমতট' ও 'বঙ্গ' সমার্থবোধক হয়েছে।

সমতটের সঙ্গে সম্পর্কিত আর একটি প্রাচীন ভৌগলিক নাম 'পট্টিকেরা'। বহু আগে পূর্ব বাংলার 'পট্টিকের' নাম অঙ্কিত কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। পণ্ডিতবর্গ অনুমান করেছেন যে, কুমিল-ার পট্টিকেরা পরগণা থেকেই এইসব মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থের (১০১৫ খ্রি.) পাণ্ডুলিপিতে 'পট্টিকেরে চুণ্ডা বরভবনে চুণ্ডা'র এবং বর্মী উপাখ্যানেও পট্টিকেরা রাজ্যেল উল্লেখ পাওয়া যায়। কুমিল-া জেলার একটি পরগণার নাম 'পট্টিকারা' বা 'পাইটকারা' এবং মোগল রাজস্ব তালিকায় এই পরগণায় নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন পট্টিকের সম্ভত এই পরগণা। পট্টিকের শহর এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, তবে লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের উত্ত প্রান্তের পূর্বদিকে এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে।[২৮]

(ছ) হরিকেল

হরিকেল জনপদের প্রথম লিপি উল্লেখ পাওয়া যায় কান্তিদেবের চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্রলিপিতে (নবম শতাব্দীর)। পরবর্তীকালে চন্দ্রবংশীয় লিপিতেও হরিকেল রাজ্যের উল্লেখ আছে। চন্দ্রবংশীয় প্রথম রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের (৯০০-৯৩০ খ্রি.) উথানের বর্ণনায় বলা হয়েছে তিনি চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি হওয়ার পূর্বে হরিকেল রাজ্যেল ক্ষমতার আধার ছিলেন।

ইৎসিং সিংহল থেকে সমুদ্রপথে হরিকেল এসেছিলেন এবং হরিকেল ছিল পূর্ব-ভারতের (জম্বুদ্বীপের) পূর্বপ্রান্তে। হরিকেল রাজ্য সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান বালাদেশের পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ছিল (কুমিল-া-নোয়াখালি অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বে) বলে অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। চট্টগ্রামে কান্তিদেবের তাম্রলিপি প্রাপ্তি এই অনুমানকে জোরদার করে। যদি চন্দ্র তাম্রশাসনে উলি-খিত রোহিতাগিরি লালমাই অঞ্চল হয় তাহলে মনে করতে হবে যে নবম শতাব্দীর শেষভাগে হরিকেল রাজ্রেলপরিধি কুমিল-া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্র সেই কারণেই হরিকেল রাজ্রের হরিকেল রাজ্যেল ক্ষমতার 'আধার' ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে 'হরিকেল' নামাঙ্কিত মুদ্রারও উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (চট্টগ্রাম, কুমিল-া, সিলেট) এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যেল বেলেনিয়া অঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্য রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে যারএকদিকে অর্ধশায়িত অবস্থায় ষাঁড়ের প্রতিকৃতি ও অপরদিকে 'ত্রিশূল' আকৃতির চিহ্ন রয়েছে।

এই মুদ্রাসমূহের যে লিপি রয়েছে তার সাথে আরাকানীয় লিপির মিল পাওয়া যায় এবং এই সূত্রেই মুদ্রার লিখন 'হরিকেল' বলে নিঃসন্দেহভাবে পড়া সম্ভব হয়েছে। মুদ্রার লিপির এই মিল থেকে হরিকেল আরাকান সংলগ্ন চট্টগ্রাম অঞ্চলকেই চিহ্নিত করতো বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

---

[২৮] রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন: মাহমুদ, ড: এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত 'আর্যমঞ্জুশ্রীমুলকল্প' গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট এবং হরিকেল তিনটি স্বতন্ত্র কিন্তু প্রতিবেশী জনপদ বলে উলি-খিত হয়েছে। চন্দ্র বংশের ক্ষশতা সমতট বঙ্গ এলাকয় বিস্তার লাভ করার ফলে হয়তো দশম-একাদশ শতাব্দীতে 'হরিকেল' নামের পরিধি বিস্তার লাভ করেছিল এরূপ মনে করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত দুটি প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে হরিকোল (হরিকেল) ও শ্রীহট্ট অভিন্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুতরাং এমন মনে করলে খুব অসঙ্গত হবে না যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে চট্টগ্রাম অঞ্চলেই 'হরিকোল' জনপদের আদি অবস্থিতি। পরবর্তীকালে হরিকোল রাজাদের শাসনকালে (নবম শতাব্দী) সমতট (কুমিল-া-নোয়াখালি) অঞ্চল পর্যন্ত হরিকেলের পরিধি বিস্তার লাভ করে এবং চন্দ্র রাজাদের ক্ষমতা বিস্তার এর ভৌগলিক পরিধি হয়তো আরো প্রসারিত করেছিল।

উপরে প্রাচীন 'জনপদ' বা ভৌগোলিক অস্তিত্বসমূহের যে আলোচনা করা হলো সেখানে একটা কথা স্পষ্ট যে, তাদের সীমারেখা নির্দিষ্ট করা যেমন কঠিন তেমনি কঠিন যুগে যুগে তাদের সীমার বিস্তার ও সংকোচনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। কোন বা জনের নাম থেকে এসেছে তাদের বসবাসকেন্দ্রের আঞ্চলিক নাম। জনকে কেন্দ্র করে এক একটি রাষ্ট্রে বা রাজবংশের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। এওই রাজনৈতিক সত্তার সঙ্কোচনও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনপদটির সীমাও সঙ্কুচিত বা বিস্তারিত হয়েছে এবং তাই সব জনপদের সীমা সব সময় এক থাকেনি, থাকাও সম্ভব নয়।[২৯]

[২৯] রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ডঃ এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পরিচিতি এবং বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষানীতি

বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ বাংলা ভাষায় অনেক আরবি শব্দ রয়েছে যা আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি। বিশেষ করে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা এবং আলাপআলোচনার যথেষ্ট পরিমাণে আরবি শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। এটা অনেকে না জানলেও না বুঝলেও এমনিতেই আপনাআপনি এর চর্চা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের এ বঙ্গদেশের তথা বাংলাদেশের সাথে আরব দেশ, আরব জাতি ও আরবি ভাষা এক সুগভীর রক্ত সম্পর্কিত ঘনিষ্ঠতা রয়েছে তা প্রদর্শনের বা প্রমাণের জন্য বাস্তবভিত্তিক তথ্য ও সত্যতার প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। বাংলার ও আরবের উক্ত ঘনিষ্ঠাতা কতখানি তা কেবলই আমাদের বঙ্গদেশ তথা বাংলাদেশ বাঙ্গাল, অখ্যাতির বাঙ্গালি জাতি ও বাংলা ভাষা মূলত আরব দেশ, আরব জাতি ও আরবি ভাষার সাথে নিবীড় সম্পর্ক জড়িত রয়েছে। এ সম্পর্কের মূলে বঙ্গ ও বাংলা নাম শব্দ দুটির মূলে আরবি শব্দ রয়েছে এটাই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ড. মোঃ আব্দুর রহিম বলেন, "বাংলাদেশের বঙ্গ ও বাংলা নাম শব্দ দুইটি,যে মূলত আরবি শব্দ হইতে উৎপন্ন হয়েছে তাহার প্রথম সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায় পানিনির মহাভাষ্য রচয়িতা পত্রঞ্জলির এক উল্লেখ হইতে। শ্রী পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১৩১৪ সনে প্রকাশিত তাঁহার "বাঙ্গালার পুরবৃত্ত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন বা পানিনির মহাভাষ্য রচয়িতা পতঞ্জলি আর্যাবতের পূর্ব সীমানা নির্দেশ করতে আর্যাবতের পূর্বপ্রান্তের বাহিরে অবস্থিত যে 'কালকবন' এর উল্লেখ করিয়াছেন সেই 'কালকবনই' বঙ্গদেশ। এই কালক বন শব্দটির মধ্যে বণ শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় ধরা পড়লেও কালক শব্দের কোন অর্থ বাংলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে উক্ত 'কালক' শব্দে কি বুঝিতে হইবে এবং উহার অর্থই বা কি হইতে পারে তাহার দিক নির্দেশ নিম্নে বর্ণিত ভাষ্যে রহিয়াছে।

Thousand of years ago, the inhabitants of India Spoke. মুঘল আমলেই এই অংশ 'সুবা বাঙ্গালা' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। বাঙ্গালা পূর্বপশ্চিমে অর্থ্যাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়া গড় পর্যন্ত ৪০ ক্রোশ এবং উত্তরদক্ষিণে অর্থ্যাৎ উত্তরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে হুগলি জেলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এর পশ্চিমে সবা বিহার। কামরূপ ও আসামে সুবা বাঙ্গালার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। বাংলা আদি নাম ছিল 'বঙ্গ'। " প্রাচীন কালে এখানকার রাজারা ১০ গজঁউচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকান্ড 'আল' নির্মাণ করতেন; এ থেকেই বাঙ্গাল বা 'বাঙ্গালাহ' নামের উৎপত্তি।"[২]

কালক্রমে 'বঙ্গাল' হতেই সমগ্র দেশের 'বাংলা' নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে এদেশের অধিবাসীদেরকে যে, বাঙ্গাল নামে অভিহিত করা হয়, তা সেই প্রাচীন 'বঙ্গাল' দেশের স্মৃতিই বহন করে থাকে। সুতরাং 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গাল' দ্বারা বাংলার অংশ বিশেষকে নির্দেশ করা হতো। তাই 'বাঙ্গালা' নামের প্রচলন ইলিয়াস শাহ্ এর সময় থেকেই শুরু হয়েছে নিঃসন্দেহে বলা-চলে। 'বঙ্গ' বাঙ্গালা বা বাঙ্গালাহর উৎপত্তি হয়েছে 'বাঙ্গালা' নামটি মুসলমান অধিকার কালে সৃষ্ট এবং ফারসি 'বাঙ্গালাহ' থেকে পর্তুগিজ বেঙ্গালা ও ইংরেজি বেঙ্গল এসেছে বলে মত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও সীমানা ঃ

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী আমাদের এই বাংলাদেশ। এই দেশে অর্থাৎ এই ভূ-ভাগে নদীর প্রভাবই সবচেয়ে প্রবল। নদীবাহিত পলি দিয়েই গঠিত অধিকাংশ ভূ-ভাগ আর এই পলিই করেছে বাংলাকে কৃষিপ্রধান। এই নদীই সৃষ্টি করেছে বাংলার ভূ-ভাগের প্রাকৃতিক সীমা; সে সীমাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে বাংলার ভৌগলিক অবস্থান।[৩০]

বাংলাদেশ নামে যে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের আমরা অধিবাসী, তা বাংলাভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিস্তৃত জনপদের একটা অংশ মাত্র। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পুরো এলাকা, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও আসাম রাজ্যের কিছু অংশে এবং বার্মার আরাকানে বাংলা ভাষাভাষী লোক বাস করে। বর্তমান বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা প্রায় একুশ কোটি।[৩১] ইংরেজ শাসনামলে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ ভঙ্গ হয়েছে।এর আগে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে ছিল বঙ্গদেশ নামে। বঙ্গ ভঙ্গের ফলে মুসলামান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা পায়। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বঙ্গদেশ তার পূর্ববর্তী সীমানা ফেরত পায়নি।[৩২] ইতিহাসের পালাক্রমে দেশ ও জনগণ চিত্ত

[৩০] রহিম, মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ডঃ এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল : বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃঃ ৩১।

[৩১] খান, কেএম রইছউদ্দিন ঃ বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগ) খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, পৃঃ ২২।

[৩২] খান ঃ প্রাগুক্ত, পৃ : ২২।

Dhaka University Institutional Repository

াচেতনা শিক্ষা -সংস্কৃতি সর্বোপরি ভৌগলিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রামের মধ্যমে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তা ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশ প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসন-পাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেরই নামান্তর।[৩৩]

ভৌগলিক পরিচিতি ঃ

াংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এর আয়নত ১,৪৩,৯৯৮.৬০ বর্গ কিঃ মিঃ বা ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল। ংলাদেশ নদীবিধৌত এক দেশ। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত উপ-মহাদেশে অবস্থিত তিন দিক ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দেশ। আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর ৯০তম দেশ।[৩৪]

অবস্থান ঃ

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ ২০°-৩০´ থেকে ২৬°-৩০´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে ৮৮°-০´ থেকে ৯২°-৫৬ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি ও আসাম, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ দিকের বঙ্গোপসাগর বাদ দিলে বাংলাদেশের অপর তিনটি প্রান্ত ভারতের নানা রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর হিমালয় পর্বতশৃংঙ্গ, আসাম, উত্তর পূর্বের কোণ ঘেষে রয়েছে মায়ানমারের কিছু অংশ।[৩৫] এত নদ-নদী এরূপ বিশাল ও উর্বর সমতলভূমি পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। তাইতো গানে গানে বেজে উঠে, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

"সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা বাংলা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল। এই বদ্বীপ অঞ্চলের বেশির ভাগ ভূ-ভাগই গড়ে উঠেছে গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বয়ে নেমে আসা পলিমাটিতে, পৃথিবীর প্রাচীন ভূ-ভাগগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত -হাল আমলে।[৩৬] বাংলার নদ-নদীর মধ্যে গঙ্গাই প্রধান।[৩৭] বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। এই নদ-নদীগুলিই বাংলার প্রাণ, ইহারাই বাংলাকে গড়েছে, বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছে যুগে যুগে এখনও করছে।[৩৮] বাংলার পশ্চিম-উত্তরাঞ্চলের পুরাভূমির বন্ধনীটুকু বাদ দিলে আর বাকি প্রায় সবটুকু (চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিয়া) হল নবভূমি-গঙ্গ, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও তার উপনদীসমূহের জলে সিঞ্চিত। পশ্চিমে লালমাটির বুঝ ভেদ করে নেমে এসেছে ময়ূরাক্ষী, অজয়, রূপনারায়ণ, ইতিহাস প্রসিদ্ধ কপিশা (আধুনিক কসাই) গঙ্গার বিভিন্ন উপনদীসমূহ।

দর জলে উর্বর হয়েছে পুরাভূমি সংলগ্ন সমতলভূমি, রুক্ষ লালমটি হয়েছে উধাও, দেখা দিয়েছে স্তরে স্তরে জমে উঠা পালতে উর্বর শস্যশ্যামল নবভূমি। উত্তরে ও ঠিক পশ্চিমের মতই লালমাটি অঞ্চলকে ঘিরে আছে আত্রাই-মহানন্দা-করতোয়ার জল আর পলিমাটি দিয়ে গড়া ভূ-ভাগ। আর পূর্ব বাংলার তো কথাই নেই। সিলেটের পূর্বাঞ্চল, ময়মনসিংহের-মধুপু রগড়, ঢাকার ভাওয়ালের গড়, পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদ দিয়ে পূর্ব বাংলার সবটুকুই সমতলভূমি। এর মাঝে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরার সমতল ভাগ ও সিলেটের অধিকাংশ ভূমি তুলনামূলকভাবে প্রাচীন। খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমতলভূমি অঞ্চল আরও নতুন। সে জন্যই এ অঞ্চলকে বলা হয় নব্যমন্ডল। মধ্য ও দক্ষিণ বাংলারও একই অবস্থা। সমুদ্রের নিকটবর্তী বিরাট নদীর জলে সিঞ্চিত, নদী-নালা-খাল-বিল জলাভূমি সমাকীর্ণ নবভূমি বৃক্ষশ্যামল, শস্যশ্যামল জনপদ।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এদেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) পার্বত্য ও নি পাহাড়িয়া অঞ্চল, (খ) উপকূলীয় অঞ্চল ও (গ) নিম্নগাঙ্গের অববাহিকা অঞ্চল।[৩৯]

---

[৩৩] খান ঃ প্রাগুপ্ত, পৃ : ২২।
[৩৪] তালিব, আব্দুল মান্নান ঃ বাংলাদেশে ইসলাম (ইফাবা-১৯৮০ খ্রিঃ) পৃ : ১৫।
[৩৫] নেছার উদ্দিন, ডঃ আ.ই.ম ঃ ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃঃ ১৯১।
[৩৬] খান, প্রাগুক্ত , পৃ : ২৪।
[৩৭] রহিম, প্রাগুক্ত ,পৃ : ২১।
[৩৮] রহিম, প্রাগুক্ত ,পৃ : ২৪।
[৩৯] জাকারিয়া : মোঃ বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ ঢাকা-১৯৭২ খ্রিঃ, পৃ : ১৮ ও মানচিত্রে কেমন আমার বাংলাদেশ, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, ঢাকা,১৯৯৮, পৃ : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশের ভূ-খণ্ডই আমাদের আলোচনার বিষয়; বর্তমানে যা 'বাংলাদেশ' এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এ ভূ-খণ্ডের একটি আঞ্চলিক সত্তা ছিল এবং ভৌগলিকগণ ও এই উপমহাদেশের মধ্যে 'বাংলা'-কে একটি ভৌগলিক আঞ্চল বলে স্বীকার করেন। প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃন নদীবিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা; উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপাল তারাই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বত- রাজির উচ্চ ভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই বিস্তৃত সমভূমি দক্ষিণ দিক সাগরাভিমুখে ঢালু এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার জলরাশি দ্বারা বয়ে আনা বিপুল পরিমাণ পলি সাগরে উৎসারিত হচ্ছে। সমুদ পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি জঙ্গলাকীর্ণ। এর পেছনেই প্রায় ৫০ হাজার বর্গমাইল সমতল ভূমি, যার গঠনে - গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র,-মেঘনা প্রবাহের অবদান রয়েছে। এই বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চল (৩০০০ বর্গমাইল) নিকটবর্তী প্লাবণ ভূমির তুলনায় গড়ে ৬ ফুট উঁচু এবং এর মাঝামাঝিই রয়েছে ময়নামতির পাহাড়। সিলেট অঞ্চল ও গড়ে প্রায় ১০ ফুট উঁচু এবং এরই দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত প্রাইসটোসিন যুগে সুগঠিত মধুপুর উচ্চ ভূমি।" [৪০] ইংরেজ শাসনকাল শেষ হয়েছে ১৯৪৭ সালে। এ পর্যন্ত এ ভূ-খন্ডেকে বাংলা বুঝানো হতো। বৃটিশ শাসকদের বিশেষ করে পর্তুগীজদের 'বেঙ্গালা' থেকেই এটা নেওয়া হয়েছে। বাংলাটা আধিপত্য বিস্তারের জন্য অথবা ইউরোপীয়দের নিকট এই নামেই পরিচিত ছিল।

বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা ঃ

পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা রাজ্য ও বার্মা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল বা ১,৪৩,৯৯৮.২৬ বর্গকিলোমিটার[৪১] এবং জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। প্রাচীন 'বঙ্গ' রাজ্যের সীমানা উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, পশ্চিমে ভাগীরথী ও করতোয়া এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই সমুদয় এলাকা (ভাগীরথীর পূর্ব তীরে কিছু অংশ বাদ দিয়ে) বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত।

ভূ-প্রকৃতি ঃ- ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশ পৃথিবীতে অনন্য।

সীমানা ঃ

আজকের বাংলাদেশের সীমানা বলতে আমরা যা বুঝি, প্রাচীন যুগে সে সব এলাকা বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। তবে মোটামোটিভাবে প্রাচীন বাংলার সীমানা এভাবে নির্দেশ করাযেত ঃ উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো, খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ।এ চতুসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলই সাধারণত প্রাচীন বাংলা নামে পরিচিত। [৪২]

আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার বয়স খুব কম হলেও তার অতীব ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। সেজন্য বাংলাদেশ নামটি কখনও পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ, কখনও বাংলা, কখনও পাকিস্তান (পূর্ব) ইত্যাদি নামে অবহিত হয়েছে। তাই আড়াইশ বছরের অতীত ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, নানা সংঘাত, বিবর্তন, উত্থান পতনের বেড়াজাল পেরিয়ে, এদেশের আয়তন ও সীমানা ও বারবার বদলেছে।[৪৩]

---

[৪০] রহিম, ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল; চৌধুরী, ডঃ আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ডঃ এ বি এম; ইসলাম, ডঃ সিরাজুল ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস; নওরোজ কিতাবিস্তান ঃ ঢাকা; নবম সংস্করণ ২০০১, পৃঃ ১৭।

[৪১] খান ঃ প্রাগুপ্ত, পৃ: ২৪।

[৪২] বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হবে। ১৯৭১ খ্রিঃ মার্চের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল এবং (সংবিধান তৃতীয় সংশোধন) আইন ১৯৭৪-এ অন্তর্ভূক্ত এলাকা বলে উল্লেখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লেখিত এলাকা তদবহির্ভূত এবং যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমাভূক্ত হইতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৯ খ্রিঃ (প্রথম ভাগ প্রজাতন্ত্র অংশ দ্রঃ)।

[৪৩] নেছার উদ্দিন, ডঃ আ.ই.ম ঃ ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫, পৃ ঃ ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের শিক্ষানীতির পরিচয় ও প্রেক্ষাপট

মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে এবং মুসলমানদের শাসনামলেও যেমন বঙ্গ বা বাংলার ভূ-খন্ডগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একক কোন জনপদ বা রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি। তেমনি একক কোন আদর্শ বা ব্যক্তির চিন্তা-চেতনায় দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হয়নি। ফলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মুসলিম অমুসলিম শাসক শোষকের চিন্তার ফসলেই তখনকার শিক্ষা-সংস্কৃতি পরিচালিত হতো। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের ধারাবাহিকতায় এ অঞ্চলে বার বার শাসক পরিবর্তন হয়ে শিক্ষা সংস্কৃতির চিত্র ভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়।

মুঘল শাসন বাংলার অধিবাসীদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এর প্রত্যক্ষ কারণও ছিল। মুঘলদের সুশৃংখল ও জ্ঞানদীপ্ত শাসনের ফলে বাংলাদেশ উপকৃত হয়েছিল। মুঘল পরিবারে কয়েক পুরুষ ধরে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী শাসকের জন্ম হয়েছিল। তাদের ব্যক্তিত্বের জৌলুস ও শাসন ব্যবস্থা সমগ্ররাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণের ন্যায় বাংলার জনসাধারণেরও চিত্ত জয় করেছিল। এই প্রদেশে যে সকল সুবাদার দিউয়ান কাজি, বখসি, সদর, ফৌজদার ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন এরা সকলেই তাদের উন্নতমানের শাসনক্ষমতা শিক্ষা সংস্কৃতি ও পরিমার্জিত করার জন্য খ্যাতি - অর্জন করেছিলেন।[৪৪] তাঁদের সু-শাসনে বাংলার জনসাধারণ প্রায় একশত পঞ্চাশ বছর কাল অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে সে সময়ে তারা জীবনের বহু ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে ব্যাপক উন্নতি লাভ করেছিল।

মুঘল বিজয়ের সাথে সাথে এই প্রদেশে আগমন করেছে মুঘল, তুর্কী, ইংরাজী ও অন্যান্য অধিবাসী যারা স্বাস্থ্য ও প্রাণ প্রাচুর্যে-ভরপুর ছিল। এতে এখানকার অধিবাসীদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলার মুঘল শাসকদের সাথে আগমন করেছিলেন আলেম, পন্ডিত, শিক্ষক, কবি, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও অন্যান্যরা। তারা সাথে নিয়ে এসেছিলেন দিল্লী ও আগ্রার সংস্কৃতি। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রাণ প্রবাহের সৃষ্টি করেছিল। মুঘল বিজয়ের পর বাংলাদেশে আরবি, ফার্সি ভাষা জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার খুব প্রসার লাভ করেছিল।[৪৫] সম্রাট আকবরের দেওয়ান টোডরমল কর্তৃক সরকারী কাজকর্মে ফরসি ভাষা ব্যবহারের প্রচলন করার পর থেকে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানগণ এ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ফার্সি ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ব্যাপক ভাবে সৃষ্টি হয় । প্রদেশে ফার্সি চর্চার ও এর উন্নতির প্রতি জোড় পড়েছিল। ফার্সি চর্চার সাথে সাথে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ফার্সি সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে প্রভুত পরিমাণে উন্নতি লাভ করেছিল। আরও লক্ষণীয় যে মুঘল আমলে ইরানি চিকিৎসকেরা বাংলাদেশে বিশেষ সমাদর লাভ করেন। ইতোপূর্বে এখানে স্থানীয় কবিরাজদের চিকিৎসাই ছিল একমাত্র চিকিৎসা পদ্ধতি।

মুঘল শাসনআমলে উত্তর ভারতের হিন্দু ও অন্যান্য জাতির অধিবাসীরা এ বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার আকর্ষণ বোধ করে। রাজস্ব বিভাগের হিন্দু কর্মচারী ও সেনাবিভাগের রাজপুত সৈন্যরা তারাও এদেশে নিযুক্ত হয়েছিলেন তারা আচার-আচরণে এখানকার হিন্দু জনসাধারণের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং তারা এ প্রদেশকে তাদের স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় মাওলানা আব্দুল হাই আখতারের উর্ধতন পুরুষ শেখ মোঃ করীম খান আমীরুল বাহার বা মুঘল নৌ-সেনাপতি হিসাবে আনুমানিক ১৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন করেন।

ভারত উপমাহাদেশে মুঘল আমলকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যুগ বলা চলে। এ কালে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয় তা অভূতপূর্ব। মুঘল আমলের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে বাংলার জনসাধারণ অশেষ উপকার লাভ করে। দেশের সর্বত্র শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল। সাধারণ শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান উভয় সমভাবে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। উচ্চ মধ্যবিত্তের সকলই ছিল শিক্ষিত। সে যুগে শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল।[৪৬]

এক্ষণে স্বাধীন সুলতানী বাঙ্গালার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-"মুসলমানেরা স্বাধীনতার যুগে বাংলা ভাষায় স্বীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের অনুসরণে খাঁটি মুসলমান সাহিত্য রচনা করিলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কর্তৃক প্রবর্তিত নব্য বাংলা সাহিত্যেও তাহাদের প্রত্যক্ষ দান রয়েছে। সম্পূর্ণ মুসলিম 'থাকিয়াই' তাহারা বৈষ্ণব ঢঙে সহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা সর্বপ্রধান নজীর সপ্তদশ শতাব্দীর আলাওল, যে আলাওল 'তোহফা'-এর ন্যায় খাঁটি ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি আবার বৈষ্ণব ঢঙে 'পদ'ও রচনা করিয়াছিলেন। কি করিয়া হইয়াছিল, তাহাই ভাবিবার কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যে নব্য সহিত্য

---

[৪৪] রহিম, ডক্টর এম.এ : বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬ পৃ : পাঁচ (ভূমিকা)।

[৪৫] **রহিম ; প্রাগুক্ত, পৃ : ছয় (ভূমিকা)।**

[৪৬] রহিম ; প্রাগুক্ত, পৃ : সাত (ভূমিকা)।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করলেন তাহার আবরণ হিন্দুয়ানী ঘেষা হলেও অন্তর ছিল সূফী সাহিত্যের ভাবে পরিপূর্ণ । মুসলমানেরা সূফী সাহিত্য পড়ত। হিন্দুরাও তাই করেছে। হিন্দুরা যেমন সূফী সাহিত্যের অনুরূপ পদাবলী রচনা করিয়া মুসলমান হয় নাই, মুসলমানেরাও পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণব বনে নাই । সুতরাং ইহাদিগকে মুসলমান 'বৈষ্ণব কবি' বলা যায় না। তাঁহারা মুসলমান কবিই ছিলেন, বৈষ্ণব ঢঙে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন।"

এইরূপ সাংস্কৃতিক পটভূমিতেই স্বাধীনতার যুগে বাংলার মুসলমান বাংলা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।[৪৭] দেখতে দেখতে কালের বিবর্তনে সময়ের প্রেক্ষাপটে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ইংরেজ জাতি অত্যন্ত সুকৌশলে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তাদের কব্জা করে। কোন জাতিকে যদি ধ্বংস করতে হয় বা তার মূল ধারা থেকে দূরে রাখতে হয়, তখনই প্রয়োজন তার চিন্তাশক্তির আঁধার তার দমন ; তার সংস্কৃতির উপর আঘাত করা। তাই ইংরেজরা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়, মুসলমানরা হয় সর্বহারা ।[৪৮] মুসলমানদের পিঠ দেওয়ালে প্রায় ঠেকে যায়। এমন একসময়ে এদেশের তৌহিদী জনতার মাধ্যথেকে কালজয়ী ক্ষণজন্মা পুরুষ মর্দে মুজাহিদ জিন্দাদিল ব্যক্তি হাজী মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ[৪৯] পশ্চিম বঙ্গের তিতুমীর[৫০] তাঁরা মুসলিম চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ইংরেজ বেনীয়াদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। ১৮৫৮ সালে সিপাহী যুদ্ধের[৫১] পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটে সমগ্র ভারতবর্ষের উপর ব্রিটিশ বেনিয়াদের বোর্ড-অব কন্ট্রোল বিলুপ্ত করে একজন সচিবের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। ভারতের সরকারের সরাসরি শাসন পরিচালনার প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন লর্ড কার্ণিং।[৫২]

বাংলাদেশের অতীত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে ও প্রসারে যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হাজী মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ এবং মোহাম্মদ নেসার উদ্দীন তিতুমীর উল্লেখযোগ্য। তারই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা-সংস্কৃতির বাস্তবায়নে

---

[৪৭] হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল ঃ মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য ; ঢাকা, ১৯৫৭। পৃ : ৪৩-৪৪।

[৪৮] সাত্তার, ড. মোঃ আবদুল ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ : ২৮।

[৪৯] হাজী মোহম্মদ শরীয়ত উল্লাহ মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার সরাইল গ্রামের হাজী শরীয়ত উল্লাহ ১৭৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর নামানুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয় শরীয়তপুর। তিনি একজন এতিম বালক ছিলেন। তিনি চাচার আশ্রয়ে থাকতেন। ঘটনাক্রমে তিনি কলকাতায় বাশারত আলী নামে এক ব্যক্তির সাহচর্যে লেখাপড়া করেন। এই ওস্তাদই তাকে হজ্বে নিয়ে যান। সেখানে হজ্ব পালনের পর দেশে না এসে মাওলানা তাহের কব্বলের তত্ত্বাবধানে কুরআনিক জ্ঞানের অম্বেষণে প্রায় ২০ বছর কাটান। অবশেষে তার পালিত চাচা আজিম তালুকদারের অসুস্থতার খবর পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসেই ইংরেজদের সহায়তায় জমিদারদের অত্যাচার দেখে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। এ ছাড়া ধর্মের নামে অধার্মিক বা অনৈসালামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও তিনি বিদ্রোহ করেন। তার মধ্যে ফরজিয়াত বা আল্লাহর বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন হঠকারী আচার-অনুষ্ঠানকেই তিনি পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা দেন। এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি পীর-মুরিদী প্রথা পরিত্যাগ করতে জনসাধারণকে আহবান জানান। কিন্তু জমিদার শ্রেণীর অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ার মত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল ও প্রশিক্ষণ না থাকায় উপরোক্ত জমিদারদের পক্ষে ব্রিটিশের সার্বিক সাহায্য ও দেশীয় হিন্দু নেতৃবর্গের পূর্ণ সহাযোগিতার ফলে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে কামিয়াবী ছিনিয়ে আনতে পারেননি ।

[৫০] মোহাম্মদ নেসার উদ্দীন তিতুমীরের পূর্ণ নাম। তিনি মূলত তিতুমীর নামেই পরিচিত। ইংরেজদের হাত থেকে বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার ক্ষেত্রে তার সাহসিকতা বাঙালি ও বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি ১৭৮২ সালে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনার চাঁদপুর গ্রামে এক মুসলমান কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি তিনি খুব অনুরাগী ছিলেন। একই সাথে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলাও তার জুড়ি ছিল না। ভারত বর্ষে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপের সামন্তবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এরই চূড়ান্তরূপ। ফলে বাংলা ভূখন্ডে নীল কুঠিয়ালদের ভোগ বিলাসের মুখে অত্যাচারের শিকার হন কৃষককুল। যেসব জমিদার সামন্ত প্রভুরা নীল কুঠিয়ালদের সাহায্য করে গরীব কৃষকদের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়েছিল, তাদের মধ্যে কৃষ্ণদেব রায় ও কালি প্রসন্ন অন্যতম। তিতুমীরের বিপ্লবী চেতনা তাই জাগ্রত হয়েছিল। এসব অত্যাচারি জমিদারের বিরুদ্ধে তিনি তার অসীম সাংগঠনিক শক্তি দ্বারা দরিদ্র কৃষককূলকে একাত্মকরণ, প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি গণবাহিনী গড়ে তুলেন। জমিদাররা হেরে যায়। তিতুমীরের শক্তিশালী গণবাহিনীর কাছে। অবশেষে ১৮২৫ সনে চব্বিশ পরগণা, নদীয় ও ফরিদপুরের অংশবিশেষ নিয়ে গঠন করতে চাইলেন (গোপনে) একটি স্বাধীন এরিয়া, তার এই পরিকল্পনা পরে বারাসাতবাহিনী বিদ্রোহ নামে খ্যাতি লাভ করে। উক্ত বারাসাতের সংগঠিত তিতুর বাহিনীর সাথে আলেকজান্ডার নামে এক ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী আক্রমন করে। কিন্তু সেখানে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ইংরেজ বাহিনী মরিয়া হয়ে উঠে। তিতুমীর ১৮৩৯ সালে কলিকাতায় নিকটবর্তী নারিকেল বাড়িয়া নামক স্থানে এক বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন। সেখানে হাজার হাজার লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাংলার স্বাধীনতাকামী অর্ধ -শিক্ষিত অশিক্ষিত জনস্রোত ছুটে যায় প্রশিক্ষণের জন্য। কিন্তু ইংরেজদের বিশাল বাহিনীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন।

[৫১] ভারতবর্ষে কোম্পানী শাসন ও ব্রিটিশ সরকারের শাসন যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ সুখে ছিল না। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অত্যাচার, নিপীড়ন তাদের নিত্য সঙ্গী ছিল । একশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যৌথ শাসনের কুশাসনজনিত ব্যবস্থা জনগণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কৃষক, জমিদার, চাকরিজীবী, কারোর জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা ছিল না। তারই নিঃসৃতফল হিসেবে ১৮৫৭ সালে যে অসন্তোষ দাবানলের মত ইংরেজদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছিল তা ভারত বাংলার ইতিহাসে ১ম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে পরিচিত। এতে বিভিন্ন স্তরে জনতা ও সামরিক, আধা-সামরিক লোকজন অংশ নিয়েছিল।

[৫২] আলিম, একেএম আবদুল ; ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস- বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ : ৪৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

যোগ্য উত্তরসূরি হযরত আবদুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ), শাহ আবদুল হাই (রঃ), হাজী এমদাদুল্লাহ (রঃ), মাওলানা কাসেম নানতুবী (রঃ), রশীদ আহমদ গাংগুহী (রঃ) প্রমুখ মাশায়েখে দ্বীনগণের অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে ।[৫৩]

উপমহাদেশের বহু দেশ তথা বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষা-সংস্কৃতি, শহর এবং গ্রামেগঞ্জে বিভিন্ন জনপদে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভকরে ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে। যে অতীত প্রেরনা যোগায় সে অতীত অক্ষয় অজেয়, কথা কালের সাক্ষী। মাওলানা আব্দুল হাই আখতার এমনই একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। যিনি সে সময়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এনেছিলেন এক নয়াদিগন্ত। গ্রামগঞ্জে শহর বন্দরে নগরে সব জায়গায় শিক্ষা-সংস্কৃতি পরির্বতনের নেশায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। শুধু তাই নয়, নিজ সন্তান খালেদ বঙ্গালী (বিখ্যাত উর্দু কবি) তাকে সবক দেওয়ার জন্য নিজে একটি বই লিখেন যা পরবর্তীতে তৎকালীন শিক্ষা বিভাগ সিলেবাসের অর্ন্তভূক্ত করেন ।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে সেখানে শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। একটি উন্নত সমাজ গঠনে, যোগ্য নাগরিক সৃষ্টিতে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমগ্র সমাজের প্রগতিশীল বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষা। প্রায় দুইশত বৎসর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ও পঁচিশ বৎসর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের জনগণের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কোন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে নাই।[৫৪]

শিক্ষানীতি কি ? আমাদের আদৌ শিক্ষানীতি বলে কিছু আছে ? শিক্ষাদর্শনকে সামনে রেখে যে অবয়ব আমরা কল্পনা করি বা আঁকি যাকে আশ্রয় ও অবলম্বন করে আমাদের জীবনবোধ ও জীবনচর্চাকে আমার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে, আমার প্রয়োজন ও আমার আকাঙ্খা, আমার সামর্থ ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকেই তো বলা যায় শিক্ষানীতি। এক কথায় শিক্ষানীতি হলো শিক্ষা সম্পর্কিত দিক নির্দেশনা যার সার্থক বাস্তবায়ন গড়ে তোলে একটি সুঠাম শিক্ষাব্যবস্থা।[৫৫]

১৯৭১-এর ডিসেম্বরে স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর থেকে আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পর্কে সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগে অনেক সভা সমিতি আলাপ-আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আজঅবধি আমাদের কোন সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি নেই।[৫৬]

শিক্ষানীতির পরিচয় এবং বাংলাদেশের শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক

শিক্ষানীতি কি ঃ

শিক্ষা ও জীবন সমার্থক। জন্ম থেকেই মানুষের শিক্ষা শুরু হয় এবং আমরণ তা ব্যাপৃত থাকে। মানবজন্মের ঊষালগ্ন থেকে এই শিক্ষার সূত্রপাত। প্রাথমিক যুগে মানুষকে জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন উপায়, কৌশল এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হত। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য, খাদ্য সংগ্রহের জন্য, বন্যপশুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার কলা-কৌশল ও অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করার নামই হচ্ছে শিক্ষা বা শিক্ষানীতি।[৫৭]

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্যতম উপাদান হচ্ছে পাঠ্যবিষয়। শিক্ষণীয় বিষয় শিশুদের নিকট আনন্দদায়ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ পাঠ্যবিষয় যদি কঠিন হয় এবং শিশু যদি তার মধ্যে কোনরূপ আনন্দ খুঁজে না পায়, তা হলে সে শিক্ষা শিশুর জন্য কার্যকরী হবে না। পাঠ্যসূচি শিশুমনের উপযোগী না হলে, শিশুরা তা কখনও পড়তে আগ্রহী হবে না। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন অর্থাৎ শিশুর শারীরিক, মানসিক,নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রত্যেক শিক্ষকের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।[৫৮]

---

[৫৩] নেছার উদ্দিন ঃ প্রাগুক্ত , পৃ ঃ ৩৩।
[৫৪] ডঃ রংগলাল সেন, জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২, পৃষ্ঠা নং-৮০।
[৫৫] আতাউর রহমান, বাংলাদেশের শিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা, পৃষ্ঠা-৫৯।
[৫৬] প্রফেসর কবীর চৌধুরী, আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২, পৃষ্ঠা নং-৬।
[৫৭] আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা, পৃষ্ঠা নং-০১।
[৫৮] প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-০২।

Dhaka University Institutional Repository

আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে শিশুর ভবিষ্যতের উপর। শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা অনন্য। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ এ দুয়ের সমন্বয়ে শিক্ষা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। প্রত্যেক জাতি তথা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির দ্বারা পরিচালিত। শিক্ষাব্যবস্থার এই নিয়মনীতি জাতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়ে থাকে। শিক্ষাব্যবস্থা সূচারুরূপে পরিচালনার জন্য এই সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন গুলোকেই শিক্ষানীতি বলা হয়।[৫৯]

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসঙ্গ পর্যালোচনা হলেই অভিযোগ উঠে এটা একটা ঘুনে ধরা ব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক আমলের শাসন এবং শোষণ পাকা পোক্তভাবে চালু রাখার জন্য কেরানীকুল সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই হয়তো প্রণীত হয়েছিল এদেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা। বৃটিশ শাসকরা দেশ ছেড়েছে সেই কবে। কালের প্রবাহে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিযোগ এবং অনুযোগ গুলোতেও ঘুন ধরেছে বেশ।

সময়ের তাগিদে কিনা জানিনা, ৩৩ বছর আগের পঠন-পাঠনের বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও এসেছে। সুপরিকল্পিতভাবে নয়, অনেকটা খাপছাড়া ভাবে।[৬০] কোন দেশের শিক্ষানীতি তথা শিক্ষাব্যবস্থা সেই দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বাইরে থাকতে পারে না। দেশের অর্থনীতি কোন খাতে বইবে, তার সংগে সামঞ্জস্য রেখেই শাসক শ্রেণী সেই দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে থাকেন। সবদেশে, সবকালেই এটা সত্য।[৬১]

যেমন, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরপরই ১৯৯৯ সালের ২ জানুয়ারী দিল্লীতে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অর্মত্য সেন বলেছিলেন: Elementary education is a central component of any kind of economic development. Economic powers such as Japan had high levels of education before advanced towards industrial development.[62]

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি ঃ

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি হওয়া উচিত ইসলাম। কারণ ঃ

এক. এ দেশের অধিবাসীদের কমপক্ষে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান। গণতন্ত্র, সময়ের দাবি বা যে কোন বিচারেই ইসলামী শিক্ষার দাবি যুক্তিসঙ্গত। বৃটেন, জার্মানী, আমেরিকা এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্বর্তী দেশ ভারতের দিকে তাকালেই এ দাবির যথার্থতার প্রমাণ মিলবে।

দুই. যেহেতু সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ তথা বস্তুবাদী দর্শন আদর্শ ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ মানুষ তৈরিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তাই পরীক্ষামূলকভাবে হলেও কমপক্ষে দুয়েক যুগ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ণ করে তার ফলাফল দেখা উচিত।

তিন. আমাদের সংবিধান কয়েকবার পরিবর্তনের পর যেহেতু এখন সকল কর্মের উৎস হিসাবে আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসকেই ভিত্তি ধরা হয়েছে, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামকে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দেয়া হয়েছে, সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার এ অর্থে তাই শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী না হওয়ার আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

চার. ইসলাম যেহেতু জাগতিক উন্নতি, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং প্রগতি কোনটাকেই অস্বীকার করে না, তাই শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের হওয়ার কোন বাধা থাকতে পারে না।

---

[৫৯] প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-০২

[৬০] ডঃ সৈয়দ সফিউল্লা, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গে, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২, পৃষ্ঠা নং-৭৭।

[৬১] শহিদুল ইসলাম, আমাদের শিক্ষানীতি ঃ অতীত ও বর্তমান, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২, পৃষ্ঠা নং-৮৫।

[৬২] হোসনে আরা সম্পাদিত, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, সূচীপত্র প্রকাশনা-১৬১, ৪০/৪১, বাংলাবাজার, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ. আমাদের জীবনাদর্শ ইসলাম যেহেতু শুধু ইহকালীন বস্তুবাদী উন্নয়নে বিশ্বাসী নয়, মৃত্যুর পর একটি অনন্ত জীবনের ওপর সত্যিকারের গুরুত্বারোপ করে। সে জীবনে ইহকালীন সমস্ত কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। তার ভিত্তিতে জীবনের চূড়ান্ত ফায়সালার মাধ্যমে সত্যিকারের সফলতা নির্ভর করে। ইসলাম ছাড়া আর কোন আদর্শই দুনিয়া ও আখিরাতের এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।

ছয়. বাংলাদেশে মুসলিম ছাড়া অন্য যত ধর্মাবলম্বী বাস করে। তাদের কারো ধর্মই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ার দাবি করে না, অর্থনীতি, সমাজনীতি, জীবনের সামগ্রিক আচরণের ব্যাপারে কোন পথনির্দেশ দেওয়ার দাবি করে না। অন্য ধর্মাবলম্বীরা যদি সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি পড়তে পারে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার গবেষণা করতে পারে, এতে যদি তাদের ধর্ম বা জাতিসত্তার কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনের সব দিক অধ্যয়ন করলে তাদের জাতি বা ধর্মের সমস্যা হবে কেন ?

সাত. আজ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন সীমানার একমাত্র গ্যারান্টি হল ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তা। ভূ-রাজনীতি, বাংলাদেশের অবস্থান এবং ভারতের সম্প্রসারণবাদী নীতির বিপরীতে অটল বিশ্বাস এবং জাতি হিসাবে aggressive attitude নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মানসিকতা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। স্বতন্ত্র আদর্শ ও সংস্কৃতির লালন ছাড়া রাঘব বোয়ালের মুখের মধ্যে জীবন বাঁচানো অসম্ভব। তাই যে কোন বিচারে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূলনীতি হবে ইসলাম। তবে সকলেরই যার যার ধর্মীয় বিধিবিধান শিক্ষার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে ইসলাম শুধু উদারই নয় বরং সকল ধর্মের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। ধর্মের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি ইসলাম কোন ক্রমেই অনুমোদন করে না।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের সম্পৃক্ততার ইতিহাস অত্যন্ত গভীর। বলা হয় খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে বাংলার পণ্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেননি। তবে চেষ্টাটা বোধহয় কয়েক শতাব্দী আগেই শুরু হয়েছিল ও বৌদ্ধ সংঘারাম এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি ছোট-বড় শিক্ষায়তন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তাই দেখা যায়, ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তিতে দুবছর অবস্থান করে অধ্যয়ন ও পুঁথি নকল করেছিলেন। সপ্তম শতকে যখন হিউয়েন-সাং কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ ভ্রমণে এসেছিলেন তখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি জনগণের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার সংঘারামগুলির প্রত্যেকটিই ছিল বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। তবে এখানে যে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রই পাঠ করা হতো তা নয়, বরং ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সংগীত ও চিত্রকলা, মহাযান শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিকও বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। হিউয়েন-সাং অনেক দেবমন্দিরের উল্লেখ করেছেন। এখানে বাস করতেন বেশসংখ্যক ব্রাহ্মণ-আচার্য-উপাধ্যায় ও অগণিত দেবপূজক। দেবপূজকগণ যে শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রেরই চর্চা করতেন তা নয়, তারা নানা পার্থিব, দৈনন্দিন সমস্যাগত, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষার চর্চাও করতেন। এভাবে দেখা যায় যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বাংরাদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করে আর্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার বীজ বপন করা হয়।

মধ্যযুগঃ বাংলার মুসলমান সুলতানগণ তাঁদের ধর্মীয় দায়িত্বসমুয়হ সম্পন্ন করার জন্য প্রাথমিক বা উচ্চতর সবরকম শিক্ষা বিস্তারেই উৎসাহ প্রদান করতেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে শাসক, সুফী, উলামা, অভিজাতবর্গ, গোষ্ঠীপ্রধান এবং জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ সকলেরই অবদান রয়েছে। মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলি ইসলামী সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতো। সে সময় ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন কাজে নির্দেশনা দিতেন। শাসকগণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য এসব ব্যক্তিকে বিনামূলে ভূমিদান করতেন। অবস্থাপন্ন লোকেরা এঁদেরকে গৃহশিক্ষক নিয়োজিত করার মাধ্যমে তাদের এলাকায় অভ্যন্তরীণ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মীয় রীতি-নীতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। সে কারণে দুটি প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়- হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাদের স্ব স্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী পৃথক দুটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবনপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকৃতির হলেও ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন এবং জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে দুই সম্প্রদায়ের শাসক ও অভিজাতগণ সারা ম্যধযুগে শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মকতব ও মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি পাঠশালা

Dhaka University Institutional Repository

নামে পরিচিত ছিল। মুসলিমদের অনেক প্রতিষ্ঠানে কুরআন শিক্ষারব্যবস্থা ছিল। আবার অনেকগুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আরবি ভাষাকে উৎসাহিত করা হতো। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আরবি শিক্ষার পাশাপাশি ব্যাকরণ, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ও আইন শিক্ষা প্রদান করা হতো। হিন্দুদের স্থানীয় পাঠশালাগুলিতে ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া হতো। তাই স্বদেশী ভাষার ও বিদ্যালয়গুলিতে কদাচিৎ মুসলমানগণ শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মধ্যযুগে রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। তাই জীবিকা নির্বাহের তাগিদে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ফারসি ভাষা শিখতেন।[৬৩]

ব্রিটিশরা এ দেশ দখল করে নেওয়ার আগেও এ দেশে মুসলিমদের দীর্ঘ শাসনামলে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। একই শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশের মানুষের অফিস আদালত, সামাজিক সমস্যার সমাধান, প্রশাসন, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক সকল প্রয়োজন পূরণে সক্ষম ছিল।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তা সময়ের প্রয়োজন পূরণে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। পরে পাল এবং বৌদ্ধরা মোটামুটি সময়ের চাহিদা অনুযায়ী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দাঁড় করায়। বৌদ্ধদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন বিশ্বে অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠ হিসাবে পরিচিত ছিল। হিন্দু সভ্যতার পুনরুত্থানের পর বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে গণহত্যা পরিচালনার সাথে সাথে তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত নিদর্শন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বিজয়ী হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন বংশের লোকেরা যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে তা সময়ের প্রয়োজন মোটেই পূরণ করতে পারেনি। বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা মানুষে মানুষে বিভেদ ও বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতি ভাষার খুঁটিনাটি ব্যাকরণ, তন্ত্র-মন্ত্র এবং অশ্লীলতা ও যৌন চর্চার কারণে এই উপমহাদেশের মানুষকে অমানুষে পরিণত করার কাজটিই ছিল শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান দিক।

মুসলমানদের আগমনের পর শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য হওয়ার কারণে প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষিত ও জ্ঞানী করে তোলা মুসলিম শাসকদের নিকট ধর্মীয় দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল। যার ফলে ভারতবর্ষে সর্বত্র শিক্ষাব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং রাজভাণ্ডার থেকে শিক্ষার জন্য বিপুল অর্থ খরচ করা হয়। এতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারত জ্ঞানে-গুণে, ধনে-ঐশ্বর্যে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের কাছে ঈর্ষার পাত্র হয়ে ওঠে।[৬৪]

বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র এবং সামাজিক উপযোগিতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র উৎঘাটন। কারণ বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নিহিত অসংগতি, সংকট, শ্রেণীকেন্দ্রিকতা এবং সামাজিক উপযোগিতা ইত্যাদি ঐতিহাসিক সূত্রে বিবর্তিত প্রক্রিয়ারই বর্তমান রূপ। আমাদের শিক্ষার সংকট, সীমাবদ্ধতা, শ্রেণীনির্ভরতা এবং শিক্ষার নৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উপযোগিতা নিয়ে উপনিবেশিক আমল থেকে অদ্যাবধি আলোচনা, সমালোচনা-এমনকি আন্দোলন পর্যন্ত কম হয়নি। কিন্তু তারপরও আমাদের শিক্ষার সামগ্রিক সংকট বিন্দুমাত্রও দূরীভূত হয়নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে, নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়ে শিক্ষা ক্রমাম্বয়ে অধিক শ্রেণী নির্ভর হয়ে পড়েছে। শিক্ষায় সামাজিক নৈতিকতাবোধ ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। প্রাচীন দাস যুগ থেকে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরের সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ও শিক্ষার বিষয় নির্বাচন সমাজের ক্ষমতাশীন শ্রেণীর উপযোগিতার মাপকাঠিতে নির্ণীত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার আদি স্তরে শিক্ষা ছিল ধর্মীয় গুরু তথা ব্রাহ্মণ পুরেহিত এবং চার্চ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত-কারণ শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে তখন এঁরাই ছিল ক্ষমতাশালী ও অভিজাত। ধর্মভিত্তিক জীবনদর্শনের রূপায়ন বস্তুতঃ সামাজিক পরিবর্তনের গতিকে বহুলাংশে স্থবির করে রাখার প্রয়াসেই করা হয়। এ স্তরের শিক্ষায় ধর্মের প্রগতিশীল দিকগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি শ্রেণী স্বার্থের কারণেই।

ভারতবর্ষে উপনিবেশিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা ছিল ধর্মীয় বাণী ও চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ, কাঠামোকৃত এবং ধর্মীয় অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে এই ধর্মীয় অভিজাত শ্রেণী ছিল সামাজিক অভিজাত শ্রেণীরই প্রতীভু। ধর্মীয় বাণীর মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতাবাদ শিক্ষা দেয়াই ছিল তখনকার শিক্ষার মূল লক্ষ্য। শিক্ষার সংগে জাগতিক চাহিদার কোন সম্পর্ক ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বর্ণভিত্তিক সামাজিক স্ত রবিন্যাসকে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে সমাজ মানসে বৈধতা দেয়া এবং বর্ণবাদী আর্থ- সামাজিক শোষণ প্রক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করা ও অটুট রাখা।

---

[৬৩] বাংলা পিডিয়া খণ্ড-০৯ পৃষ্ঠা-৩৩৩-৩৩৪

[৬৪] মোল্লা, আব্দুল কাদেও, পৃষ্ঠা-৬০, ডিসেম্বর ২০০২ইং।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রাক-ব্রিটিশ যুগে শিক্ষা হয়ে উঠে ধর্মকেন্দ্রিক ও শ্রেণী নির্ভর। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃত এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আরবি ফারর্সি ছিল তখনকার শিক্ষার বাহন। এমনিতর শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত ধর্মভিত্তিক শিক্ষা তখন গণমুখী হতে পারেনি এবং ফলে শিক্ষার উপযোগিতা একদিকে পারলৌকিক ও অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণীর সামাজিক স্বার্থে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলতঃ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে শিক্ষার আশানুরূপ প্রসার ঘটতে পারেনি এবং জাগতিক জীবনের মানোন্নয়নেও শিক্ষা যেন কোন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

উপনিবেশিক শাসনামলে আমাদের শিক্ষার কাঠামো ও বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রথমে মিশনারি কর্তৃক ও পরবর্তীতে উপনিবেশিক সরকার কর্তৃক পাশ্চাত্যের 'লিবারেল এডুকেশন' প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এদেশে চালু করা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পেছনে উপনিবেশিক সরকারের তিনটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল।

প্রথমত মিশনারিদের দ্বারা শিক্ষা দিয়ে এদেশে ইংরেজি শিক্ষিতদের খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা ও ধর্মান্তরিত করা;

দ্বিতীয়তঃ ইংরেজীর মাধ্যমে লিবারেল এডুকেশন দিয়ে এদেশের জনগণের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ধ্যান ধারণা ইত্যাদির ধারক ও বাহক একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করা, এবং

তৃতীয়তঃ এ শ্রেণীর সহায়তায় উপনিবেশিত শাসন ও শোষণকে এদেশে অধিক পাকাপোক্ত করা।[৬৫]

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের বিপর্যয় ও হিন্দু-উত্থান ঃ

ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানরা সম্পূর্ণ পিছিয়ে পড়েছিল। সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনে এদেশে শিক্ষার যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে ধুলিস্যাৎ হয়েছিল। ইংরেজরা শাসনভার গ্রহণ করার পর মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণগুলি হলো ঃ

ক. ইংরেজ ও তার এদেশীয় সহচরদের সম্মিলিত লুণ্ঠন-শোষণের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুরবস্থা;
খ. ওয়াক্‌ফ বা লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে মুসলিম শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়া;
গ. ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন-প্রথার প্রবর্তন;
ঘ. নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার অভাব;
ঙ. খ্রিষ্টান মিশনারিদের পরামর্শ ও নির্দেশনায় ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণের ফলে ধর্মান্তরিত হবার আশঙ্কা;
চ. মুসলমানদেরকে বিধর্মীদের কাছে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা;
ছ. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম হিন্দুয়ানী ভাবধারায় ঢেলে সাজানো;
জ. মুসলিম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী সাহায্য ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত হওয়া; এবং
ঝ. পলাশীর বিপর্যয়ের ফলে মুসলমানদের আহত আত্মমর্যাদাবোধের কারণে তাদের ঐতিহ্যবিরোধী শিক্ষা-ব্যবস্থা ও বৈরী পরিবেশের সাথে একাত্ম হতে না পারা।[৬৬]

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ঐতিহ্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দিক থেকে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। এ সম্পর্কে মেকলের উক্তি থেকেই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ
বর্তমান আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্ত-মাংসের গড়নে ও দেহের রঙে ভারতীয় হবে বটে; কিন্তু রুচি, মতামত ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।'
{Woodrow: Macaulay's Minutes on Education in India (1862)}

এই মেকলের মেজাজ ও মানসিকতা সম্পর্কে তাঁর আরেকটি দম্ভোক্তি থেকে জানা যায়। তিনি একবার বলেছিলেন, ইউরোপীয় যে কোন ভালো লাইব্রেরির একখানি আলমারি ভারত ও আরবের সমগ্র দেশীয় সাহিত্যের চেয়েও বেশি মূল্যবান।[৬৭]

শিক্ষায় মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের মাঝে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তা প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই ধারায় তখন বিভিন্ন

---

৬৫ মোহাম্মদ মাহ্বুব উল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ, বাণিজ্য খণ্ড-৮, ১৯৩২ পৃষ্ঠা নং-২৯৯-৩০০

৬৬ মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, আমাদের জাতীসত্ত্বার বিকাশধারা, পৃষ্ঠা নং- ৪৬-৪৭, দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৬৭ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা নং- ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

এলাকায় আরো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। কিন্তু এ সকল শিক্ষায়তন থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই নাস্তিক এবং প্রকৃতবাদে বিশ্বাসী লোক বের হয়ে আসছিল। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগ ছিল খুব মারাত্মক। এখান থেকে সনদপ্রাপ্ত শতকরা নব্বই ভাগ শিক্ষার্থীই নাস্তিক বা প্রকৃতিবাদের পূজারী হিসেবে বের হন।[৬৮] যদিও এ অভিযোগটি বাস্তবতা বিবর্জিত যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

খ্রিষ্টান মিশনারি ও নব্য-পুঁজিপতি দালাল হিন্দুদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত দেশীয় ভাষা শিক্ষার স্কুল বা পাঠশালাগুলিতে 'বাংলা ভাষা'র নামে যা শিখানো হতো তা আসলে সংস্কৃতেরই নামান্তর। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত বাংলা জবান কে নির্বাসিত করা হয়েছিল। পাঠ্য-পুস্তকের অধিকাংশ রচনা ছিল হিন্দু দেব-দেবীর পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে। ছাত্রদের জন্য ক্লাসে স্বরস্বতী-বন্দনা ছিল বাধ্যতামূলক।[৬৯]

ইংরেজদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে হান্টার লিখেছেন ঃ
"আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের ধর্মের কাছে অনুগ্রহযোগ্য।

আমাদের প্রবর্তিত জনশক্তি ব্যবস্থা যেমন তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমনি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সাহায্য এতকাল তারা পেয়ে এসেছিল, তাও আমরা বিনষ্ট করেছি।'[৭০]

শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য ঃ

প্রথমত ঃ শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষকের স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন।
দ্বিতীয়ত ঃ শিক্ষাদান ক্ষেত্রে শিশুর ভূমিকাই প্রধান।
তৃতীয়ত ঃ শিশুর ক্ষমতা, আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা, ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পর্কে শিক্ষকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।
চতুর্থত ঃ পাঠ্যবিষয়কে শিশুর উপযোগী করে তোলা।
পঞ্চমত ঃ কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা।
ষষ্ঠত ঃ শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।
সপ্তমত ঃ শিক্ষাদানে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা আরোপ ছাড়াই শিশুকে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করা।[৭১]

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর হতে আজ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছে, তার কোনটিতেই ইসলামী রাষ্ট্রের উপযোগী নাগরিক গড়ে তুলবার ব্যবস্থা হয়নি। এ পর্যন্ত যতগুলি শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত হয়েছে, তাদের কোনটিই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ার সুপারিশ করতে পারেনি। সকলেই ইসলামকে একটি ধর্মের মর্যাদা দিয়েছে মাত্র। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থায় খ্রিষ্টধর্মকে যেটুকু স্থান দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকেও মাত্র ততটুকু স্বীকৃতিই দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষবাদের ভিত্তিতে গঠন করে এর সহিত Religious Instruction (ধর্মীয় শিক্ষা) এর লেজুড় টুকু জুড়ে দিলেই কোন পদ্ধতি ইসলামী হয়ে যায় না। এ ধরনের অস্বাভাবিক সংযোগ দ্বারা আর যাই হোক, ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গঠন করা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না।

বাংলাদেশের শিক্ষা সংকটের উৎস ঃ

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা।
দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা।
দাতা সংস্থার শর্তারোপ।
ভারতের আগ্রাসী নীতি।
৫। এনজিও শিক্ষা।

---

[৬৮] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ, এস, এম, আলাউদ্দীন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃষ্ঠা নং-৭০
[৬৯] মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, আমাদের জাতীসত্ত্বার বিকাশধারা, পৃষ্ঠা নং- ৪৯, দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
[70] ডবলিউ ডবলিউ হান্টার ঃ দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃঃ ১৫৪.১৬০
[৭১] আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা, পৃষ্ঠা নং-০৩

Dhaka University Institutional Repository

বিরাজমান সংকটের স্বরূপ ঃ

১ । শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শিক সংকট ।
২ । উপযুক্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অভাব ।
৩ । মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ।
৪ । শিক্ষাব্যবস্থা কর্মোপযোগী নয় ।
৫ । বিভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষা ।
৬ । সুস্পষ্ট লক্ষ্যের অনুপস্থিতি ।
৭ । আত্ম-সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ ।
৮ । প্রতিভা বিকাশের সুযোগ কম ।
৯ । ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি ।
১০ । কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষক সংকট ।
১০ । শিক্ষা পেশায় মেধা আকর্ষণ করার ব্যবস্থা নেই ।
১১ । শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ।
১২ । শিক্ষকদের পদ শূন্য থাকা ।
১৩ । শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল ও অকার্যকর ।
১৪ । পরিচালনা পরিষদের দ্বন্দ্ব ।
১৫ । দুর্নীতিতে নিমজ্জিত আদর্শ শিক্ষা প্রশাসন ।
১৬ । মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রশাসনিক অবকাঠামোর অপ্রতুলতা ।
১৭ । মাদ্রাসার ছাত্ররা বৈষম্যের শিকার ।
১৮ । মাদ্রাসা সমূহের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ ।
১৯ । জবাবদিহিতার কার্যকর ব্যবস্থা নেই ।
২০ । লেজুড়বৃত্তি ও সন্ত্রাস নির্ভর ছাত্ররাজনীতি ।
২১ । পরীক্ষায় নকল প্রবণতা ।
২২ । প্রাইভেট ও নোট বইয়ের ব্যাপক প্রচলন ।
২৩ । বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্য ।
২৪ । বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণের অভাব ।
২৫ । লাইব্রেরি, বই ও যোগাযোগের অভাব ।
২৬ । সহ-পাঠ্যক্রম কার্যাবলীর অপ্রতুলতা ।
২৭ । শিক্ষাঙ্গনের বিরূপ পরিবেশ ।
২৮ । বিকৃত ইতিহাসের শিকার কোমল প্রাণ শিক্ষার্থীরা ।[৭২]

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য ঃ

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হলে প্রথমেই জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন । বাংলাদেশে কোন ধরনের মানুষ গড়ে তুলার উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করছি । তা-ই এক্ষেত্রে মৌলিক প্রশ্ন । আমাদের নিজস্ব কোন মত, বিশ্বাস, জীবনদর্শন, উদ্দেশ্য এবং জীবনধারা বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যেন তারা আমাদের তাহজীব তমুদ্দুনকে ভিত্তি করে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে ।

আজ বাংলাদেশে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার যার মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপদানের জন্য উপযুক্ত নেতৃত্ব ও কর্মী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে । আধুনিক বিশ্বে ইসলামের আদর্শকে মানবজাতির মুক্তি বিধানরূপে পেশ করার যোগ্য লোক তৈরি করতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিকের শিক্ষায় এবং সাহিত্যে ইসলাম,

[৭২] সংকটাবর্তে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঃ উত্তরণের উপায়, ঢাকা পৃষ্ঠা- ৪-১২

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা মূল্যমান ও মূল্যবোধের প্রাধান্য বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হতে হবে। আমরা যদি গন্তব্য স্থল সম্বন্ধে নিশ্চিত না হই তাহলে দিশেহারার ন্যায় অনিশ্চিত পথে চলে জাতিকে ধ্বংসের পথেই নিয়ে যাব।

বাংলার শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে এ্যাডাম ১৮৩৫ সালে তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন: শিক্ষাকে যদি নৈতিক উন্নতির বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে কেবল ইংরেজির মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখা অনুচিত হবে। কারণ, প্রস্তাবিত ইংরেজি শিক্ষার ফল শুধু মধ্য ও উচ্চবিত্তগণই ভোগ করতে পারবেন। নিম্ন বা গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণী তথা সাধারণ জনগণ এর দ্বারা উপকৃত হবে না। অ্যাডাম বলেন যে, সংস্কৃত কিংবা আরবি শিক্ষার পেছনে অর্থ ব্যয় না করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলো ভুল করছে। শিক্ষানীতিতে অবশ্যই দেশীয় জনগণের প্রচলিত ভাষা বজায় রাখতে হবে যা অনাদিকাল ধরে বাংলা, বিহার তথা ভারতে চলে আসছে। তাঁর এ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিংকের নিকট অভিমত ব্যক্ত করেন যে, একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে দেশের জনগণের শিক্ষার উপর একটি ব্যাপকভিত্তিক ও গভীর সমীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর আবেদনের সাড়া পাওয়া যায় নি। পুনরায় ১৮৩৪ সালে তিনি বেন্টিংকের কাছে দেশের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের দাবি জানান। অ্যাডামের মতে, সরকারের পক্ষ থেকে কিছু করার পূর্বে জানা দরকার যে, দেশীয় ব্যবস্থা তার নিজের জন্য কতটুকু করতে পেরেছে। এবার অ্যাডামের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৮৩৫ সালের ২ জানুয়ারি বেন্টিংকের অনুরোধে অ্যাডাম তাঁর প্রস্তাবের চূড়ান্ত খসড়া সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করেন।

অ্যাডাম মুসলমানদের বিদ্যালয় ও জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে বলেন যে, মুসলমানরা শিক্ষাকে শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ করেন নি, তাঁরা শিক্ষাকে নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। এ লক্ষ্যে মুসলিম বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চাকেই তাঁদের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতেন বলে অ্যাডাম প্রথম রিপোর্টে উল্লেখ করেন। ছাত্রের সাফল্য ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ব্যক্তিগত পরিশ্রমের উপর নির্ভর করত। শিক্ষক বা ছাত্র কোন পক্ষের উপরই তেমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রদের উপস্থিতি এবং নিয়োগ প্রদান উভয়পক্ষের মধ্যবস্থতার বা সমঝোতার উপর নির্ভর ছিল। শিক্ষা পদ্ধতিতে বিশেষ কোন বিধি মেনে চলা হত না। ছাত্র-শিক্ষকের সামান্য মতবিরোধেই ছাত্রের শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটত বা ছাত্ররা শিক্ষক পরিবর্তন করত। মুসলিম পরিচালিত বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য কোন বেতন ধার্য ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে মুসলিম ছাত্ররা শিক্ষকের বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বাস করত এবং অনেক শিক্ষক ছাত্রের সম্পূর্ণ ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করতেন। তার পরিবর্তে শিক্ষার্থী শিক্ষকের ব্যক্তিগত সেবা ও বাড়ীর গৃহস্থালীর কাজ করত। প্রাথমিকভাবে মুসলিম ছাত্ররা ফারসি ভাষার উপর জ্ঞান লাভ করত। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষকের নিকট আরবি সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, আইন ইত্যাদি বিষয়ে পণ্ডিত্য অর্জন করত। এভাবে শিক্ষালাভ করে মুসলিম ছাত্র 'মুন্সী' উপাধি লাভ করত। পাশাপাশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আইন-আদালতে চাকরি লাভের যোগ্যতাও তারা অর্জন করত।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগ যথেষ্ট আছে কিন্তু তা সঠিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না। মূলত এটি ঘটছে সমাজব্যবস্থার চাপে। যদি আমি এই শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটির কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করি, তাহলে একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে উঠবে যে, প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত বা বিদ্যালয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, যতক্ষণ না দেশীয়দের নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধের উন্নতি ঘটবে ততদিন পর্যন্ত জাতীয় উন্নতি সম্ভব হবে না। এই নৈতিক শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশ করানো সম্ভব হলে সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা দেশীয় জনগণ উপকৃত হবে।

এছাড়া, তিনি কোনরকম নীতিবিরুদ্ধ বা ধর্মহীন শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তার মতে, ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার সুষ্ঠু উপায় হল কোন ধর্মীয় বিতর্কে না গিয়ে অথবা ধর্মীয় সংস্কারের চেষ্টা না করে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা। অর্থাৎ কোন বিশেষ ধর্মে বদ্ধমূল না থেকে প্রত্যেক ধর্মের মানবাহিতকর ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলো গ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়গুলোকে সে দৃষ্টিকোণে প্রভাবিত করার ব্যবস্থা করা। তিনি ছাত্রদেরকে ধর্মান্তরিকতকরণের চেষ্টা বা নিজস্ব ধর্ম পরিবর্তনের আদ্যন্ত বিরোধী ছিলেন। বরং ছাত্রদের নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করাই ছিল অ্যাডামের নীতি।[৭৩]

অ্যাডাম বাংলার প্রচলিত শিক্ষার যে প্রধান ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলেন, সেটি ছিল শিক্ষণীয় বিষয়ের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া ও হিসাব শিক্ষার যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা সমাজের দৈনন্দিন প্রয়োজন সিদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট; তবে সমস্ত শিক্ষার ওরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীর

---

[৭৩] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরনী প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ০৮

Dhaka University Institutional Repository

মনের বিকাশ বা দৃষ্টি সম্প্রসারিত হতে পারত না। সমস্ত বৃদ্ধি-বৃত্তি আঞ্চলিক ও সাময়িক বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থেকে যেত। ব্যক্তিগত উন্নতি ও সমষ্টিগত কল্যাণসাধনের জন্য মানুষের যে উন্নত চরিত্র গঠিত ও নৈতিকবোধ জাগ্রহ হওয়া প্রয়োজন তা ওসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব ছিল না। তবুও অ্যাডাম হতাশ হন নি। তিনি বিশ্বাস করেন, যুযোপযোগী ও বহির্জগতের শিক্ষার যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে দেশীয় জনগণের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সম্ভব হবে। তিনি কিছুক্ষেত্রে এদেশীয় শিক্ষার উপর আশাব্যঞ্জক মন্তব্য করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের লোকদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষণ অ্যাডামকে মুগ্ধ করে। এছাড়া তাঁর মতে, ফারসি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বাংলা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলোতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপাদান রয়েছে বলে তিনি লক্ষ্য করেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা সমাজে চরিত্র গঠনে প্রভাব বিস্তার করছে। মুসলমান আরবি উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচি অ্যাডামকে বিমোহিত করেছিল। তিনি ইউরোপীয় শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষিত মুসলমানগণ শিক্ষিত হিন্দুর চেয়েও অধিক প্রস্তুত রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তবে মুসলমানেরা প্রচলিত শিক্ষায় প্রতিবেশি হিন্দুদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। এ জন্য অ্যাডাম মুসলমানদের দরিদ্রতাকেই প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত অনেক মাদ্রাসা দারিদ্রের কারণে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে। অ্যাডাম এজন্য মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা নিতে সরকারের নিকট সুপারিশ করেন।

তবে বেন্টিঙ্ক-এর শিক্ষানীতিতে ৭ই মার্চের ১৮৩৫ ঘোষণাই শেষ কথা ছিল না। কারণ তিনি এই ঘোষণা দেয়ার পরও অ্যাডামকে অনুসন্ধান কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন নি। অ্যাডামও অনেকটা আশার উপর তাঁর কাজ অব্যাহত রাখেন। তাহলে কি এই ধারণা করা যায় যে, বেন্টিঙ্ক তাঁর পদক্ষেপ সম্বন্ধে খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না? হয়ত বেন্টিঙ্ক সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য আরও কিছু প্রমাণের আশা করেছিলেন যা তাঁর ৭ই মার্চের ১৮৩৫ ঘোষণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। তবে বেন্টিঙ্ক-এর ৭ই মার্চের সিদ্ধান্তের পেছনে যে কারণেই থাকুক, তিনি যে ঐ ঘোষণার প্রতি সামান্য দ্বিধান্বিত ছিলেন সেটা বেন্টিঙ্কের প্রাচ্যবাদী শিক্ষার প্রতিই সমর্থন নির্দেশ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অ্যাডামকে নিয়োগের কিছু পরেই অর্থাৎ ১৮৩৫ সালের মার্চ মাসের শেষে বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। অ্যাডামের রিপোর্ট প্রকাশকালীন বেন্টিঙ্ক গভর্নর জেনারেল থাকলে তিনি কি সিদ্ধান্ত নিতেন সেটাও ভাবনার বিষয় ছিল।

অ্যাডামের রিপোর্ট যখন জনশিক্ষা কমিটির নিকট পেশ করা হয়, তখন পাশ্চাত্যবাদের প্রবল প্রবক্তা মেকলে এর সভাপতি ছিলেন। তিনি অ্যাডামের গবেষণাকে খুব কম গুরুত্বই দিলেন। ১৮৩৫ সালের ১৩ই জুলাই অ্যাডামের প্রথম রিপোর্ট মুদ্রিত করার প্রশ্ন উঠলে মেকলে বলেন, এসব আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের বাইরের বিষয়। সুতরাং এসব বিষয়ে কমিটির অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন মানে হয় না। আবার অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্টটিকে তিনি 'চমৎকার' বলে অভিহিত করেন এবং এর রচয়িতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া, দ্বিতীয় রিপোর্টে রাজশাহীতে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দেখে মেকলে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

অ্যাডামস্ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান হওয়ার ফলে গ্রামীণ জনগণ শিক্ষাক্ষেত্রে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য পিছিয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য তখনকার গ্রামীণ দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সরকারের শিক্ষানীতি উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে মুসলমানেরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারের নীতির সাথে অ্যাডামের একটি বিষয়ে মিল ছিল অর্থাৎ সরকারি শিক্ষানীতির অনুরূপ অ্যাডামও চেয়েছিলেন এদেশে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হউক এবং তা প্রথমে মাতৃভাষায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে। কিন্তু সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ইংরেজি ভাষায় উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যে শিক্ষা আগে ছড়িয়ে দিতে হবে।[৭৪]

[৭৪] মোঃ আবদুল্লাহ আল-মাসুম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যাঃ ৮২, জুন ২০০৫, আষাঢ় ১৪১২, পৃ:১৫০-১২৩-১২৪,১২৯-১৩০,২৩৫-১৩৬,১৪০,১৫২,১৫৫-১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষা যে পর্যায়ে এসে পৌছেছে তা একদিনে এসেনি। তাই এর পূর্ব ইতিহাস জানা দরকার। আর ইতিহাস হল অতীত কর্মের ইতিবৃত্ত। এদেশে শিক্ষার উন্নয়নে কখন কতগুলো কমিশন ও কমিটি গঠিত হয়েছে, শিক্ষার উন্নয়নে তাদের প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা কি ছিল? আর সুপারিশমালার কতটুকুই বা তদানীন্তন সরকার বা কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করেছেন তার বিষদ আলোচনা প্রয়োজন। তাছাড়া আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা এ পর্যায়ে আসতে কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়েছে তার পর্যালোচনা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমরা আমাদের শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে কি সক্ষম হয়েছি? যদি না পেরে থাকি তবে কেন পালাম না? যেসব প্রতিবন্ধকতা আমাদের শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা কি আমরা তার অবসান ঘটাতে পারি না? এজন্য আমাদের শিক্ষার ইতিহাস জানা একান্ত দরকার, যা অতীতের শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘটনাপঞ্জির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, বর্তমানের ভবিষ্যতের পরিকল্পনামূলক-কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিত, অর্থাৎ ইতিহাস অতীত বর্তশান ও ভবিষ্যৎ এ তিন কালের সেতুবন্ধন দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যে উত্তরণ সম্ভব।[৭৫]

[৭৫] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরনী প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ০৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার পরিচয়

শিক্ষার পরিচয় ঃ

যে কোন জিনিসকেই সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। তবে মানবসভ্যতার গোড়া থেকে যে পদ্ধতি মানুষকে এতদূর নিয়ে এসেছে তার সংজ্ঞাদান কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

শিক্ষার সাধারণ বিশ্লেষণ

শিক্ষার একাধিক সংজ্ঞা হতে পারে। যেমন–

(ক) জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতি এবং সে সংগ্রামে অর্জিত অভিজ্ঞতার নাম শিক্ষা।
(খ) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান দেওয়া-নেওয়ার কলা-কৌশলের নাম শিক্ষা।
(গ) পূর্বের সঞ্চিত জ্ঞান বর্তমান বংশধরদের কাছে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়ার নাম শিক্ষা।
(ঘ) শিক্ষকতায় নিযুক্ত বা নিযুক্ত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পেশাগত শিক্ষণের নাম শিক্ষা।
(ঙ) কোন নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ব্যক্তির যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার আনুষ্ঠানিক অথবা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার নাম শিক্ষা।
(চ) নিজ সমাজে সার্থকভাবে বাস করার উপযোগী সক্রিয় মূল্যবোধ জাগ্রত করে ব্যক্তির দক্ষতা ও প্রবণতা বিকশিত এবং আচরণ মার্জিত করার সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের নাম শিক্ষা।
(ছ) ব্যক্তির দেহ ও মনের সকল ক্ষমতা বিকশিত, বিবর্তিত, মার্জিত করে তাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী সকল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, নৈপুণ্য অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে তোলার সহায়ক ব্যবস্থাদির নাম শিক্ষা।[৭৬]

মানবতার কল্যাণ সাধনই প্রকৃত শিক্ষাঃ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখার উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, আজ আমরা যাদের দলিত, বঞ্চিত বলে অবজ্ঞা করছি তারাও এদেশের মানুষ, এ মাটির মানুষ। তাদের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের সমস্ত মেধা শ্রম তাদের কল্যাণেই নিবেদিত হওয়া উচিত। ইতিহাসের শিক্ষা বড় নির্মম। আজ যারা হত গরিব, হতদরিদ্র কালের চক্রে উল্টোদিকে ঘুরলে আগামী কালই তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে।

"যার ভয়ে তুমি সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে"

সুতরাং সংশয় নয়, দ্বিধা নয়, দোলাচল মনোবৃত্তিও নয়; দেশপ্রেম ও মানবতাই হোক আমাদের চালিকাশক্তি।[৭৭]

ইসলামী শিক্ষা আলোচনার পূর্বে আমরা 'শিক্ষা' শব্দটিকে সংক্ষেপে আলোচনা করব। শিক্ষা মানে হচ্ছে একটা শিশুকে লালন করা অথবা তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া অথবা নির্দেশনা দেওয়া শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে।[৭৮] আভিধানিক অর্থে শিক্ষা মানে হচ্ছে প্রকাশ করা অথবা প্রণোদিত করা।[৭৯] প্রকৃতপক্ষে, Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে আগত। যার অর্থ হচ্ছে প্রকাশ করা (E মানে বাইরে এবং Duco অর্থ সীসা)। শিক্ষার পদ্ধতি কৌশল বিবর্তনে আধুনিক শিক্ষকরা দ্বিতীয় উৎপত্তিকে বেছে নেয়।[৮০] ল্যাটিন লেখক Varro বলেছেন, educit হচ্ছে ধাত্রীবিদ্যা,

---

[৭৬] শামসুল হক, শিক্ষা প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা নং-০১, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৩ ইং, ঢাকা।
[৭৭] অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ৪৫তম সমাবর্তন বক্তৃতা, ২০০৯।
[৭৮] M. Macdonald, Chambers twentieth century dictionary. p-412
[৭৯] Dr. Mahar Abudl Haque, Educational philosophy of the holy Qur'an. Naushaba Publication, (New Delhi-1991) P-13.
[৮০] Madhury R. Shah, Instruction in Education and teaching technology, Sumaiya Publications Pvt. Ltd. Bombay, New Delhi, p-1

Dhaka University Institutional Repository

educat হচ্ছে পুষ্টি/সেবক, প্রতিষ্ঠান হচ্ছে শিক্ষক, docut হচ্ছে প্রশাসক" । যার অর্থ ধাত্রী বাচ্চা আনয়ন করে, সেবিকা লালন করে, গৃহশিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয় এবং শিক্ষক শিক্ষা দেয় ।[৮১] উৎপত্তিগত অর্থে শিক্ষা শব্দ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি কারো দ্বারা নির্দেশনা যে তার শরীর ও মন নিয়ন্ত্রণ করে । সুতরাং শিক্ষা হচ্ছে শিশুর আচরণের পরিশুদ্ধ করণ যার দ্বারা সে তার পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এবং পরিবেশের পরিবর্তন সাধন যার দ্বারা এটা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে ।[৮২]

শিক্ষাকে ব্যক্তি এবং সমাজের একটা প্রচেষ্টাও বুঝায়, যার দ্বারা সফলতম বংশধরদের মূল্যবোধ, প্রথা এবং তাদের জীবনের ধারণা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছানো বোঝায়, যার দ্বারা তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রম কার্যকরী এবং সফলভাবে পরিচালনা করতে পারে ।[৮৩]

আমরা মাঝে মধ্যে শিক্ষাকে জীবনের একটা অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করি যে শিক্ষা শিশুকে সমৃদ্ধ করবে এবং প্রজন্মের বৃদ্ধি ঘটাবে কিন্তু এটা মোটেও ঠিক নয় । প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা হচ্ছে একটা জীবনব্যাপী পদ্ধতি, "জীবনই শিক্ষা এবং শিক্ষাই জীবন । যা কিছু আমাদের পরিধিকে বৃদ্ধি করে, আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে গভীরতর করে, আমাদের মিথস্ক্রিয়াকে পরিশুদ্ধ করে, আমাদের চিন্তা এবং অনুভূতিকে ত্বরান্বিত করে তাই শিক্ষা ।"[৮৪] তাই আমরা বলতে পারি শিক্ষা জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বরং এটা পুরা জীবনকে অন্তর্ভূক্ত করে দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত । এটা শিশু থেকে পরিপক্কতার উন্নয়নেরও পদ্ধতি । এটা হচ্ছে মানুষের সহজতা ক্ষমতার উন্নয়ন । রুশো বলেন, "শিক্ষা কেবল তথ্য অর্জনই নয় বরং প্রাকৃতিক শক্তির বৃদ্ধি, এটা ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক বৃদ্ধির অর্জন ।"[৮৫] রুশোর মতে কেবল কিছু জ্ঞান ও তথ্য অর্জনই শিক্ষা নয়, এটা সহজাত প্রাকৃতিক শক্তি এবং কার্যকলাপের উন্নয়ন ।

মানুষের বিবেকের উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষা কিছুই না । ফরবেল বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে উন্নয়ন যার দ্বারা তার জীবনের বৃদ্ধি ঘটে যতক্ষণ না এটা সম্প্রদায়ের অর্জনের ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল না হয় এবং মানবতাকে উৎসাহিত করে ।"[৮৬] জন দেবিও একই মত দেন । তার মতে,"শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির সমস্ত যোগ্যতার উন্নয়ন-যার দ্বারা সে তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং তার সম্ভাবনা পূর্ণ করতে পারবে ।"[৮৭] শিক্ষা এক প্রকার প্রশিক্ষণ ও যার দ্বারা সে সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে । পদ্ধতিতে আছে- ১. নির্দেশনা, ২. প্রশিক্ষণ, ৩. অনুশাসন ।[৮৮] কোন কিছু তৈরিতে যখন প্রশিক্ষণটা কোন কাজের বাস্তবিক জ্ঞানের মাধ্যম ।

তথ্য এবং দক্ষতা ছাড়াও কিছু বিশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি আছে যা আচরণ, ব্যক্তির অনুভূতি তৈরিতে সাহায্য করে এবং সমাজ গঠনে সাহায্য করে । এ সকল গোড়ামতবাদ মনে গ্রোথিত হয় অনুশাসনের মাধ্যমে কোন রীতিসিদ্ধ নির্দেশনার মাধ্যমে নয় । উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রকাশ করে যে, প্রশিক্ষণ হচ্ছে শিক্ষার বড় অংশ এবং এই প্রশিক্ষণ একজন মানুষকে প্রকৃত শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করে । পশ্চিমা কতিপয় রাজনীতি চিন্তাবিদ এবং পণ্ডিত এটাকে উন্নয়নের সচেতন পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করে । প্লেটো বলেন, " শিক্ষা মানে আত্মার (বিশ্বপ্রমান্ড) লালন করা যে পরিবেশের প্রত্যেকটি ক্ষেত্র উহার উন্নয়নে সহায়ক ।"[৮৯] এরিস্টটলও একই মত দেন যে, "শিক্ষা মানুষের (মানসিক) শক্তিকে উন্নত করে, বিশেষ করে তার মন ।"[৯০]

আমরা সাধারণভাবে শিক্ষা বলতে জ্ঞান অর্জন বুঝে থাকি । কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিক্ষা বলতে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব, মানসিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কিত আচরণের পরিবর্তন বুঝায় । শিক্ষার পরিসর অসীম । শব্দ দিয়ে বাক্য

---

[৮১] S.N. Jha, The concept of socialism, secularism, democracy & education, Amar Prakhashan (Delhi-1987), P-28.
[৮২] S.N. Jha, The concept of socialism, secularism, democracy & education, Amar Prakhashan (Delhi-1987), P-28.
[৮৩] Manzoor Ahmed, Islamic education, Redifinition of Aims and methodology, Qazi Publications and distributions, vateg Building, Nizamuddin west, New Delhi, p-1.
[৮৪] পূর্বোল্লেখিত Madhury R. Shah-এর পৃষ্ঠা-১.
[৮৫] পূর্বোক্ত S.N. Jha- এর সূত্র, পৃষ্ঠা-২৯
[৮৬] Frederick Foreble, Education of man, (London, Sydney), Appletion, 1907) p-209.
[৮৭] Manzoor Ahmed, Islamic education, Redifinition of Aims and methodology, Qazi Publications and distributions, vateg Building, Nizamuddin west, New Delhi, p-1.
[৮৮] Dr. Mahar Abudl Haque, Educational philosophy of the holy Qur'an. Naushaba Publication, (New Delhi-1991) P-13.
[৮৯] Plato, The Republic, the complete and unabridged Jowett's translation of plato's classic work on the ideal common wealth CA vintage book) vol. 28, p-258.
[৯০] Aristotole, The Politics, Book III (translated by Ernest Barke, 4, Oxford University Press, 1946) p-630.

Dhaka University Institutional Repository

তৈরি করতে পারা বা বায়ু দূষণের কারণ জানা যেমন শিক্ষা তেমনি হাঁস-মুরগির যত্ন নেওয়া বা সাইকেল চালানোর দক্ষতা অর্জন, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা বা দেশের সম্পদ রক্ষা করার মনোভাব অর্জন, সমাজের আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলার মানসিকতা বা ছেলের বিয়েতে যৌতুক না নেওয়ার মূল্যবোধ অর্জনও শিক্ষা। একজন মানুষের জীবনে জন্ম হতে শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। মানব ইতিহাসে এমন কোন সময় ছিল না যখন শিক্ষা ছিল না। এই পৃথিবীতে যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন শিক্ষা থাকবে। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষার প্রকৃতি ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়, পরিধি অসীম এবং প্রক্রিয়া সর্বক্ষণিক।

শিক্ষার শব্দগত বিশ্লেষণ (Education)

শাব্দিক অর্থের দিক থেকে শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি Education. Education শব্দটি E, Ex এবং Due শব্দগুলো থেকে এসেছে। শাব্দিকভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় "Pack the information in and draw the talents out" মূলত এর অর্থ-অবগতি বা জ্ঞান প্রদান, জ্ঞেয় বিষয়ে সুপ্ত বিকাশ। বস্তুত মানুষ করার আয়োজনই শিক্ষা।

শিক্ষা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Education এবং Education শব্দটি এসেছে ল্যটিন শব্দ থেকে। ল্যাটিন ভাষায় তিনটি মৌলিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথমত ঃ Educatum শব্দ থেকে Education শব্দ আসতে পারে। Educatum-এর অর্থ শিক্ষণ কর্ম (Teaching)।

দ্বিতীয়ত ঃ ল্যাটিন Educare শব্দ থেকে Education- এর উৎপত্তি হতে পারে। Educare-এর অর্থ হলো লালন-পালন করা বা প্রতিপালন করা (to rear, to bring up)।

তৃতীয়ত ঃ Education শব্দটি লাটিন Educere শব্দটি থেকেও আসতে পারে। Educere-এর 'e' অংশের অর্থ 'মধ্য হতে' (from) এবং 'ducere' অংশের অর্থ 'বাইরে পরিচালিত করা' (to lead); একত্রে এর অর্থ দাঁড়ায় অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশে সাহায্য করা। উক্ত তিনটি মতের প্রথম দুটি সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট হলেও তিনটির মধ্যেই সম্পর্ক বিদ্যমান।

শিক্ষা শব্দটি সংকীর্ণ ও ব্যাপক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় মতটিকে গ্রহণ করলে বলা চলে 'যা অন্তর্নিহিত গুণাবলী বাইরে প্রকাশ করে তা-ই শিক্ষা।' সুতরাং বুৎপত্তিগত অর্থে শিক্ষা হল অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন।[৯১]

কিছু পশ্চিমা দার্শনিকেরাও এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন,

কমেনিয়াসের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে সমস্ত মানুষের উন্নয়ন"। লক বলেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা সুস্থ শরীরে একটা সুস্থ মনের অর্জন"। রুশোর মতে, "শিক্ষা অভ্যাস গঠন ব্যতীত কিছুই না।" অন্য এক পণ্ডিত বলেন, "শিক্ষা হল শক্তির প্রাকৃতিক ও পদ্ধতি মাফিক উন্নয়ন"। হার্ভাট বলেন, "শিক্ষার উদ্দেশ্য একটা বহুমুখী ভারসাম্যপূর্ণ সুবিধা তৈরি করা।" পি.কে. লেপার "শিক্ষা এমন একটা পদ্ধতি যা ব্যক্তিকে তার শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য হতে সন্ধান দেয়।"[৯২] সুতরাং শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে মূলধন। এটা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনেরও একটা মাধ্যম। সমাজকে পেশা, সেবা এবং অর্থনীতি পরিচালনায় এটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবশক্তি সরবরাহ করে।[৯৩] ফলে এটা স্পষ্ট যে, উহা একটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রজন্ম তৈরির পদ্ধতি।

১৯৫৭ সালে আমেরিকার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিরা মিলিত হয় হার্ভাডে তাদের সরকার পদ্ধতির সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য। অংশগ্রহণকারীদের মৌল ধারণা ছিল গণতন্ত্রই সমাজের সকল প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। তারা সমস্ত শিক্ষাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন যা হল– মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, এবং সুপারিশ করেন যে নিম্নস্তরে, প্রত্যেকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব অর্জনের প্রত্যেক ভাগ থেকে কমপক্ষে একটা কোর্স নিতে হবে।[৯৪] আমেরিকা এবং সাম্যবাদী দেশে শিক্ষাকে প্রশিক্ষণের সচেতন পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

---

[৯১] অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুর রব, বুলেটিন ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, মার্চ ২০০৫ইং, পৃষ্ঠা নং-০৭

[৯২] পূর্বোক্ত সূত্র নং ২, পৃষ্ঠা-১৬৩

[৯৩] পূর্বোক্ত ৬নং সূত্র, পৃষ্ঠা-২

[৯৪] উপরোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-২-৩

Dhaka University Institutional Repository

মহাকবি আল্লামা ইকবালের মতে, মানুষের 'খুদী' বা রুহের ঘটানোর প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা। বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ Professor Syed Muyhammad Kutb এর মত অনুযায়ী, "শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের কাজ-হল পরিপূর্ণ মানবসত্তার লালন করে এমনভাবে গড়ে তোলা, যা এমন একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি যে, মানুষ তার দেহ, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা, তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিক জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের কোনটিই পরিত্যাগ করে না। আর কোন একটির প্রতি অবহেলা বা মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকেও পড়ে না। Professor Kutb তাঁর The Concept of Islamic Education প্রবন্ধে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আবার শিক্ষা মানে হচ্ছে একটা শিশুকে লালন করা অথবা তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া অথবা নির্দেশনা দেওয়া শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নে।[৯৫] আভিধানিক অর্থে শিক্ষা মানে হচ্ছে প্রকাশ করা অথবা প্রণোদিত করা।[৯৬] প্রকৃতপক্ষে, Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে আগত। যার অর্থ হচ্ছে প্রকাশ করা (E মানে বাইরে এবং Duco অর্থ সীসা)। শিক্ষার পদ্ধতি কৌশল বিবর্তনে আধুনিক শিক্ষকরা দ্বিতীয় উৎপত্তিকে বেছে নেয়।[৯৭] ল্যাটিন লেখক Varro বলেছেন, "educit' হচ্ছে ধাত্রীবিদ্যা, educat হচ্ছে পুষ্টি/সেবক, প্রতিষ্ঠান হচ্ছে শিক্ষক, docut হচ্ছে প্রশাসক"।[৯৮]

শিক্ষার পারিভাষিক বিশ্লেষণ

মানবশিশুর বিকাশ এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত তার পিতামাতা এবং অন্যান্য শিক্ষকের উপর যেরূপ নির্ভরশীল, অন্যান্য জীবের মধ্যে সেরূপ নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হয় না। মানবশিশু আগুনকে খেলার জিনিস মনে করে তাতে হাত দেয়, নিজের পায়খানাকে হালুয়া মনে করে মুখে পুরে বসে। কিন্তু কোন বিড়াল শিশুকে এরূপ করতে দেখা যায় না। যে কুকুর মানুষের-মলকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তার শিশুকেও কোনদিন নিজের পায়খানা মুখে দিতে দেখা যায় না। মানুষের শৈশবকাল এ দীর্ঘ যে, পনের-বিশ বৎসর পর্যন্ত তাকে পিতা-মাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানের উপযোগী গুণাবলী অর্জন করতে হয়। অথচ মানুষের ন্যায় দীর্ঘজীবী প্রাণীদের বেলাও বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা যা শিক্ষা দিতে হয়, অন্যান্য জীবশিশু তা সহজাত বৃত্তি দ্বারা আপনা-আপনিই লাভ করে থাকে। কিন্তু মানুষের যাবতীয় জ্ঞানের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। এদিক বিবেচনা করলে মানুষের শিক্ষার সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ আপন প্রয়োজনের তাগিদে ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থার নামই শিক্ষা। এ ধরনের শিক্ষা একমাত্র মানুষেরই প্রয়োজন। অন্যান্য জীব-জানোয়ার এ ঝামেলা হতে মুক্ত। কোনটা খাওয়া ঠিক এবং কোন্‌টা ঠিক নয়, তা জানবার জন্য ছাগশিশুর নাসিকাযন্ত্রের সহজাত ক্ষমতাই যথেষ্ঠ। কিন্তু মানবশিশুকে তা বড়দের নিকট হতে শিখতে হয়।

আমেরিকান শিক্ষাবিদ John Dewey সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "প্রকৃতি এবং মানুষের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ ও মৌলিক মেজাজ প্রবণতা বিন্যাস করার প্রক্রিয়াই শিক্ষা।"

Dr. John Park বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশন ও অধ্যয়ন বা Study-র মাধ্যমে জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন বা প্রদানের কলাকৌশল বা প্রক্রিয়া।"

Herman H. Horne লিখেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত মুক্ত সচেতন মানবসত্তাকে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে উন্নত যোগসূত্র রচনা করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যেমনটি প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, অবেগগত এবং ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশে।" শিক্ষার এ সংজ্ঞাটির মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং উন্নত নৈতিকতা যা স্রষ্টার সাথে সেতুবন্ধন রচনা করার যোগ্যতা রাখে- এমন একটি ধারণা আমাদেরকে দান করে।

প্রত্যেক মানুষ তিনটি সত্তার সমম্বয়। দেহ, মন ও আত্মা। এই তিনটি সত্তার সমম্বয়ে এক-একজন মানুষের অস্তিত্ব। মানব শিশুরজন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ ঘটে, নানা সামাজিক কার্যক্রমে তার মন বেড়ে ওঠে আর আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে নৈতিকতার পরিগঠনের উপর। এ জন্যই কবি মিল্টন বলেছেন ঃ

---

[৯৫] M. Macdonald, Chambers twentieth century dictionary. p-412

[৯৬] Dr. Mahar Abudl Haque, Educational philosophy of the holy Qur'an. Naushaba Publication, (New Delhi-1991) P-13.

[৯৭] Madhury R. Shah, Instruction in Education and teaching technology, Sumaiya Publications Pvt. Ltd. Bombay, New Delhi

[৯৮] S.N. Jha, The concept of socialism, secularism, democracy & education, Amar Prakhashan (Delhi-1987), P-28.

Dhaka University Institutional Repository

Education is the harmonious development of body, mind & soul. দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্য বিকাশই শিক্ষা। মন ও আত্মার উন্নতি সাধন ধর্ম ও নৈতিকতা ছাড়া কি করে সম্ভব তা শুধু আমাদের কাছে কোন কোন বিবেকবান ও কাণ্ড জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছেই বোধগম্য নয়।

আল্লাহর এক বিশেষ কুদরতে মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীই তাদের নিজস্ব আয়োজনে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়। এজন্য তাদেরকে কোন কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না। অথচ মানুষকে জ্ঞানসমৃদ্ধ হওয়ার জন্য একটি পরিকল্পিত কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। মূলত মানুষই হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংঘবদ্ধ জীব। এজন্যই তার এসব আয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। ইহজগতের অন্যান্য প্রাণীদের মতোই মানবশিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়। তার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ও পরিবেশ ইত্যাদি তাকে হিতাহিত জ্ঞানের উন্মেষে সাহায্য করে। তাকে মানুষ ও পশুর মধ্যকার পার্থক্যগুলো শেখায়। শিক্ষাই মানুষকে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথও মিল্টনের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, "মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা"। কোন জাতির সন্তানকে সে জাতির উপযোগী, যোগ্য, দক্ষ, সার্থক ও কল্যাণময়ী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক জাতির শিক্ষাব্যবস্থা এক হবে না। কারণ প্রতিটি জাতির প্রয়োজন, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক চিন্তা, সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচার এক নয়, বরং তা ভিন্ন ভিন্ন।[৯৯]

প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ও স্বতন্ত্র জীবনধারা ও রীতিনীতি আছে। আর আছে তাদের নিজস্ব শিক্ষাধারা। আমরা বাঙালী মুসলমান হিসেবে আমাদের ধর্মীয় ভাবধারাও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত হওয়া একান্তভাবে দরকার। প্রতিটি দেশে যুগে যুগে শিক্ষাবিদ কর্তৃক মানুষের জন্যে যে শিক্ষানীতি অনুসৃত হয় তার একটা উদ্দেশ্য থাকে। কোন কোন দেশের শিক্ষাবিদদের উদ্দেশ্য একটা স্বাধীন জাতি গঠন করা, কোথাওবা দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা। এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা তাদের স্কুলের শিক্ষাক্রমে এমনসব বইপত্র সন্নিবেশিত করেন, যা তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়ক। যেমন- ফ্রান্সে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল স্বাধীন মানুষ তৈরি করা। অতএব ফ্রান্সের প্রথম উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা। ফরাসি সরকারের নতুন ভাবধারা, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব হল ফ্রান্সের শিক্ষানীতির নতুন ও প্রধান অবলম্বন।[১০০]

সততা, ন্যায়ানুবর্তিতা, দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি মমতাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত শিক্ষার ভিত্তি। যে মূল্যবোধ আকাঙ্খাকে ধারণ করে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, তোমরা আজ থেকে তারই প্রতিভূ; সমতা, সততা, ন্যায়ানুবর্তিতা, জীবনে এসব মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেবে এই দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় তোমাদের কাছ থেকে তা–ই প্রত্যাশা করে। তোমরা দেশের মানুষের কাছে সৎ থাকবে। পরিবারের কাছে সৎ থাকবে। সর্বোপরি নিজের প্রতি সৎ থাকবে।[১০১]

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ ঃ

আধুনিককালে শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আচরণের বাঞ্ছিত কল্যাণমূলক বা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তনকে বুঝায়। আচরণের এই পরিবর্তন নতুন অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে হয়ে থাকে। নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন বিভিন্নভাবে হতে পারে। দেখে, শুনে, পড়ে, কাজ করে, ঠেকে, বুঝে, অনুভব করে ইত্যাদি নানাভাবে। শিক্ষার ব্যাপক অর্থ সম্পর্কে নিচে আলোচনা উপস্থাপন করা হলোঃ

শিক্ষা দ্বারা যে কোন নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করা বুঝায়। রেমন্ট (Raymont) তাঁর Principles of Education বইতে শিক্ষার ব্যাপক অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন, "শিক্ষা হল মানুষের শৈশব থেকে পরিপক্বতার স্তর অবধি একটি বিকাশের পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ নিজেকে ধীরে ধীরে তার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের খাপ খাইয়ে নেয়"। হর্নী (Horne) এর অর্থকে অন্যভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, "শিক্ষা মানুষকে একটি উন্নত ধরনের উপযোজন বা সংগতিবিধানের ক্ষমতা এনে দেয়। দেহে ও মনের এই সংগতি সাধনের ক্ষমতা নিয়ে মানুষ তার বুদ্ধিগত বা অনুভূতিপ্রবণ পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়।"

[৯৯] সংকটাবর্তে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঃ উত্তরণের উপায়, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ১-২
[১০০] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ০৩-০৪
[১০১] মাননীয় উপাচার্যের বক্তব্য, প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ, সমাবর্তন বক্তৃতা, ৪৪তম সমাবর্তন-২০০৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) তাঁর Outlines of Social Philosophy বইতে শিক্ষার সংজ্ঞাকে সংকীর্ণ অর্থে ও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা আমাদের সমগ্র জীবন ধরে চলতে থাকে এবং জীবনের সবরকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে। তিনি বলেন, 'এই অর্থে এটি হল সাধারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত এবং যার দ্বারা মানুষ তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও যে বিশ্বে তারা বসবাস করে তার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে। শিক্ষার এই ব্যাপক অর্থকেই ব্যাখ্যা করে হোয়াইটহেড (Whitehead) বলেছেন, শিক্ষার একটি মাত্র বিষয় আছে এবং তা হলো সর্বোতভাবে প্রকাশিত জীবন।[১০২]

শিক্ষা কথাটি আমাদের নিকট খুবই পরিচিত। এটি এমন একটি শব্দ যার অর্থ এক কথায় প্রকাশ করা কষ্টকর। যুগের পরিবর্তনের সাথে এর সব ধরণার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কথাটি কখনো সংকীর্ণ, আবার কখনো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর বুৎপত্তিগত অর্থের সাথে ব্যবহারিক অর্থের বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মনীষী একে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন।

কথাটির অর্থের তারতম্যের সাথে সাথে তারতম্য ঘটে এর পরিধিরও। শুধু শিক্ষা কেন? শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট বহু কথা আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি। যেমন– স্বাক্ষর, নিরক্ষর, সবার জন্য শিক্ষা, গণশিক্ষা, মৌলিক শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপনুষ্ঠানিক শিক্ষা, আরও কত কি! শিক্ষা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট এসব কথা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।[১০৩]

শিক্ষা সম্পর্কে আরও একটি বিষয় জানা দরকার। একটি শিশু অন্যকে পকেট মারতে দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করল। এই নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে আচরণের পরিবর্তন হল। এখন সে পকেট মারতে পারে। শিশুর আচরণের এই পরিবর্তনকে শিক্ষা বলা যাবে না। কারণ, পকেট মারা অবাঞ্ছিত, সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত বা কল্যাণমূলক আচরণ নয়। মনোবিজ্ঞানে আচরণের যে কোন পরিবর্তনই শিখন। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্বে আচরণের বাঞ্ছিত বা কল্যাণমূলক পরিবর্তনকেই শিক্ষা বলা হয়। আমরা এ যাবত যে আলোচনা করলাম এর মূল কথা হলো, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে সঠিক অর্থে শিক্ষা বলতে অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে আচরণের বাঞ্ছিত, কল্যাণমুলক ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত পরিবর্তনকে বুঝায়।

শিক্ষা হচ্ছে মানসিক গুণাবলির অনুশীলন মাত্র। আবার কারো কারো মতে, বস্তু জগতের দ্রব্যসামগ্রী ও তার গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান হওয়ার নামই শিক্ষা। কেউবা মনে করেন, বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের অর্থই শিক্ষা। কিন্তু যারা সমাজের সাধারণ লোক তারা শিক্ষা বলতে বিদ্যার্জনকেই বুঝে থাকেন। অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যাকে শিক্ষা বলে মনে করে থাকেন। শিক্ষাকে তিনি যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করেন না কেন, কোনটাকেই যেমন একেবারে বাদ দেওয়া যায় না বা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি আবার সেগুলোকে শিক্ষার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা বলে গ্রহণও করা যায় না; যেমন অ, আ, বা, তা সা, এগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষা বলে ধারণা করা হয় বটে। কিন্তু তাই বলে আসলে তাকে সত্যিকারের শিক্ষা বলা যায় না। বরং সেগুলো শিক্ষার উপকরণ মাত্র।[১০৪]

শিক্ষা সম্পর্কে পাশ্চাত্য মতাদর্শ ঃ

১। এ্যারিসটোটল (খ্রিঃ পুঃ ৩৮৪-৩২২) ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ধর্মের পবিত্রতার মধ্য দিয়ে সুখ লাভ করা।
২। কমেনিয়াস (খ্রিঃ ১৫৯২-১৬৭০) ঃ শিক্ষা হল মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করাই মানুষের শেষ লক্ষ্য।
৩। জ্যাঁ জ্যাক রুশো (খ্রিঃ ১৭১২-১৭৭৮) ঃ শিক্ষা হল শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ। সুঅভ্যাস গঠন করাই শিক্ষার লক্ষ্য।
৪। জোহেন হেনরিক পেস্তালৎসী (খ্রিঃ ১৫৪৬-১৮৯৭) ঃ শিক্ষার অর্থ হল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থের স্বাভাবিক, সুষম ও প্রগতিশীল বিকাশ। মাথা, মন ও হাত এই তিনের সমন্বয়েই শিক্ষা।
৫। জন ডিউই (খ্রিঃ ১৮৫৯-১৯৫২) ঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মউপলব্ধি। শিক্ষার অর্থ প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবনযাপন প্রণালি, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।[১০৫]

---

[১০২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং-০৮
[১০৩] অধ্যাপক খান আলাউদ্দিন, সম্পাদক শিক্ষানীতি আই, ই, আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পি, টি, আই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, পৃষ্ঠা নং-০১,
[১০৪] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ০২
[১০৫] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা নং-০৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার এর দৃষ্টিতে,

আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা আমলা শ্রেণীর দৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং উচ্চশিক্ষা আমলাশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। উপরোক্ত মতামতের উদ্যোক্তা হচ্ছেন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েবার। ম্যাক্সওয়েবার তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত তত্ত্বকে দু'টো মাত্রা থেকে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। প্রথমত, সমাজজীবনে অর্থনৈতিক ক্ষমতার চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে তিনি স্বাধীন চলক (ইন্ডিপেণ্ডেন্ট ভেরিয়েবল) হিসেবে বিবেচনা করেন; এবং দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ক্রিয়াশীল করার জন্য আমলাশ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করেন। তাই তাঁর মতে, আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে- বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও মানস গঠনের মধ্য দিয়ে আমলাশ্রেণীর সৃষ্টি করা, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে জনজীবনে প্রয়োগের হাতিয়ারি হিসেবে সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমাজবিজ্ঞানীদের উপরোক্ত তত্ত্বীয় প্রক্ষেপণ থেকে প্রতিভাত যে শিক্ষার সামাজিক উপযোগিতা প্রধানত দু'টো মাত্র থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যথা– (১) শিক্ষা সামাজিকীকরণ ও সামাজিক সংহতি সহায়ক, এবং (২) শিক্ষা সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি তথা সামাজিক মেরুকরণের নিমিত্তে ক্রিয়াশীল। বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ সন্ধানের ক্ষেত্রে উপরোক্ত দু'টো তত্ত্বীয় প্রক্ষেপণের অনুসরণ ও বিবেচনা অপরিহার্য।[১০৬]

শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের মতামত ঃ

(১) সক্রেটিসের মতে, "শিক্ষা হল মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের আবিষ্কার।"

(২) দার্শনিক প্লেটোর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে সেই শক্তি, যার দ্বারা সঠিক সময়ে আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিবোধ জন্মায়। ইহা শিক্ষার্থীর দেহ ও মনে সকল সুন্দর ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত করে তোলে। [Education is the capacity to feel pleasure and pain in the right moment. It develops in the body and in the body and in the soul of the pupil all the beauty and all the perfeetion which he is capable of.]

(৩) দার্শনিক এরিস্টটলের মতে, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা দেহ-মনের সুষম ও পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনের প্রকৃত মাধুর্য ও পরম সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে।" [Education is the creation of a sound mind in a sound body. It develops man's faculty specially his mind so that he may be able to enjoy the contemplation of supreme truth, goodness and beauty in which perfect happiness essentially consists.

(৪) শিক্ষাবিদ কমেনিয়াসের মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোক ও পরলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। শিক্ষার সাহায্যে মানুষ নিজেকে ও বিশ্বকে জানতে পারে।"

(৫) শিক্ষাবিদ থমসন (G.H. Thompson) বলেছেন, "শিক্ষা বলতে আমরা শিশুর উপর পরিবেশের প্রভাব বুঝি।

(৬) জন লকের মতে, "সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের সৃষ্টি হল শিক্ষা।"

(৭) হেনরিক পেস্তালোজীর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যের স্বাভাবিক, প্রগতিশীল ও নিয়মানুগ বর্ধন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ।"

(৮) ফ্রেডারিক হার্বার্ট-এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভার ও অনুরাগের সুষম প্রকাশ এবং নৈতিক চরিত্র গঠন।"

(৯) ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেলের মতে, "সুন্দর বিশ্বস্ত এবং পবিত্র জীবন উপলব্ধি হল শিক্ষা।"

(১০) ফ্রেন্সিস পার্কারের মতে, "মানুষের সকল প্রকার সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষা।"

(১১) জন ডিউইর মতে, "আত্মোপলব্ধিই হল শিক্ষা।"

(১২) লেনিনের মতে, "মুক্তি সংগ্রামই শিক্ষা।"

(১৩) Whitehead-এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে জ্ঞানার্জন এবং সুষ্ঠু প্রয়োগের একটি পরিকল্পনা এবং কৌশল মাত্র।"

(১৪) রাসেল-এর ভাষায়, "শিক্ষা হচ্ছে কতিপয় মানবিক গুণ। যথা- সাহস, উদ্যম, অনুভূতিশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির বিকাশ সাধন।"

(১৫) ক্যান্টের মতে, "আদর্শ মনুষ্যত্ব অর্জনই শিক্ষা।"

(১৬) হার্বার্ট স্পেনসারের ভাষায়, "পরিপূর্ণ জীবনযাপনই শিক্ষা।"

(১৭) হার্বার্ট রীডের মতে, "মানুষকে মানুষ করাই শিক্ষা। স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য সম্যক উপলব্ধি করতে সাহায্য করে, তা শিক্ষা।"[১০৭]

---

[১০৬] মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ, বাণিজ্য খণ্ড-৮, ১৯৩২। পৃষ্ঠা নং-২৯৮-২৯৯,

[১০৭] আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা, পৃষ্ঠা নং-১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

মনীষীদের প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের মতামত থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মনীষীদের কেউই শিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদাভাবে দেখেননি। তাদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, শিক্ষার প্রয়োজন জীবনের জন্যই।

অতএব সংক্ষেপে শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।[১০৮]

যে জাতি শিক্ষায় যত উন্নত সে জাতি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক এবং তাহযীব ও তমদ্দুনের দিক দিয়েও ততধিক উৎকর্ষতা অর্জন করেছে। তাই বলা যায়, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর সভ্যতার মূল চাবিকাঠি হল সংস্কৃতি। দর্শন ও ভাবধারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি সব কিছুরই পরশকাঠি হল শিক্ষা। শিক্ষা যেমন একটা জাতিকে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করায়, তেমনি শিক্ষাহীনতা একটি জাতিকে অধঃপতিত করে। শিক্ষায় যে জাতি জাগতে পারেনি, তার আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

মনজুর আহমেদ বলেন, "সমাজতান্ত্রিক দেশ তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। ক্লোস মেহনার্ট যাকে "The Soviet man" বলেছেন। তাই তৈরিতে এ পদ্ধতি সাহায্য করে,[১০৯] কিন্তু এ জাতীয় বিশেষ সমাজনির্ভর পদ্ধতি অন্য সমাজের এবং দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। প্রকৃত এবং কাঙ্খিত শিক্ষার উচিৎ ব্যক্তির সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। তার জানা উচিৎ নিজের সমাজ, দেশ ও অন্যের দেশ। প্রকৃতপক্ষে মানুষের অনেক যোগ্যতা থাকে যার অধিকাংশ সুপ্ত থাকে যদি না সেগুলোকে জাগিয়ে তোলা হয়। অবশ্য অদৃশ্য মানসিক শক্তির জাগরণে একটা উপযুক্ত পরিবেশের দরকার। যদি কোন রাষ্ট্র বা সমাজ তার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধক হয় তবে সে কখনো তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না। তার জন্য স্বাধীন ভাবেচিন্তা করা উচিত। এর জন্য মুক্ত এবং স্বাধীনচেতা উদার পরিবেলে দরকার। কোন সাম্যবাদী অথবা একক আঙ্গিক বিশিষ্ট পদ্ধতি উদার চেতনার জন্য পরিবেশ তৈরি করতে পারে না, তাই এটাকে আমরা এক প্রকার প্রতিবন্ধক মনে করতে পারি, যেখানে মানুষ তার সুপ্ত মানসিক ক্ষমতা সমৃদ্ধ করতে পারে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা কেবল তাকেই সাহায্য করে। সকল মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয় না। তাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্যক্তি তার সমাজ, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সকল মানুষের কল্যাণ।

তাই এস.এন. জহা বলেন, "শিক্ষা একটা পদ্ধতি যার দুটি দিক আছে, মানসিক এবং সামাজিক দিক।" মনস্তাত্ত্বিক দিক শিশুর নির্দেশনা এবং সহজাত ক্ষমতার শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করে যা সমস্ত শিক্ষার শুরু দিক। এই সামাজিক দিক সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত শিক্ষাই আসে সামাজিক জীবনে ব্যক্তির অংশগ্রহণের মাধ্যমে। শিশুর জন্য সামাজিক জ্ঞান জরুরি। সুতরাং সামাজিক মাধ্যমের ভেতর দিয়ে শিশুর মানসিক শক্তির প্রেরনাই সত্যিকার শিক্ষা।[১১০] উপরোক্ত বিষয় থেকে আমরা শিক্ষার দুটি দিক পাই। একটা হলো তার ব্যক্তিত্ব অপরটি তার সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এই দৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষা জীবনের সমস্ত ব্যাপ্তিকে অন্তর্ভূক্ত করে। মহাত্মা গান্ধী বলেন, "শিক্ষা বলতে আমি বুঝি শিশু এবং মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রসারণ। তিনি আরও বলেন "সত্যিকার শিক্ষা তা যা বের করে এবং প্রেরণা দেয় আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিভিত্তিক এবং শারীরিক বিকাশে।[১১১] তাই শিক্ষার অর্থ খুঁজতে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। উৎপত্তি এর বিভিন্ন অর্থ দেয়; কেউ এটাকে প্রশিক্ষণ আবার কেউ উদ্ভাবনের পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে প্রায় অধিকাংশ চিন্তাবিদই শিক্ষাকে একটা উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে, কারণ একজন মানুষের উন্নয়ন হয় শিক্ষার দ্বারা-যা প্রতিষ্ঠান বা প্রকৃতি থেকে আসে। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা ব্যক্তির, সামগ্রিক উন্নয়ন। ভিন্নতা সত্ত্বেও শিক্ষার মতবাদের মধ্যে কতিপয় সাধারণ সম্পর্ক পাওয়া যায়। যেমনঃ

ক. শিক্ষা উন্নয়নের পদ্ধতি; উন্নয়ন বলতে আমরা ব্যক্তিত্বের উন্নতিকে বুঝি। এটা শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যন্ত উন্নয়নের পদ্ধতি। এটা ব্যক্তির সহজাত পাওয়া এবং যোগ্যতার উন্নতি।

---

[১০৮] আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা, পৃষ্ঠা নং-১৩
[১০৯] উপরোক্ত সূত্র
[১১০] S.N. Jha- এর পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-৩০
[১১১] উপরোক্ত সূত্র।।

Dhaka University Institutional Repository

খ. শিক্ষা আচরণ গঠনের কাজ : শিক্ষা সহজাত আচরণ থেকে পরিচর্যাকৃত আচরণে পরিবর্তন করে। এটা মানুষকে নতুন গঠন দেয়। এটা জীবনব্যাপী পদ্ধতি। একজন ব্যক্তি এক বা ভিন্নরূপে শিক্ষাগ্রহণ করে যার মাধ্যমে সে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে।

গ. শিক্ষা প্রশিক্ষণের সচেতন পদ্ধতি: শিক্ষা শিশুদের প্রশিক্ষণের সচেতন পদ্ধতি বয়স্কজীবনের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য। যে সমাজে শিশু বাস করে সেখানে শিক্ষা তাকে বয়স্কজীবনের প্রশিক্ষণ দেয়। শিক্ষা ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক প্রশিক্ষণ যাতে সে জীবনের সমস্যা ও সুযোগ সঠিক সাড়া দিতে পারে।

ঘ. শিক্ষা সুসংহত উন্নতি : মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পরিবর্তনের মুখ দেখে। এ সকল পরিবর্তন হতে পারে শারীরিক, মানসিক এবং আবেগজনিত; যেথায় এবং যখনই কোন পরিবর্তন সেখানেই বিকাশ। বিকাশ তাই শারীরিক অঙ্গের আর মানসিক কার্যকলাপের ফলাফল। দুটি বিষয়; প্রশিক্ষণ এবং পরিবেশ এটা নির্ধারণ করে। পরিবেশ যেভাবে শিক্ষা দেয় একজন ব্যক্তি সেভাবেই কার্য সম্পাদন করে, প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। তাই সে নতুন গঠনে স্থানান্তরিত হয়। এ সমস্ত স্থানান্তর হলো বিকাশের পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিই শিক্ষা।

ঙ. শিক্ষা পরিবেশের প্রভাব : শিক্ষা হচ্ছে ব্যক্তির উপর পরিবেশের প্রভাব। বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা প্রত্যেক প্রভাবকে অন্তর্ভূক্ত করে। বাসার জীবন, সামাজিক জীবন, সরকার পদ্ধতি, বিদ্যালয়, আনন্দ, ভ্রমণ সবই শিক্ষার প্রতিনিধি। সংকীর্ণ দৃষ্টিতে, শিক্ষা কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ। এটা এমন প্রভাবকে অন্তর্ভূক্ত করে যা শিশুর উন্নয়ন এবং বিকাশে সহায়তা করার জন্য সুবিন্যাস্ত। বিদ্যালয় সরাসরি এবং পদ্ধতিগতভাবে রীতিসিদ্ধ শিক্ষার উপহার দেয়।

সংক্ষেপে সত্যিকার শিক্ষা হচ্ছে শরীর, মেধা এবং জ্ঞানের প্রশিক্ষণ যা কাউকে সঠিক ও ভুলের মাঝে পার্থক্য করতে শেখায়, শিক্ষার আরেকটি দিকও এখানে উল্লেখযোগ্য। অজানাকে জানা হচ্ছে জ্ঞান এবং এটা পদ্ধতিগত বা পদ্ধতিহীন ভাবে, প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিকহীনভাবে হতে পারে। কিন্তু শিক্ষা হচ্ছে সুবিন্যাস্ত নির্দেশনা সহ শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযোজনীয় জিনিস। সুতরাং শিক্ষা হচ্ছে প্রশিক্ষণের একটা পদ্ধতিগত মাধ্যম যা একটা প্রজন্মকে সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য করে তোলে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১। শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা।
২। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন।
৩। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
৪। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণীত করা।
৫। চিন্তা ও মননে দেশাতৃবোধ ও জাতীয়তাবোধ
৬। বিশ্বভ্রাতৃত্ব
৭। মানুষের প্রতি সৌহার্দ্য ও সহমর্মীতাবোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করা।[১১২]

কোন জাতি কতটা সভ্য, তা নির্ণয় করবার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ সাহিত্য। এসবের ভেতর দিয়ে জাতির আশা-আকাঙখা পরিস্ফুটিত হয়; নৈতিক ও সামাজিক মানের পরিমাপ পাওয়া যায়; এবং কর্মক্ষমতা, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, এককথায় জাতীয় আদর্শের ভিত্তি-ভূমির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। জাতীয় ঐতিহ্য অবশ্যই অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানের চেষ্টায় পরিপুষ্ট হয়। তাছাড়া এর ভবিষ্যত স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য শিশু-কিশোর ও নওজোয়ানদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করে দিতে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উপরেই সর্বাধিক নির্ভর করে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার এত গুরুত্ব।[১১৩]

শিক্ষা একটি প্রগতিশীল প্রক্রিয়া। শিক্ষার অর্থ এবং তাৎপর্য দেশ ও সময় ভেদে পরিবর্তিত হয়। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য বিভিন্ন সমাজের চাহিদা ও মতাদর্শেরভিত্তিতে নির্ণিত হয়ে থাকে। শিক্ষার এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সর্বজনীন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে। এ উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

---

[১১২] শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পৃষ্ঠা নং- ০৫, হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৯ইং

[১১৩] কাজী মোতাহার হোসেন, শিক্ষা প্রবন্ধ সংকলন, পৃষ্ঠা নং-০৮, শিক্ষা পুস্তক প্রকাশ কমিটি, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ইং, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

১। সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।
২। সমাজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা।
৩। সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা।
৪। সমাজবিরোধী সকল তৎপরতা রোধ করা।
৫। ব্যক্তি ও শ্রেণীবৈষম্যের নিরসন করা।
৬। সমাজ সংরক্ষণ করা।
৭। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
৮। নৈতিক চরিত্র গঠন করা।[১১৪]

উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক গুণাবলী অর্জন করা। দুর্ভাগ্যবশত তা হচ্ছে না। আমাদের জাতীয় নৈতিক অবক্ষয়ের এটিও একটি কারণ।[১১৫]

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার বিশ্লেষণ

শিক্ষা সম্পর্কে যেসব আলোচনা করা হল তা শুধু পার্থিব জীবনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু পার্থিব জীবনই যে জীবনের শেষ নয়, পার্থিব জীবনের যেখানে শেষ, সেখানেই অনন্ত ও স্থায়ী জীবনের শুরু। বাস্তবিকপক্ষে সৃষ্টির সেরা হল মানুষ। তাই মানুষের জীবন এত সীমিত হতে পারে না। পার্থিব জীবন শেষে আমাদের কাছে যে মৃত্যু আসে সে তো মানুষের উভয় জীবনের সেতুবন্ধন। ইহজীবন থেকে অনন্ত জীবনে উত্তরণের উৎসই হল মৃত্যু বা ইন্তেকাল। এজন্যই রস (J.M. Ross) বলেছেন, "Education must be religious, moral, intellectual and aesthetic. None of the aspects may be neglected is a harmonious balanced personality is to be the result."

ইহকালীন জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু পরকালীন জীবন তো আর ক্ষণস্থায়ী নয়। তা অনাদী, অসীম, অনন্ত ও চিরস্থায়ী। তাই অনাদী ও চিরস্থায়ী জীবনের উত্তরণে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাই অর্জন করা দরকার। তাহলেই মানুষ যে সৃষ্টির সেরা তা প্রমাণ করার সুযোগ আসবে। আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল তার বিবেক ও জ্ঞানবুদ্ধি। একমাত্র বিবেক ও জ্ঞানবুদ্ধি দ্বারাই পৃথিবীতে মানুষ সবকিছুকেই করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যার বাহন হলো শিক্ষা। সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক স্থাপনের মূল উৎসই হল শিক্ষা। আর তাই কুরআনে বলা হয়েছে, "একমাত্র বিদ্বানগণই আল্লাহকে ভয় করে থাকেন।"[১১৬]

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা লাভের উপায় হচ্ছে জ্ঞানার্জন। এই জ্ঞান অর্জন আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেও হতে পারে, আবার অনানুষ্ঠানিকভাবেও হতে পারে। মানব জন্মের ঊষালগ্ন থেকেই জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া চলে আসছে। প্রাথমিক যুগে মানুষকে খাদ্য, আহার, বাসস্থান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যপশুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা নতুন অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষা বলা হতো। শিক্ষা বলতে সেইসব নতুন অভিজ্ঞতাকেই বুঝায়-যা মানুষ ও সমাজ উভয়ের জন্য মঙ্গলজনক। যে সব অভিজ্ঞতা মানুষ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়, তা শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষা বলে গ্রহণ করা হবে না–যদিও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তা শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে। যেমন- চুরি করা, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা প্রভৃতি অপরাধমূলক অভিজ্ঞতাও মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে, আচরণগত পরিবর্তনে সহায়তা করে। কিন্তু তাই বলে এ ধরনের অসামাজিক এবং অনৈতিক কার্যগুলোকে শিক্ষা বলে অভিহিত করা যায় না। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত সকল আচরণকেই বুঝায়।

মনোবিজ্ঞানে আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম যে কোন অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষণ বলা হয় এবং শিক্ষাতত্ত্বে যে কোন শিক্ষণকেই শিক্ষা বলা হয় না। এখানেই শিক্ষা এবং শিক্ষণের মধ্যে পার্থক্য। সকল শিক্ষাই শিক্ষণ কিন্তু সব শিক্ষণ শিক্ষা নয়। এখন কোন শিক্ষণ শিক্ষামূলক, সমাজ ও ব্যক্তির জন্য মঙ্গলজনক তা নির্ধারণ করাই শিক্ষা বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য।[১১৭]

এ অধ্যায়ের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় শুধু পবিত্র কুরানুল করীমের উক্তিটি দিয়েই সমাপ্তি টানতে চাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতিকে সঠিক জীবন যাপনের জন্য যেসব মহান নবী রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা সকলেই ছিলেন মানবতার

---

[১১৪] মোঃ হাস্মতুল্লাহ, শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান, পৃষ্ঠা নং-২১, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা।
[১১৫] আনোয়ারুল করিব, শিক্ষাঙ্গণ, প্রথম আলো, ২৫শে ২০০৬ইং
[১১৬] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ০৩।
[১১৭] আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা, পৃষ্ঠা নং-১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

মহান শিক্ষক। আল্লাহ তাঁদের কাজ সম্পর্কে নিজেই বলেন, "তারা আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শন বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের মানদণ্ড সম্পর্কে মানুষকে পড়ে শুনান, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন আর শিক্ষা দেন জীবন যাপনের কৌশল অথচ এর পূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত।"[১১৮]
(সূরা আল জুমুআ-২)

শব্দের কিছু হেরফের হলেও নবীদের শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কালাম পাকে আল্লাহ তায়ালা কমপক্ষে তিন বার শিক্ষা সম্পর্কে একথাগুলো উচ্চারণ করেছেন।

উপরোক্ত সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ থেকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, শুধু দৈহিক, বস্তুগত, প্রযুক্তিগত বা ভাষাগত বুৎপত্তি অর্জনের নামই শিক্ষা নয়। তার দেহ, মন, আত্মা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির নামই শিক্ষা।

আর এর জন্য ধর্ম, নৈতিকতা, আল্লাহর অস্তিত্ব, তার ঐশী হেদায়াত, যার মাধ্যমে মানবজাতি ভাল-মন্দ বা হক-বাতিলের জ্ঞানার্জন করার সুযোগ পেয়েছে, তাই হওয়া উচিত শিক্ষার ভিত্তি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দার্শনিক প্লাটো বলেছেন, "কোন মানুষ বা জাতির বিশ্বাস বা Commitment এবং তার দেশ পরিচালনার জন্য রচিত সংবিধানই হওয়া উচিত শিক্ষার ভিত্তি"।

শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক ধারণা ঃ

(১) জ্ঞান আহরণ।
(২) সামাজিকীকরণ।
(৩) বৃত্তিমূলক যোগ্যতা সৃষ্টি।
(৪) নতুন ভাবধারার সৃষ্টি।
(৫) শিক্ষা জীবনের বিকাশ।
(৬) শিক্ষা নির্দেশনার প্রতিরূপ।
(৭) সামাজিক উত্তরাধিকার সঞ্চালণ।
(৮) নাগরিকতা ও আন্তর্জাতিকতার বিকাশ।[১১৯]

শিক্ষার কাজ ঃ

শিক্ষার মাধ্যমে 'আলোকিত' মানুষ গড়ে তোলার প্রয়াস জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে তোলা যে কোন শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। একুশ শতকের যাত্রাকালে পৃথিবীব্যাপী অশান্ত পরিবেশ, সামাজিক সমস্যা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ভোগবাদী জীবনম যাপন, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার অভাব, হিংসা, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতার প্রকাশ, সহনশীল ও গণতান্ত্রিক আচরণের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবের কারণে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি পুনরায় সবার দৃষ্টি ফেরাতে হয়েছে।[১২০]

শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তিনটি উপাদান পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ, দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিকাশ (যেমন সততা ও ন্যায়বোধ, দয়া ও ত্যাগের অনুভূতি ইত্যাদি); এবং তৃতীয়ত, শিক্ষার একটি আদর্শিক প্রেরণা (Ideological motivation) প্রয়োজন, যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণ সাধন।[১২১]

জীবনের ধর্ম হচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সংগতি সাধন করা। এই সংগতি সাধন চার ভাগে সম্পন্ন হতে পারে– ব্যক্তিগত সংগতি সাধন, ব্যক্তি জীবনের সুষম উন্নয়ন, সমাজ সংরক্ষণ ও অগ্রগতি সাধন।

---

[১১৮] সূরা আল জুমুয়া -২।
[১১৯] আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা, পৃষ্ঠা নং-১৫-১৮।
[১২০] আকু গামিদ লতিফ, শিক্ষা শিখন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাবি, পৃঃ-২৩, ঢাকা।
[১২১] আবদুর নূর, শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি: শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ, পৃষ্ঠাঃ ২৩৫, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

(১) ব্যক্তিগত সংগতি সাধন ঃ পরিবেশের সঙ্গে সংগতি সাধনের ক্ষেত্রে মানুষ যেমন নিজে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তেমনি সে পরিবেশেরও পরিবর্তন সাধন করে। মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব যেমন গভীর, অসীম, পরিবেশের উপরও মানুষের প্রভাব তেমনি অসীম। মানুষ ও পরিবেশের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য এখানেই।

(২) ব্যক্তি জীবনের সুষম উন্নয়ন ঃ শিক্ষা শুধু ব্যক্তির সংগতি বিধানে সাহায্য করে তাই নয়, ব্যক্তি জীবনের সুষম বিকাশেও সহায়তা করে। ব্যক্তি জীবনের এই সুষম বিকাশ নির্ভর করে তার নৈতিক মূল্যবোধের উপর। আর এই নৈতিক মূল্যবোধ অর্জিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে। ব্যক্তি জীবনের দুটি দিক আছে– বহির্জগত ও অন্তর্জগত।
বহির্জগতে শিশু পরিবেশের সঙ্গে সংগতি সাধন করে বেঁচে থাকতে চায় এবং অন্তর্জগতে তার যে আশা-আকাঙ্খা আছে তার পরিতৃপ্তি সাধন করতে চায়। এইসব আশা-আকাঙ্খা, বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ, প্রবণতা এবং বিভিন্ন ধরনের নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। তার এইসব আশা-আকাঙ্খা প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। সুতরাং শিক্ষার কাজ হচ্ছে ব্যক্তির বহির্জগত ও অন্তর্জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে তার সুষম বিকাশে সহায়তা করা।

(৩) সমাজ সংরক্ষণ।
(৪) প্রগতি।

শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার লক্ষ্য কি?

এ প্রশ্নের কোন সংক্ষিপ্ত উত্তর নেই। বাস্তবিকপক্ষে এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর পাওয়াও সম্ভব নয়। শিক্ষার সংজ্ঞার মধ্যে লক্ষ্যের সূত্র নিহিত। মানুষের জীবন সীমিত কিন্তু এই সীমিত জীবনের প্রস্তুতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একালের শিক্ষার আয়োজন ব্যাপক ও বহুমুখী। মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্য, তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখায় জন্য, তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার এ আয়োজন।

মানুষের সভ্যতা, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, সমাজব্যবস্থা, রুচি-পরিবেশ এমন কি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা প্রণালি সবই মানুষের শিক্ষার ফল, তার আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায়ের ফসল। অপরপক্ষে কোন সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সে সমাজের সামগ্রিক জীবনযাত্রা প্রণালি ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি। ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য, কাঠামো ও মান নির্ণীত হয়। শিক্ষার সুন্দরতর, উন্নততর জীবন ও সমাজ গঠনের প্রধান হাতিয়ার একথা সত্য। একথাও সত্য যে, যে সমাজ যত উন্নত সে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা তত জটিল।

সকল যুগে, সকল দেশে, সকল সমাজে, জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ এক থাকেনি। যুগে-যুগে দেশে-দেশে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছে। তারা নব নব আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত ও কর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিবেশ ও প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে নিজ জীবনাদর্শের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে কালপ্রবাহের অনিবার্য ধারায়, বিচিত্র পটভূমিতে মানুষের শিক্ষার লক্ষ্য যুগে যুগে দেশে দেশে রূপান্তরিত, বিবর্তিত হয়েছে। দেখা যায় প্রায় সমসাময়িককালে এক দেশে যখন শিক্ষার লক্ষ্য ছিল যোদ্ধা প্রস্তুত করা তখন অন্য দেশে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল দক্ষ রাজকর্মচারী সৃষ্টি করা এবং তৃতীয় দেশে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল উপাসনার আনুষ্ঠানিকতা চর্চা করা। আবার একই দেশে এককালে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন ভদ্রলোক সৃষ্টি করা এবং অন্যকালে সে দেশের শিক্ষার লক্ষ্য হয়েছে কুশলী-কর্মী সৃষ্টি করা। প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়।[১২২]

শিক্ষাকে যে কোন দেশের উন্নয়নের মূল্যভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কর্মসংস্থান, আয়, উৎপাদনশীলতা, স্বাস্থ্য ও জন্মনিয়ন্ত্রনের উপর শিক্ষা একটি তৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আত্মনির্ভরতা ও সমৃদ্ধিও মেরুদণ্ড হচ্ছে অর্থনীতি যা শুধু শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য কৌশলগত ব্যবস্থারই ফসল। আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষাগত দিক থেকে সকল দেশগুলোই গতিশীল অর্থনীতির অধিকারী হয়েছে। জাপান, কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানের মতো উন্নত দেশগুলো শিক্ষাখাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করে থাকে। এরই ফল স্বরূপ তারা দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। মুসলিম বিশ্বও যদি উন্নত

[১২২] শামসুল হক, শিক্ষা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা নং-০২ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৩ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

দেশগুলোর সারিতে যুক্ত হতে চায় তবে তাদেরকে শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করতে হবে। কেননা উন্নয়ন অর্জনে শিক্ষা অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে।[১২৩]

তাছাড়া শিক্ষার দ্বারা একটা জাতির মান নির্ণয় করা যায়। এ এমন একটি ধারবিহীন অস্ত্র যা দিয়ে চিন্তা জগতের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে থাকে। শিক্ষার আরবি প্রতিশব্দ ইল্‌ম বা জ্ঞান এবং বিশেষ ক্ষেত্রে হিকমত বা কৌশল হিসেবে এর প্রয়োগ। সৃষ্টির সূচনা হতেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছে। পৃথিবীর আদি পিতা আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমেই ফিরিশতাকুলের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। উপস্থিত ফিরিশতাকুল জ্ঞানরাজ্যে আদম (আঃ) অভূতপূর্ব সাফল্য লক্ষ্য করে তাকে শিক্ষক হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হন এবং আল্লাহর হুকুমে তাঁর নিকট চরম সম্মান প্রদর্শন করেন। একমাত্র শিক্ষার কারণেই আদম (আঃ) সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসেবে বিবেচিত হন। আর তারই ফলশ্রুতিতে আজ মানুষ সৃষ্টির সেরা হিসেবে পরিগণিত ও স্বীকৃত।[১২৪]

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির 'নীতি ও মূল্যায়ন' শাখার সহকারী পরিচালক প্রফেসর Ryokicichi Hirono-র মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানত দু'টি (১) মানুষের দৈহিক ও মানসিক দক্ষতা বা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং (২) ব্যক্তির মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও চরিত্র গঠন বা অবেগের শৃংখলা (Emotional discipline) সৃষ্টি।[১২৫]

শিক্ষার সর্বজনীন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১। ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ।
২। ব্যক্তিকে তার পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানে সহায়তা করা।
৩। সমাজের অগ্রগতি বা প্রগতি সাধান।
৪। সমাজ সংরক্ষণ (Social Conservation)
৫। বর্তমান প্রজন্মকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তোলা।
৬। দেশাত্ববোধ তৈরি।
৭। সুনাগরিকত্ব অর্জন।
৮। নৈতিক চরিত্রের বিকাশ।

রবিন্দ্রনাথের মতে, শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করা।[১২৬]

ভৌগলিক পরিবেশ, স্থানীয় প্রয়োজন এবং পরিবার ও গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালির সাথে খাপ খাইয়ে চলার উপযুক্ত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সেকালের মানুষকে শিক্ষা করতে হতো। একই প্রকার কাম্যতাকে একালে বলি মূল্যবোধ।[১২৭]

আমাদের শিক্ষার আয়োজনে বড় অভাব। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের-লক্ষ্যহীন তরীর মতো ভেসে চলা শিক্ষার প্রয়োজনে আমরা কি তৈরি করতে চাই মন-মানসিকতায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কেমন হবে তা ঠাহর করা বড়ই দুষ্কর। কেননা দেশ ও জাতিসত্তার ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখি না। যথাযথভাবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট না হওয়ায় আমাদের মানুষ গড়ার প্রক্রিয়াটি ভবঘুরে মানুষের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে বছরের পর বছর।[১২৮]

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

সমাজে শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের পূর্বে শিক্ষার সর্বজনীন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন। একইসঙ্গে প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে ঐ সমাজের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রাখা। 'শিক্ষা' প্রত্যয়টি ব্যাপক অর্থবহ এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বহুমাত্রিক। সমাজের উপযোগিতা ভেদে এর লক্ষ্যের, উদ্দেশ্যের এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। সাধারণ অর্থে পড়তে

[১২৩] এ. কে. এম আযহারুল ইসলাম, নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য, প্রকাশনায় আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম, পৃঃ ২৪২।
[১২৪] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ০১।
[১২৫] আব্দুর নুর, শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি: শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম, ইফাবা, গবেষণা বিভাগ, পৃঃ ২৩৫।
[১২৬] শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পৃষ্ঠা নং- ০১-০৩, হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা মার্চ ১৯৯৯ইং
[১২৭] শামসুল হক, শিক্ষা প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা নং-০৩, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৮৩ ইং।
[১২৮] প্রেক্ষণ, জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর, খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত, প্রকাশ আগস্ট-২০০১, পৃষ্ঠা- ১৪০-১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

ও লিখতে জানাকেই 'শিক্ষা' এবং পড়তে ও লিখতে সক্ষম ব্যক্তিকে 'শিক্ষিত' বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা নয়, শিক্ষার বাহন মাত্র। শিক্ষার বহুবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে দু'টো উদ্দেশ্য সর্বজনীন। যথা-

(১) জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আত্মিক ও মনোজগতের সার্বিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন, যা যুক্তিশীল মনের উন্মেষ ঘটায় এবং কর্মক্ষেত্রে যুক্তিশীল ক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায় থেকে অন্যায়, সৎ থেকে অসৎ ও পাপ থেকে পূণ্যকে পৃথকীকরণে সহায়ক হয় এবং -------------

(২) প্রকৃতি ও সমাজ জীবনের বিভিন্নতর রহস্য উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃতি ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণে এনে জীবনের মানোন্নয়ন ঘটানো। অতএব, শিক্ষার এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যকে সম্পৃক্ত করে বলা যায় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তিশীল ও নৈতিক আচরণের অধিকারী, বিজ্ঞান মনস্ক, প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা– যার মধ্যে মানবিক গুণাবলী ও জ্ঞানের সহাবস্থান ঘটবে। জ্ঞান ছাড়া যেমন মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে না, মানবিক গুণহীন জ্ঞানও প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে না। একটি অপরটির পরিপূরক।[১২৯]

লক্ষ্যহীন শিক্ষা মানবসমাজের উপকারে আসতে পারে না। তাই আমরা মনে করি, শিক্ষা মানুষের একটি সচেতন প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা। লক্ষ্য বলতে গন্তব্যস্থল বুঝায়। সুতরাং যে সচেতন প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টার মাধ্যমে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায় তাকে শিক্ষা বলে। মানুষের সর্ব প্রচেষ্টার মূলে কোন-না-কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। কারণ উদ্দেশ্যবিহীন কোন কাজ বা প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে না। তেমনি শিক্ষারও যদি কোন লক্ষ্যস্থল না থাকে, তাহলে সে শিক্ষা ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে কোন মঙ্গল বয়ে আনবে না।[১৩০]

সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কারণ লক্ষ্য নির্ণীত না হলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন কখনও সম্ভব হবে না। উদ্দেশ্যহীন কোন কাজই সফলতা বয়ে আনে না। শিক্ষাক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সংক্ষেপে শিক্ষার লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। সেজন্য পূর্বেই শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে হয়। কারণ পূর্বেই লক্ষ্য স্থির করতে না পারলে কোনরকম প্রচেষ্টাই সার্থক হবে না। শিক্ষার লক্ষ্যই মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করা।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব থেকেই লক্ষ্য নির্ণীত না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যসিদ্ধি হয় না। লক্ষ্য মানুষকে প্রেরণা যোগায়, কর্মপ্রচেষ্টাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। লক্ষ্যস্থলের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একটা মানসিক প্রশান্তি অনুভূত হয়।

তৃতীয়ত, লক্ষ্য মানুষের সাফল বা কর্মধারা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। কারণ লক্ষ্যের পথে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মানুষ তার কাজের মূল্যায়ন করতে পারে তাকে আর কতদূর অগ্রসর হতে হবে, কেমনভাবে যেতে হবে, কতখানি তৎপরতা চালাতে হবে ইত্যাদি। এর মাধ্যমে মানুষ তার সাফল্য বা ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।[১৩১]

ইসলামী শিক্ষা

এখন আমরা ইসলামী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করব। মুসলিমদের বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেন নি। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে মানবজাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিন্মোক্ত আয়াতে উল্লেখ করেছেন- "স্মরণ করুণ, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলল, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই; তারা বলল, তুমি কি সেখানে এমন জাতি সৃষ্টি করবে, যারা অন্যায় ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাইতো তোমার প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করছি? তিনি বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।"[১৩২] উল্লেখিত আয়াত আমাদের বলে দেয় যে, মানব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে খলিফা হওয়া। তাই আমাদের জানা উচিৎ খলিফার প্রধান দায়িত্ব কী এবং নারী-পুরুষেরা কীভাবে এটা সম্পন্ন করতে পারে। আল্লাহ কোন অসম্ভবকে বাধ্য করে দেন না,

---

[১২৯] মোহাম্মদ মাহ্বুব উল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ, বাণিজ্য খণ্ড-৮, ১৯৩২, পৃষ্ঠা নং-২৯৮-২৯৯।

[১৩০] আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা, পৃষ্ঠা নং-৪৮।

[১৩১] মোহাম্মদ মাহ্বুব উল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যার স্বরূপ বিশ্লেষণ, বাণিজ্য খণ্ড-৮, ১৯৩২, পৃষ্ঠা নং-২৯৮-২৯৯।

[১৩২] সূরা আল-বাকারা, আয়াত-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

তার দাবি-দায়িত্বের সম্পাদন। ইসলামী শিক্ষা সেই শিক্ষা যা, একজন মানুষকে ঐ বাধ্যবাধকতা সফলভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে, যা আল্লাহ তার রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ কোরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন। এটা কেবল মানসিক এবং শারীরিক যোগ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, নির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুসারে এবং সে যোগ্যতা ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সম্ভব হবে।[১৩৩]

ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি আল কোরআন ও আল-হাদিস। আমাদের দেশ এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষা পদ্ধতি প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে আধুনিক বিষয় যেমন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণিত ও অন্যান্য কারিগরি শিক্ষার অভাব আছে। আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি জ্বিন ও মানুষকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৩৪] অন্যত্র আল্লাহ তার রাসূল (সাঃ)কে এ কথা বলতে বলেন যে, "আমার প্রার্থনা, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছুই এ বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, যার কোন শরীক নেই।"[১৩৫] যেহেতু আল্লাহ আমাদের তার এবাদত করা ভিন্ন অন্য কিছু করার আদেশ দেয়নি তাই আমরা জানি যে, আমাদের জীবন তার প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু তাছাড়া আরও একটি ভুল ধারণা আমাদের মুসলিম সমাজে ইবাদতের প্রকৃত ধারণা সম্পর্কে চলছে। সমসাময়িক মুসলিম সমাজের ধারণা যে, ইবাদত মানে ইসলামের কিছু মৌলিক দায়িত্ব পালন করা যা সম্পূর্ণ মানুষের ধর্মীয় জীবন যেমন-নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ্ব ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে মানবজীবন এই সকল ধর্মীয় বিষয়েই সীমাবদ্ধ না। মানুষ তার পার্থিব চাহিদা পূরণে অন্যান্য কাজ করতেও বাধ্য। এমনকি আমরা এ কথাও বলতে পারি যে, মানবজীবনের বড় অংশ তথাকথিত পার্থিব কাজেও ব্যয় করা হতে পারে। এ সকল কাজকে অনৈসলামিক বলা হলে জীবনের অধিকাংশ সময় অনৈসলামিক হবে। প্রকৃত অর্থে, ইহকাল ও পরকাল এর মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে কোন বৈষম্য নেই। ইসলাম ধর্মীয় ও পার্থিব সকল কাজকে অনুমোদন করে যদি তা কোরআন সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে হয়। সে তার প্রথা এবং কাজ করতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যা মাদ্রাসায় ও পার্থিব প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান শিক্ষার ইসলামিক পদ্ধতি নয়। অধিকন্তু এরকম দ্বিমুখী শিক্ষা মুসলিম জাতিকে দু'টো ভাগে ভাগ করে। একটি হচ্ছে 'মোল্লা' অন্যটি হচ্ছে 'মাস্টার'। ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত কাঠামো ঐ পদ্ধতি যা ইসলামী মূল্যবোধ এবং দর্শনকে উপস্থাপন করে যা হতে পারে ধর্মীয় বা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান।

এখানে মানবকে আল্লাহর প্রশংসায়/কৃপায় শিখানো হয়েছিল। কোরআনে শিক্ষা শব্দের উৎপত্তি 'তালিম' শব্দের মাধ্যমে। যা 'ইলম' থেকে আগত, যার অর্থ অজানাকে জানা ও উহার সাথে পরিচিত হওয়া এবং শিক্ষা হচ্ছে পদ্ধতিগত নির্দেশনা।[১৩৬] জন মিলটন কাওয়ান বলেন, 'ইলম' অর্থ 'আলপাহম' বুঝতে পারা, অনুধাবনকে এবং জ্ঞাত হওয়া, এবং 'আল-ইদরাক' অর্থ অর্জন, অনুধাবন, সচেতনতা, সতর্কতা এবং 'তালিম' অর্থ উপদেশ, নির্দেশনা, প্রশিক্ষণ, পরিচর্যা, শিক্ষা।[১৩৭] তাই, ওয়া আল্লামা আদামাল আসমায়া কুল্লাহা' আয়াতের অর্থ তিনি আদমকে সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন। বিশ্লেষকদের মতে, এর অর্থ অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি এবং জিনিসের গুণাগুণ, অনুভূতিসহ আল্লাহ মানুষের মধ্যে কিছু গুণ দিয়েছে যা ফেরেশতাদের নেই। তাই মানুষ প্রিয় হতে এবং আল্লাহর খলিফা হতে সামর্থ্য।[১৩৮] এটা আরও স্পষ্ট করে কীভাবে একজন পুরুষ/নারী আল্লাহর প্রকৃত খলিফা হতে পারে। প্রকৃত খলিফা সেই যে তার নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তার কার্যকলাপ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নীতি অনুসারে সে তার সৃষ্টিকর্তার নির্দেশনা জানতে পারে এবং তার নিদের্শনা পালন করতে পারে।

ইসলামী শিক্ষা এমন একটা পদ্ধতি যা কোন প্রজন্মকে খলিফার কার্যাবলী পালনে সামর্থ্য করে তোলে। তাই এস.এম. ইব্রাহিম বলেন, "শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ শিক্ষা সমাজে উঁচু মানের সভ্য মানুষ তৈরি করে যারা জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং তারই সন্তুষ্টি আত্মদানে উৎসাহিত করে।"[১৩৯] বিখ্যাত দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরাফ বলেন, "ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতি এই বিশ্বাসের

---

[১৩৩] ইসলামী শিক্ষা ত্রৈমাসিক, ভলিয়ম নং,৩-১৯৮৩, পৃষ্ঠা-২৫।
[১৩৪] সূরা আলজারিয়াত, আয়াত-৫৬।
[১৩৫] সূরা আল আনাম, আয়াত-১৬২।
[১৩৬] এস.এম. ইব্রাহিম, বাংলায় ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার উপর প্রতিবেদন, মুখবন্ধ, পৃষ্ঠা-29|
[১৩৭] Hans wehr, Milton cawan, A dcitionary of modern witten Arabic, জে. মিলটন কর্তৃক সংকলিত, তৃতীয়, সংস্করণ, পৃষ্ঠা-২৭৭, ৬৩০, ৭৩০।
[১৩৮] আল কুরআন (সূত্র ২০, সূরা বাকারা ৩১ নং আয়াতের পাদটীকা ৪৮, পৃষ্ঠা-১৫/১৬)।
[১৩৯] পূর্বোক্ত সূত্র ২২.

Dhaka University Institutional Repository

উপর প্রতিষ্ঠিত যে, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি এবং প্রত্যেক নারী-পুরুষের উচিৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, ফলে তারা সত্যিকার প্রতিনিধি হতে পারবে এবং বিশ্বকে আরও অধিকতর ভালো অবস্থানে নিতে পারবে।"[১৪০]

তাই পার্থিব শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য করা উচিত হবে না। যেহেতু ইসলাম পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়কে একই গণ্ডীতে আবদ্ধ করে তাই ধর্মীয় শিক্ষাও কোন ভেদাভেদ ছাড়া উপরের উভয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। আমরা যদি ইসলামের প্রাথমিক যুগের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, হুজুর (সাঃ) এর অনুসারীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যোগ্য ছিল। তারা ছিলেন ইসলামের মৌলিক আদর্শ। ইসলামী ভাবাদর্শে থাকার কারণেই তারা একটা অশিক্ষিত বর্বর জাতি হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের পঞ্চাশ শতাংশ জায়গা শাসন করেছেন এবং মানুষের ভালবাসা, বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করেছেন। আমরা বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বাস করছি তাই পরিবর্তিত পরিবেশ ও অবস্থা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে কীভাবে আমরা পরিবর্তিত সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারি। জ্ঞানের ইসলামী উৎস আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি, আমরা যদি আগ্রহের সাথে কুরআন ও হাদিসের বাণী খুঁজে দেখি তবে এটা স্পষ্ট হবে যে, ইসলামী উৎস ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ দিয়েছে। ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে বাধা দেয়নি বরং মানবতা বৃদ্ধির জন্য এই জ্ঞান ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। কারণ শিক্ষায় নৈতিকতার অভাবে বিভিন্ন প্রজন্মের জন্মের দ্বন্দ্ব তৈরি করে। বিশিষ্ট গবেষক মনজুর আহমেদ বলেন,"একটা শিক্ষা পদ্ধতি বা ধর্মীয় বন্ধনকে ছিন্ন করে এমনভাবে ব্যক্তির ধর্মীয় ব্যগ্রতাকে উপেক্ষা করে তা একজন মানুষ বা সমাজকে ভিত্তিহীন করে তোলে। ইহা চমৎকার প্রকৌশলী, যোগ্য ডাক্তার এবং শিক্ষিত দার্শনিক তৈরি করতে পারে।কিন্তু এটা যুবসমাজের মধ্যে সঠিক ও নৈতিক মূল্যবোধ তৈরিতে ব্যর্থ হবে যার ফলে অন্যান্য যোগ্যতা বা সম্ভাবনার বিকাশ ঘটবে না।"[১৪১] তাই শিক্ষার ইসলামী পদ্ধতির উদ্দেশ্য মুসলিম ডাক্তার, দার্শনিক এবং প্রকৌশলী তৈরি করা। ইসলামে শিক্ষা পদ্ধতি এতটাই সমন্বিত যে,এটা কেবল মানবজাতির বস্তুগত বিষয়কেই আলোচনা করে না বরং এর উদ্দেশ্য শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাদিসে আছে-"সাবধান! শরীরে একটুকরা মাংস আছে যা ভাল হলে সমস্ত শরীর ভাল হয় আর যা নষ্ট হলে সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেটা হলো আত্মা।"[১৪২] কোরআনে আল্লাহ বলেন, "বলুন, আত্মা আমার প্রভূর আদেশ মাত্র।"[১৪৩] যেহেতু আত্মা আল্লাহর আদেশ রূপে গঠিত তাই এর উন্নয়নের খাদ্য হলো আল্লাহর আদেশ যেমন- এই আদেশ মানুষের কাছে দেওয়া হয়েছে দূতের মাধ্যমে এবং সর্বশেষে মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে। মানুষকে তাই তার আত্মার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে চলমান গতিতে এবং তার মন তার নৈতিক দিকের অধীন হবে। ইসলামী শিক্ষার জন্য শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এবং মনকে শিক্ষিত করতে হবে ইহার সমস্ত সম্ভাবনাকে উন্নত করতে এবং প্রেরণা দেওয়া হবে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) আনুগত্যের সাথে।"[১৪৪] মিলটন শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন শরীর, মন ও আত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন হিসেবে। কেবল ইসলামী শিক্ষাই এই ধারণাকে প্রকৃতপক্ষে আলোচনা করতে পারে। কারণ এই শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান ভিত্তি কোরআন-যার অধিকাংশ আয়াত মানুষের আত্মশুদ্ধি সম্পর্কিত। চরিত্রশুদ্ধিকে প্রধান বিবেচনা করা হয়। একজন মানুষ উচ্চশিক্ষিত হতে পারে তবে শক্তিশালী নৈতিক চরিত্রের ব্যক্তি হওয়া খুবই কঠিন। তাই কোরআন প্রায়ই এই বিষয়ে জোর প্রদান করেছে। আল্লাহ বলেন, "পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের মধ্যেও আমি একজন দূত পাঠিয়েছি আমার নিদর্শন তোমাদের দিতে এবং তোমাদের পরিশুদ্ধ করতে এবং বিজ্ঞতার সাথে তোমাদের নির্দেশনা দিতে ও একটা নতুন জ্ঞান দিতে। [১৪৫] আল্লাহ আরও বলেন, "সফলকাম সেই যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং ব্যর্থ সেই যে ইহাকে কলুষিত করেছে।[১৪৬] উল্লেখিত কোরআন ও হাদিসের বাণী ও শরীরসহ মন ও আত্মার পরিশুদ্ধিতে জোর প্রদান করেছে। তাই এটা কোরআন-হাদিস ইসলামী শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি, " কোরআনের ভাষায় শিক্ষা হচ্ছে আত্মা ও ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন যা ইহার ক্যারিয়ারে এর পরিচিতি ধরে রাখে। অভিজ্ঞতা ও প্রভাবের পরীক্ষা এটাকে স্থানান্তর ব্যতীত ইহার থেকে কিছুটা আলাদা রূপে পরিবর্তন করে। এর পদযাত্রা শুরু হয় অনেক সম্ভাবনা সমৃদ্ধ অনুন্নত গঠনে।

---

[১৪০] 'শিক্ষার উপর জাতীয় কর্মশালা' ১৯৯৭-এ অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরাফ। এর উপস্থাপিত শিক্ষাকলার দর্শন, পৃষ্ঠা- ৪৩.

[১৪১] পূর্বোক্ত মনজুর আহমেদ সূত্র, পৃষ্ঠা ৩-৪।

[১৪২] মুহাম্মদ বিন ইসলাইল আল বুখারী, জামে সহীহ, অনুবাদক ড. মোঃ মুহসীন খান, কিতাবাল ইমান, হাদিস নং ৫২, ভলিয়ম-১, ৫ম সংস্করণ, কিতাব ভবন, নিউ দিল্লী।

[১৪৩] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৮৫।

[১৪৪] এইচ, এইচ, বিলগেরামী, ইসলামী মুল্যবোধ ও শিক্ষা; প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, প্রকাশক- ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ, পৃষ্ঠা-২৬।

[১৪৫] সূরা বাকারা, আয়াত ১৫১।

[১৪৬] সূরা শামস, আয়াত-৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

ইহা ঐ সকল সম্ভাবনাকে বাস্তবতায় রূপ দিতে না পারলেও, এটা কখনও উহা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এটা সক্রিয় এবং অদ্ভুত।"[১৪৭]

ইসলামী ধারণা মতে একজন মুসলিম ইহকাল ও পরকালের কল্যাণে বিশ্বাস করতে বাধ্য। ঐ জীবনের বিশ্বাস অধিকতর শক্তিশালী হয় কোরআনের বাণী দ্বারা। পরকালের জ্ঞানার্জনে এর বিকল্প নেই। প্রাথমিক ওহীর অনেকাংশে ঐ জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবুওয়াত পূর্ববর্তী যুগে এতটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল যে, মানুষ তার নিজের কন্যাকে হত্যা করতে দ্বিধা করত না। পরকালের ভয়ই এই নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারত। তাই ইসলামের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষায় অবশ্যই এমন বিষয় ও পদ্ধতি থাকবে। যা একজন মানুষকে পরকালের ভয় সম্পর্কে জানাবে। এই সমস্ত ধারণা সংবলিত শিক্ষা উপাদান মুসলিম জাতির জন্য সবচেয়ে জরুরি, বিশেষ করে বর্তমান মুসলমানদের জন্য। ফলে আধুনিক পশ্চিমা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বিভাজনে মনজুর আহমেদ বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ইসলামী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে নিহিত। ইসলামী শিক্ষা ইহকাল ও পরকালের অর্জন সম্পর্কে আলোকপাত করে যেখানে আধুনিক শিক্ষা কেবল পার্থিব অর্জনকেই প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করে।[১৪৮] পশ্চিমা দেশের ন্যায়, ইসলামী শিক্ষায় ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক কোন বিভাজন নেই। পাশ্চাত্যের এই বিভাজন চার্চ ও রেনেসা এবং সংস্কারের নেতাদের মধ্যকার ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের কৌতূহলী সৃষ্টি। এখনও তাদের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে এটা দেখা যায়; সপ্তাহের ছয় দিনে জনগণ একগুচ্ছ মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয় এবং রবিবার অন্য মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় যা যাজকের দ্বারা তত্ত্বাবধায়ন করা হয়। এটা পশ্চিমা সমাজে একটি স্থায়ী দ্বি-ভাজন এবং দ্বিমুখী চিন্তার জন্ম দিয়েছে।[১৪৯]

সমাজ বিজ্ঞানীরা মানুষের জীবনের বহুমুখী চাহিদা ও আচরণের মধ্যে কারণগত সম্পর্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষের জীবন প্রবাহকে ব্যক্তিগত, দৈহিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। ইসলামেও মানুষের জীবন বিকাশের ধারা প্রবাহকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরকে বলা হয় নফ্‌সে আম্মারা (প্রবৃত্তির তাড়না), যেখানে মানুষ প্রাণীকুলের অন্যান্য জীবদের ন্যায় দৈহিক চাহিদাসমূহ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি) মেটানোর তাড়নায় আচরণ করে। মানবজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়কে বলা হয় নফ্‌সে লাউয়ামা (আত্মজিজ্ঞাসা/সচেতনতা), যেখানে মানুষ সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তার উর্ধ্বে উঠে আধ্যাত্মিক বা ভাল-মন্দের বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানবজীবনের সর্বোচ্চ বলা হয় নফসে মুতমাইন্না (আত্মসন্তুষ্টি), যেখানে মানুষ দয়া ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে সৎকর্ম সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বিকাশের
বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার ভূমিকা

জীবন বিকাশের পর্যায়ক্রম		মানুষের তাড়নার/চেতনার পদবিন্যাস	শিক্ষাক্রম	
পর্যায়ক্রম	নাম		উদ্দেশ্য	শিক্ষা সম্পর্কিত কুরআনের নির্দেশাবলী
প্রাথমিক পর্যায়	নফসে আম্মারা (প্রবৃত্তির তাড় না)	জৈবিক তাড়না (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ইত্যাদি)	বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান/দক্ষতা অর্জন	২ঃ২৯; ১৫ঃ১৯-২০; ১৬ঃ১২-২৪; ৩১ঃ২০; ৪ঃ৩২-৩৩; ২২ঃ৬৫; ৪৫ঃ১২-১৩; ২ঃ২৬৯; ৬২ঃ১০;

[১৪৭] মনজুরুল হক, শিক্ষা-কলার কোরানিক আদর্শ, ইসলামী শিক্ষা ত্রৈমাসিক, ভলিয়ম-১০, নং-২, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৩৬।
[১৪৮] পূর্বোক্ত মনজুর আহমেদ সূত্র, পৃষ্ঠা-৪।
[১৪৯] উপরোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-৫।

Dhaka University Institutional Repository

				৫৩ঃ৩৯;
দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক পর্যায়	নফ্‌সে লাওয়াম্মা (আত্ম-জিজ্ঞাসা)	মানসিক চেতনা বা বিবেকবোধ (জীবন ও জগৎ এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা)	চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি	২ঃ১৬৪; ৩ঃ১৯০; ৩ঃ১৯১; ২৯ঃ ২০ঃ২২ঃ৫-৬; ১৬ঃ৭৮।
তৃতীয় ও সর্বোচ্চ পর্যায়	নফসে মুত-মাইন্না (আত্মসন্তুষ্টি)	আত্মিক সচেতনতা (দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত)	আত্মিক বা মানবিক গুণাবলীর বিকাশ	২ঃ৩০; ৭ঃ২৯; ১৬ঃ৯০; ৩ঃ১১০; ৯৮ঃ৭-৮; ৫৭ঃ২৫; ২ঃ২৮১।[১৫০]

ইসলামী শিক্ষা এবং আধুনিক পশ্চিমা শিক্ষার মধ্যে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণী ও অর্থনৈতিক অবস্থার নির্বিশেষে সমতার সুযোগ থাকে। যেমন মসজিদ, মাদ্রাসায় সুশীল সমাজের জন্য কোন বিশেষ জায়গা নেই। ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের পছন্দের বেলায় যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে এবং তেমন কঠোর পরীক্ষা নেই। গণতান্ত্রিক পশ্চিমা এবং সামন্তরতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের শিক্ষা পদ্ধতির তুলনায় ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য মানুষের জন্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলামী ধারণায় মানুষ নিস্পাপ হয়ে জন্মায় এবং কোন পাপ তার সাথে থাকে না। কোরআনও তাকে জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং তার মর্যাদা নিহিত তার জ্ঞানে ও জানার যোগ্যতায়। বিপরীতক্রমে, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে স্বাধীন করার পরিবর্তে তার শরীর, মন ও আত্মা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করে। এটা সত্য যে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি একজন মানুষকে পার্থিব বিষয়ে খুবই যোগ্য করে তুলতে পারে। কিন্তু এটাও সত্য যে এ যোগ্য সমাজ একটা সুস্থ ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ ঘটাতে পারে না। মুসলিম দেশে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয়না তথাপি অন্য স্থানের তুলনায় সেখানে অধিক সামাজিক স্বস্তি বিরাজ করে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উন্নত দেশ আমেরিকার অপরাধ পরিসংখ্যান সম্পর্কে এফ.বি.আই রিপোর্ট দেয় যে, "আমেরিকাতে অন্যান্য দেশের তুলনায় অপরাধের হার বেশি এবং এ হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।"[১৫১]

সুতরাং বলা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি আধুনিক বিশ্বে সামাজিক স্থিতি নিশ্চিত করতে পারে না। বিশ্বের ইতিহাসে তাকালে এটা স্পষ্ট যে কেবলমাত্র একটি ধারণাই বিশ্বে সম্পূর্ণ সামাজিক শান্তি উপহার দিয়েছে এবং সেটা হলো ইসলাম। এটা ছিল ইসলামের নবীর প্রদত্ত পদ্ধতির আশীর্বাদ এবং সেটা ছিল কেবলই ইসলামের শিক্ষা। ঐতিহাসিকভাবে এটা স্পষ্ট যে, ইসলামে ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষা পাশাপাশি চলছিল। কিন্তু বর্তমানে এগুলো আলাদা হয়ে গেছে। আমরা একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাইলে আমাদের অবশ্যই ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে।

ইতিহাস সাক্ষী

বহু শতকব্যাপী অজ্ঞানতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত একটি জাতি তথা মানবসমাজকে নৈতিক শিক্ষার পবিত্র স্পর্শে সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে যে মহামানব এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। মানবজাতিকে উন্নত ও সভ্য করার লক্ষ্যে ওহীভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে উজ্জীবিত করে এবং মননের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের সে অন্ধকার যুগে জীবন ও আলোর পতাকা উত্তোলন করার প্রয়াসে তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।[১৫২]

শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ওহীভিত্তিক যে শিক্ষাব্যবস্থা আরবের বুকে প্রচলন করেছিলেন, একমাত্র সে শিক্ষার স্পর্শেই মানুষ তার আকাঙ্খিত শান্তি ও প্রগতির সন্ধান পেতে

[১৫০] আবদুর নূর, শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ, পৃষ্ঠাঃ ২৩৫-২৪২।

[১৫১] Janks cole man, Abnormal psychology and modern life, Scott froshman and company, পৃষ্ঠা-৩৯৬ দিল্লী।

[১৫২] মোঃ ইসমাইল মিয়া, শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, গবেষণা বিভাগ, পৃঃ ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

পারে এবং আদর্শবান, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যার উজ্জ্বল নমুনা ও অনুপম দৃষ্টান্ত মহানবী (সাঃ)- এর সাহাবায়ে কেরাম।[১৫৩]

মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহর সর্বপ্রথম বাণী 'পড়ুন' অর্থাৎ 'জ্ঞান অন্বেষণ করুন'।[১৫৪] রাসূল-ই-করীম (সাঃ) স্বয়ং ইরশাদ করেছেন, আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।[১৫৫] তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদের শিখায়।[১৫৬] তিনি ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করে তার অতীতের দোষ-ত্রুটি মুছে যায়।[১৫৭] মহানবী (সা) উদ্বুদ্ধ করেছেন এই বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।[১৫৮]

মহানবী (সাঃ) হেরা গুহা থেকে ফিরে এসে হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে ইহকাল ও পরকালের মুক্তির শিক্ষা প্রদান করেন। তারপর তাঁর পরিচারক যায়দ ইব্‌ন হারিসা, চাচাত ভাই আলী, বন্ধু আবু বকর প্রমুখকে তাঁর প্রতি ওহী ভিত্তিক সর্বজনীন শিক্ষা প্রদান করেন। প্রতিকুল পরিবেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন। যার ফলে সাফা পর্বতের পাদদেশে ইসলামী শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সাঃ)-এর অন্যতম কর্তব্য ছিল মুমিনদের কুরআন শিক্ষা দেওয়া। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। তবে হিজরতের পূর্বে নিরাপদে বসে নিশ্চিন্তে কুরআন শিক্ষাদানে স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ তখন নির্যাতন-নিপীড়ন অহরহ চলছিল। সুতরাং মহানবী (সাঃ)-এর সাহচর্যই ছিল এ যুগের সার্বক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ শিক্ষাকেন্দ্র। এ সময়ে সাহাবাগণ তাঁর সান্নিধ্যে এসে কুরআন শিক্ষা করতেন এবং অন্যদের শিক্ষা দিতেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ), আবূ বকর (রাঃ), খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন এ যুগের শিক্ষক।[১৫৯]

পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি মহানবী (সাঃ) নারী শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতেন। মহানবী (সাঃ) উঁচু বংশের মহিলাদের এবং দাসীদেরও শিক্ষা দান করতেন।[১৬০]

মহিয়ষী নারী বেগম রোকেয়ার শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গিতেও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। তিনি বলেছিলেন: Our girls should not only obtain university degrees, but must be ideal daughters, wives and mothers or I may say obedient daughters, loving sisters, dutiful wives and instructive mothers. তিনি তাঁর ছাত্রী ও সহকর্মীদের ঠিক এভাবেই গড়ে তোলেন। তিনি সর্বপ্রকার শিক্ষা বিশেষত, তাফসিরসহ কোরআন পাঠ থেকে শুরু করে ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, ফারসি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গার্হস্থ্য পরিচালনা, রান্না, সেলাই, সন্তান লালন-পালন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষার আয়োজন করেন। তাঁর প্রবর্তিত এ-শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তৎকালীন লেডি জ্যাকসন মন্তব্য করেছিলেন : The girls here are not merely given an education of a scholastic type, but are given religious instruction and practical training which will fill them to be good housewives and capable mothers and families. সমাজের যাবতীয় বঞ্চনা ও দুর্দশা লাঘবে তিনি শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাই তিনি আমৃত্যু শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে নারীজাগরণে ও সমাজসংস্কারে ব্রতী হন। তৎকালীন স্টেট্‌সম্যান পত্রিকা শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মন্তব্য করেছিল: She devoted her life and all her resources to the cause of education for girls.[161]

---

[১৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৫।
[১৫৪] আল কুরআন ৯৬:১।
[১৫৫] আল হাদিস (দারমী) মিশকাত, পৃ-৩৫।
[১৫৬] আল হাদিস (বুখারী) কিতাবুল ইলম, সংস্করণ ১৯৮৫, ইন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, পৃ-১৭।
[১৫৭] আল হাদিস (তিরমিযি) বাবুল ইলম, ইন্ড কোম্পানী, সংকরণ ১৯৮৫, দেওবন্দ, পৃ-৯৭।
[১৫৮] আল হাদিস (বুখারী) মিশকাত ২য় খন্ড, মাও. নূর মোহাম্মদ আজমী, পৃ-৬।
[১৫৯] মো: ইসমাইল মিয়া: শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ, পৃ: ২১৫-২২১।
[১৬০] প্রাগুক্ত, পৃ-২২৯।
[১৬১] মোঃ নুরুল ইসলাম*, মোঃ নূরুল ইসলাম**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা: ৭৬, আষাঢ় ১৪১০, জুন ২০০৩, পৃ: ১৪৩-১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ঃ

ইসলামী শিক্ষা হ'ল সর্বজনীন। বিজ্ঞানময় ও মানব কলাণের জন্য উত্তম এক ব্যবস্থার নাম ইসলামী শিক্ষা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাসূলে মাকবুল (সাঃ)-এর জামানা থেকে ধ্যান-ধারণা দ্বারাই ইসলামী শিক্ষা পরিচালিত হয়ে আসছে তাই ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ভাবে বর্ণনা করা যা ঃ

১. পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে গুণান্বিত করা এবং মানুষকে সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনযাপনের জন্য তৈরি করা।
২. নৈতিকতাবোধ ও ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি করা এবং ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া।
৩. ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করা এবং তদানুযায়ী জীবন গঠনে সাহায্য করা।
৪. কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে উৎসাহিত করা এবং ব্যক্তিজীবনে কুরআন সুন্নাহ'র নির্দেশ মেনে চলার জন্য প্রেরণা যোগানো।
৫. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করা।
৬. সৃষ্টি রহস্য ও আল্লাহর কুরদতের উপর গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা।
৭. মানবকল্যাণের উপাত্ত ও উপকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে যথাযথ মানবকল্যাণের পথে ধাবিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা।
৮. মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে ভ্রাতৃত্ত্ব ও মানবতাবাদী হিসেবে পরিচিত করা।
৯. বিশ্বের পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় নতুন নতুন সমস্যার সমাধান কল্পে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি করা।
১০. ইসলাম যেমন একটি জীবনব্যবস্থা, তার আলোকে সকল ধর্মের উপর এ ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার যোগ্য ধারক ও বাহক সৃষ্টি করা।
১১. ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজসভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের চাহিদার বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত পন্থায় দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার মহান লক্ষ্যে যোগ্যতা হাসিলের নাম ইসলামী শিক্ষা। এ পর্যায়ে কুরআনুল কারীমে উদ্ধৃত আয়াতখানি এর সমর্থনেই পেশ করা হয়েছে–
"যারা ইলমে পারদর্শী তারা বলে, আমরা আল্লাহ'র উপর ঈমান এনেছি, সবকিছুই আল্লাহ থেকে অবতীর্ণ, এটা কেবল তারাই স্মরণ করে, যারা জ্ঞানবান।"[১৬২]

ড. এইচ, এইচ, বিলগেরামী বলেন, "এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইসলামী শিক্ষার ধারণা যথেষ্ট পরিমানে ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক, অভ্যান্তরীণ ও বাহ্যিক, প্রকৃতির দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে এবং এই জীবনের সাথে একাত্মবাদের নীতির সাথে সমন্বয় করে।"[১৬৩] যেহেতু ইসলাম কোন গোঁড়া বা মতবাদ নয়, অন্যান্য ধর্মের ন্যায় যারা শুধু পার্থিব বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করে; ইসলামী ধারণার প্রকৃত রূপ হচ্ছে এটা জীবনের সব ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে- রাষ্ট্রীয় বা ব্যক্তিগত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক। তাই ইসলামী শরীয়াহর ন্যায় ইসলামী শিক্ষাও শিক্ষার সামগ্রিক দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করে। ইসলামী শিক্ষাকে কেবল মাত্র ধর্মীয় চিন্ত াধারা সম্পর্কিত বিভিন্ন শাখা যেমন জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত করাই হবে ভুল ধারণা, এটা অর্থ হবে আমাদের নবী তার অনুসারীদের যে দৃষ্টিভঙ্গি- ধর্মীয় চিন্তা এবং পার্থিব শিক্ষার জ্ঞান দান করেছেন তা অস্বীকার করা।

আমাদের নবী এমন একটি দল তৈরি করেছিলেন, যারা ছিল নিয়মিত নামাজের যোগ্য হওয়ার পাশাপাশি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও যোগ্য। তাদের পারিবারিক জীবনে তাঁরা ছিলেন তাদের ছেলেমেয়ের কাছে সবচেয়ে ভাল বাবা, সমাজে সবচেয়ে ভাল সমাজকর্মী, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো রাজনীতিবিদ, প্রশাসনে সবচেয়ে ভাল প্রশাসক এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল যোদ্ধা। আমরা প্রথম খলিফা যিনি মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে বিভিন্ন ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণে সাথী ছিলেন তার সম্পর্কে জানি যে, তিনি ছিলেন উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক এবং সবচেয়ে ভদ্র এবং অমায়িক লোক।

---

[১৬২] ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, পৃষ্ঠা নং-২৩-২৪, ই.ফা.বা., ঢাকা।
[১৬৩] এইচ, এইচ, বিলগেরামী, ইসলামী মূল্যবোধ ও শিক্ষা; প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, প্রকাশক- ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ, পৃষ্ঠা-২৫.

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে নবী (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তার নেতৃত্বে কী পরিমাণ কঠোরতা এবং শক্তি ছিল। এবং খুব সম্ভবত সেটাই ছিল আল্লাহর নবীর প্রধান কাজ যে, উম্মতকে পরিশুদ্ধ করা এবং নির্দেশনা দেওয়া, আর আল্লাহও তাকে এটা পালন করতে নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন, "ইনিই সে যে অশিক্ষিত জাতির মধ্যে একজন দূত পাঠিয়েছেন তাদের কাছে তার (আল্লাহর) বাণী পৌছে দিতে, তাদের পরিশুদ্ধ করতে এবং কিতাবে ও বিজ্ঞতায় তাদের নির্দেশনা দিতে। যদিও পূর্বে তারা প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে ছিল।"[১৬৪] এ বাণী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, পরিশুদ্ধকরণ এবং আনুগত্যের নির্দেশনার দায়িত্ব আল্লাহ নবীর উপর দিয়েছিলেন। আমরা জানি যে, তিনি তার দায়িত্ব সফল ও সম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করেছেন।

সুতরাং আমরা শিক্ষাকে এক প্রকার 'তা'দিব' বা শৃঙ্খলা বলতে পারি। "ইসলামী দৃষ্টিতে শিক্ষার অর্থ তারবিয়াহ, তালিম এবং তাদিব। ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত ধর্ম। সে এটা ইসলামের শেষ নবীর কাছে জিব্রাঈলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সকল প্রকার ভুল থেকে মুক্ত। আল্লাহ নিজেই ইহার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[১৬৫]

ইসলামী শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যের আর একটি দিক হলো চরিত্র গঠন। আদিকাল থেকেই একটা প্রবাদ বিদ্যমান, যদি সম্পদ হারায় তবে যেন কিছুই হারাল না, যদি স্বাস্থ্য হারায় তবে কিছু হারাল; কিন্তু যদি চরিত্র হারায় তবে সবই হারাল। খুব কম লোকই এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে আপত্তি করেছে যে চরিত্র কী? এই ক্ষেত্রে চরিত্রের নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন ড. মাহার আব্দুল হক, "আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কাজ করা এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ পরিহার করাই প্রকৃত চরিত্র আর প্রশংসনীয় আচরণ।"[১৬৬] আমরা ইতোপূর্বে যা আলোচনা করেছি তার অধিকাংশ ব্যক্তিগত জীবনের আত্মশুদ্ধি সম্পর্কিত, ইসলামী শিক্ষায় লক্ষ্য ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের আত্মশুদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী একাকী বাস করে না। মানুষকে বহুবচনে ব্যবহারে এটা প্রকাশ পায়। 'হে মানুষ! তুমি' এর তুলনায়' হে বনী আদমের সন্তানেরা' এবং 'হে লোকসকল' এর প্রত্যেকটি বারবার এসেছে।[১৬৭] একজন ব্যক্তি পরিবারের সাথে সাথে সমাজেরও সদস্য। সমাজের একাগ্রতার সহায়ক বিভিন্ন আদর্শের উন্নয়নও এ পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্য। এ সকল আদর্শের উদাহরণস্বরূপ "অন্যকে ভালবাসা, আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অন্যের প্রতি সদয় হওয়া, বিনয় এবং নম্রতা। সামাজিক ব্যাধি যেমন- অহংকার, মিথ্যা রটানো এবং নিন্দা করা দূর করতে হবে। সামাজিক দক্ষতা অর্জন করা এবং সুন্দর কথোপকথন ও ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[১৬৮] সমস্ত জ্ঞান যা মুসলমানকে তার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন ইসলামী নির্দেশনা অনুসারে গঠনে সাহায্য করে তা প্রত্যাশিত এবং আবশ্যক। ইসলামী বিশ্বাস ও নির্দেশনার সকল স্তরের সকল জ্ঞান পাঠ্যসূচিতে থাকতে হবে, কেবল একটা বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি ইসলামী পদ্ধতি তৈরি করতে পারে না।[১৬৯] ইসলামী শিক্ষার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে সৎ ও সঠিক ব্যক্তি তৈরি করা-যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে পূজা করে এবং শরীয়াহ অনুসারে জীবন গঠন করে। ইসলামে প্রার্থনা বিস্তৃত এবং সমন্বিত; এটা কেবল শারীরিক কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এটা কাজ, বিশ্বাস এবং অনুভূতি। আল্লাহ বলেছেন, আমি মানুষ ও জ্বীনকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি,[১৭০] এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করে। কতিপয় ইসলামী বিশেষজ্ঞরা বলেন, ইসলামী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানব অভিজ্ঞতার প্রেরণ/বিনিময়। এই বিষয়ে সাজ্জাদ হোসাইন এর বক্তব্য প্রাসঙ্গিক যিনি অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অর্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) দক্ষতা বা প্রযুক্তিগত বিদ্যার অভিজ্ঞতা যা বয়সের তারতম্যে পরিবর্তিত হয় এবং যা নিয়মিত পরিবর্তনে বাধ্য। (২) এবং কতিপয় স্থির এবং স্থায়ী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অভিজ্ঞতা যা ধর্মে ও কিতাবে নিহিত।[১৭১]

মূলত ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরিশুদ্ধতা অর্থাৎ একটা পরিশুদ্ধ জীবনের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করা এবং আন্তরিকতা। যেমনঃ–

---

[১৬৪] সূরা জুম'য়া, আয়াত নং-২।
[১৬৫] সূরা আল-ফুসিলত, আয়াত ৪২।
[১৬৬] সূরা ইনফিতার, আয়াত-৬।
[১৬৭] Abdur Rahman Saleh Abdullah, Educational theory, a Quranic outlook, Umm Al-Quis University, Makkah Al-Mukarramah, Faculty of Education, p-7.
[১৬৮] সম্পাদকীয় পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-৫১।
[১৬৯] সূরা জারিয়াত, আয়াত-৫৬।
[১৭০] Hussein S.S. And Ashrat, S.A. Crisis in Muslim Education, Hodder & Stoughton, king Abdul Aziz University, Jeddah, 1st Publish, 1979, P-37.
[১৭১] Al-Attas, S.M.N. Aims and objective of Muslim Education. Hodder & Stoughtion, king Abdul Aziz University, Jeddah, 1st Printed 1979.

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রতিটি নর ও নারীর ঈমানের মৌলিক শিক্ষা অর্জন বাধ্যতামূলক।
২. শিক্ষাকে সর্বজনীন রূপদান, যাতে মানুষ জীবনব্যাপী প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারে।
৩. সকল প্রকার কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান, যাতে শিক্ষক ও ছাত্র পাঠদানে অংশীদার হতে পারে।
ক্ষতিকর ও অপকারী শিক্ষা থেকে বিরত রাখা।
প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিনা ব্যয়ে প্রদান।
৬. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহ দান।
৭. শিক্ষক ও ছাত্রকে যথা প্রযোজ্য সম্মান দান, তাদের মাঝে সকল মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটানো এবং সকল ধরনের কঠোরতা পরিহার।
৮. পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা।
৯. ব্যক্তি ও সমষ্টিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব জ্ঞান শিক্ষা ও আদর্শ স্থাপন।
১০. অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
১১. জাতীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে তোলা।
১২. শিক্ষার্থীদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা দান।
১৩. শিক্ষার জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা অবারিত রাখা।[১৭২]

কুরআনের আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

فلوْلاَ نَفرَ مِن كُلِّ فِرْقةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفة لِّيَتفقَّهُوا فِي الدِّين وَلِيُنذِرُوا قوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعَلَّهُمْ يَحْذرُونَ

"তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকেই যেন কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভের জন্যে বেরিয়ে পড়ে, অতঃপর ফিরে গিয়ে যেন নিজ নিজ এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে করে তারা ইসলামবিরোধী কাজ থেকে] বিরত থাকতে পারে।"[১৭৩]

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ

"কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান এবং নবূয়্যাত দান করবেন আর এগুলো লাভ করে সে মানুষকে বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সেতো বলবে ঃ তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাও। এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলেন, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। যেমন তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।"[১৭৪]

فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً * قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً

সেখানে তারা আমার এমন এক দাসকে পেল, যাকে আমি আপন রহমতে ধন্য করেছি আর নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি। মূসা তাকে বললঃ আমি কি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি, যাতে করে আপনাকে যে সত্যের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে আপনি তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেন?"[১৭৫]

فاعْلمْ أنّهُ لا إِلهَ إِلا اللّهُ

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"[১৭৬]

---

[১৭২] প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান, ড. মোঃ আনসার আলী খান, আদর্শ শিক্ষক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং-৪০-৪১
[১৭৩] সূরা আত তাওবা ঃ ১২২।
[১৭৪] সূরা আল ইমরান ঃ ৭৯
[১৭৫] সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৫-৬৬।
[১৭৬] সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদেরকে অবশ্যি আল্লাহর নিকট একত্রিত করা হবে।"[১৭৭]

وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ

"জেনে নাও যে, তোমরা অবশ্যি আল্লাহর সাথে মিলিত হবে।"[১৭৮]

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদের সন্তান ও সম্পদ পরীক্ষার বস্তু আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে অবশ্যি বড় পুরস্কার।"[১৭৯]

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

"জেনে নাও যে, কেবল আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক। উত্তম অভিভাবক তিনি আর উত্তম সাহায্যকারী।"[১৮০]

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"এই জ্ঞানার্জন করো যে, দুনিয়ার জীবনটা একটা খেল-তামাশা ও চাকচিক্য মাত্র। আর পরস্পরে গৌরব করা এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। যেমন এর বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তাকে পরিণত দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটো হয়ে যায়। বিপরীত পক্ষে রয়েছে পরকাল। সেখানে আছে কঠিন আযাব আর আছে আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তোষ। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।"[১৮১]

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

"আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরা তাঁকে ভয় করে।"[১৮২]

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ * رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ * رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

"জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোকেরা বলে আমরা এ কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি। এর সবটুকুই আমাদের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। শিক্ষা তো কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে। তারা প্রার্থনা করে ঃ প্রভু! তুমিই যখন আমাদের সঠিক পথে এনে দিয়েছ, তখন তুমি আমাদের মনে কোনো প্রকার কুটিলতা আর বক্রতা সৃষ্টি করে দিও না। তোমার রহমতের ভাণ্ডার থেকে আমাদের দান করো। কারণ প্রকৃত দাতা তো তুমিই। আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবে, যে দিনের আগমনে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো ভঙ্গ করেননা অঙ্গীকার।"[১৮৩]

---

[১৭৭] সূরা আল বাকারা ঃ ২০৩।
[১৭৮] সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩।
[১৭৯] সূরা আনফাল ঃ ২৮।
[১৮০] সূরা আনফাল ঃ ৪০।
[১৮১] সূরা আল হাদীদ ঃ ২০।
[১৮২] সূরা ফাতির ঃ ২৮।
[১৮৩] সূরা আল ইমরান ঃ ৭-৯।

Dhaka University Institutional Repository

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শোনার, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত করো আর তাদেরকে আল-কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"[১৮৪]

'হিকমাহ' মানে-জ্ঞানবিজ্ঞান, কর্মকৌশল, কর্মপ্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"আমি আমার রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনা দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে তাঁদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদণ্ড, যাতে করে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর ও পরাক্রমশালী"[১৮৫]

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

"কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা বলল ঃ তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়, ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে তো আল্লাহর পুরস্কারই উত্তম। এটা তারাই পায় যারা সবরকারী।"[১৮৬]

আল কুরআনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হলো ঃ

১. মানুষকে তার স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহ্র দাস হিসেবে তৈরি করা।
২. দ্বীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধি হাসিল করা।
৩. সত্যকে জানা ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।
৪. তাওহীদের জ্ঞানার্জন করা।
৫. পরকালকে জানা এবং পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
৬. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং আল্লাহ্র পুরস্কারের আকাঙ্খী হওয়া।
৭. আল্লাহকে অভিভাবক বানাবার যোগ্যতা অর্জন।
৮. আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
৯. আল্লাহর ভয় অর্জন।
১০. সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।
১১. আল কুরআনের মর্ম উপলব্ধি।
১২. কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতা লাভ করা।
১৩. মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ।
১৪. মানবসমাজকে সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা অর্জন।
১৫. ঈমানের ভিত্তিতে সৎকর্ম অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জন এবং এরি মাধ্যমে আল্লাহর পুরস্কার লাভের যোগ্য হওয়া।
১৬. সূরা আল বাকারার ২৪৭ নম্বর আয়াতে শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।
১৭. একই আয়াতে মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে।

[১৮৪] সূরা আল জুময়া ঃ ২।
[১৮৫] আল হাদীদ ঃ ২৫।
[১৮৬] সূরা কাসাস ঃ ৮০।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, কুরআনের দৃষ্টিতে শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হলো, আল্লাহকে জানা আল্লাহর দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালের মুক্তির জন্যে নিজেকে তৈরি করা।

শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল বানানো এবং মানবতাকে সত্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।[১৮৭]

হাদিসের আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

কোরআনের ন্যায় হাদিসেও মানবজাতিকে শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এখানে কিছু নমুনা দেওা হলো :

ক. আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হুযুর (সাঃ) বলেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয। অপাত্রে শিক্ষাদান শূকরের গলায় পান্না-মুক্তা সোনার মালা পরানোরই নামান্তর।"[১৮৮]

খ. আনাস (রাঃ) বলেন, হুযুর (সাঃ) বলেছেন, "যখন কেউ জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়, ফিরে আসার আগ পর্যন্ত সে যেন আল্লাহর রাস্তায়ই আছে।"[১৮৯]

গ. আয়েশা (রাঃ) বলেন, "শিক্ষার আধিপত্য জান্নাতে পদমর্যাদার আধিপত্যের থেকেও উত্তম। এবং ধর্মের মূল হচ্ছে সংযম।"[১৯০]

ঘ. আনাস (রাঃ) আরও বলেন, আল্লাহর নবী বলেন, "সূদূর চীন দেশে যেয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ কর।"[১৯১]

ঙ. ইবনে মাসুদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নবী বলেছেন, "দুই ব্যক্তি ব্যতীত কারো সাথে ঈর্ষা করা যাবে না। একজন ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন ও উহা সত্যের জন্য ব্যয়ের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ বিজ্ঞতা দিয়েছেন আর তা অনুসারে সে কাজ করে এবং ইহা (অন্যকে) শিক্ষা দেয়।"[১৯২]

চ. কাসির ইবনে কায়েস বলেন "ধার্মিক ইবাদতকারীর উপর একজন শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতা এরকম যেরকম পূর্ণিমার চাঁদের আলোর শ্রেষ্ঠতা অন্যান্য তারকার উপর, অবশ্যই শিক্ষিতরা হুযুর (সঃ) এর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার এবং হুযুর (সাঃ) তাদের জন্য কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা রেখে যাননি বরং শিক্ষাকে রেখে গেছেন, তাই যে উহা অর্জন করবে সে সফলকাম হবে।"[১৯৩]

ছ. আবু উম্মাহ (রাঃ) বলেন, "আল্লাহর নবীর কাছে দুই ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের একজন ধার্মিক বান্দা এবং অন্য জন শিক্ষিত ব্যক্তি।" পরে নবীজি বলেন, "ধর্মের ইবাদতকারীর উপর বিদ্বানের শ্রেষ্ঠতা এমন যেমন তোমাদের উপর আমার শ্রেষ্ঠতা।" অতঃপর নবীজি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ ফেরেশতা, জান্নাত ও দুনিয়াবাসী, এমনকি গর্তের পিপীলিকা থেকে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য দোয়া করে।"[১৯৪]

জ. আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন আল্লাহর নবী বলেছেন, "কে সবচেয়ে উদার?" তারা জবাব দিল আল্লাহ ও তার রাসলেই ভাল জানেন। উদারতায় আল্লাহ সবচেয়ে বেশি এবং তারপর আমি আদমের সন্তানের উপর বেশি উদার আর আমার পর সবচেয়ে বেশি উদার ব্যক্তি হবে সেই যে জ্ঞানার্জন করে এবং ইহা প্রচার করে। পুনরুত্থানে সে একজন শাসক হবে।"[১৯৫]

ঝ. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নবী বলেছেন, "আমার অনুসারীদের মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে; যখন তারা ভাল হয় জনগণও ভাল হয় আর যখন তারা খারাপ হয় জনগণও খারাপ হয়। তারা হলো শাসক এবং ধর্মতত্ত্বের বিশেষজ্ঞরা।[১৯৬]

ঞ. নবীজি বলেন, "শহীদের রক্তের চেয়ে বিদ্বানের কলমের কালি অধিকতর শক্তিশালী"।[১৯৭]

ট. আমার অনুসারীদের মধ্যে থেকে যে চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করবে সে তার প্রভুর সাথে একজন শিক্ষিত ধর্মবিশেষজ্ঞ হিসেবে সাক্ষাত করবে।[১৯৮]

---

[১৮৭] আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা-১২১৭, পৃষ্ঠা নং-৮৬-৮৭।

[১৮৮] ইমাম গাজ্জালী, ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন, মাওলানা ফজলুর রহমান অনুদিত, প্রকাশ ১৯৮২, নয়াদিল্লী, পৃ-১৪।

[১৮৯] উপরোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৬।

[১৯০] উপরোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৭।

[১৯১] শরহে বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৬, অধ্যায় আইএলএম।

[১৯২] তিরমিজী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৩।

[১৯৩] উপরোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা- ২৪৪।

[১৯৪] গাজ্জালীর সূত্র, পৃষ্ঠা-১৮।

[১৯৫] আবু নাঈম, :"A code of the teaching of AL-Quran By Mohd. Sharif Chy" পৃষ্ঠা-৪২৩।

[১৯৬] ইমাম গাজ্জালীর পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৬।

[১৯৭] ইমাম গাজ্জালী পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, ধর্মের জ্ঞানীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে সাহায্য করেন যা সে কল্পনাই করেনি। তিনি বলেন, আল্লাহ ইবরাহীম (আ:) এর নিকট প্রকাশ করেন যে, "আমি সর্ববিজ্ঞ এবং আমি প্রত্যেক বিজ্ঞকে ভালবাসি। তিনি বলেন, "একজন শিক্ষিত মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর বিশ্বস্ত ব্যক্তি।"[১৯৯] এসমস্ত হাদিস ছাড়াও নবীজীর অনেক হাদিস আছে যা সরাসরি মানুষকে জ্ঞানার্জনে ও শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসগুলো থেকে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করলাম। হাদিসগুলোর আলোকে আমরা জানতে পারলাম, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ঃ

১. মানবকল্যাণ।
২. সুশিক্ষা বিস্তার।
৩. আল্লাহ্কে জানা ও আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জন।
৪. আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উপায় জানা।
৫. কুশিক্ষা নির্মূল করা এবং শিক্ষা সংস্কার করা।
৬. ইসলামকে পূনরুজ্জীবিত করা।
৭. কর্তব্যপরায়ণ হওয়া।
৮. কুরআনের আলো বিস্তার।[২০০]

---

[১৯৮] ইমাম গাজ্জালী পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৬।
[১৯৯] ইমাম গাজ্জালী পূর্বোক্ত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৬।
[২০০] আবদুস শহীদ নাসিম, শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা-১২১৭, পৃষ্ঠা নং-১০২-১০৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন সময়ের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা বিস্তার

বহু শতক ধরে অজ্ঞানতা ও বর্বরতায় নিমজ্জিত একটি জাতি তথা মানবসমাজকে নৈতিক শিক্ষার পবিত্র স্পর্শে সুসভ্য জাতিতে পরিণত করতে যে মহামানব এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। মানবজাতিকে উন্নত ও সভ্য করার লক্ষে ওহীভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে উজ্জীবিত করে এবং মননের ক্ষেত্রে বন্ধাত্বের সে অন্ধকার যুগে জীবন ও আলোয়ের পতাকা উত্তোলন করার প্রয়াসে তিনি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।[২০১]

মক্কায় প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষা কেন্দ্রের নাম উপস্থাপন করা যায়। যেমন- (১) মসজিদে আবু বকর (রা) (২) ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব (৩) দারুল আরকাম (৪) শিয়ারে আবু তালিব ঠিক তেমনিভাবে মদীনায়ও রাসুল (সঃ) এর শিক্ষা বিস্তার অব্যাহত থাকে। নবুয়তের দশম সালে হজ্বের মৌসুমে মদিনার খাজরাজ গোত্রের ছয়জন সম্মানিত আনসার মক্কায় এসে ইসলাম কবুল করেন এবং তার পরের বছর ১১০০ সালে মদিনার আউস গোত্রের মোট ১২ জন আনসার ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামের ইতিহাসে একে আকবার প্রথম বাইয়াত বলা হয়। তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে রাসূল (সঃ) হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের কে মদিনার জন্য ১ম শিক্ষক মনোনয়ন দান করেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের মদীনায় এসে মদীনায় তখনকার ধনী ব্যক্তি হযরত আসওয়াদ ইবনে জুবারাহ (রাঃ) এর গৃহে অবস্থান করেন। ইসলামের ইতিহাস হযরত আসওয়াদ ইবনে জুবারাহ (রাঃ) এর গৃহ মদিনার প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে স্থান পেয়েছে। রাসূল (সঃ) এর যুগের পাঠ্যসূচি তীরন্দাজী ও অভিযানমূলক কসরত শিখানো হতো।[২০২]

বর্তমান বিশ্বে যে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি চালু হয়েছে তৎকালীন যুগে এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মুসআব ইবন উমায়র (রাঃ) প্রতিদিন নিয়মানুযায়ী আনসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন এবং কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত (মহানবী (সাঃ) এর প্রতি নাযিলকৃত অংশ) পাঠ করে শোনাতেন। কুরআন যেহেতু তাদের মাতৃভাষা আরবীতে নাযিল হয়েছে, সেহেতু তারা কুরআনের অর্থ ও মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারতেন। ফলে প্রতিদিন ২/৩ জন করে ইসলাম কবুল করতে লাগলেন। এভাবে মদিনায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও ইসলামী জীবন প্রতিষ্ঠা জোরদার হয়েছি।[২০৩] তৎকালীন শিক্ষাসূচিতে কুরআন, হাদিস, অংক, ফারায়িয, বংশতালিকা ও তাজবীদ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। যে শিক্ষক যে বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকতেন, তিনি সে বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। ব্যায়াম সম্পর্কেও তখন শিক্ষাদান করা হতো।[২০৪] ব্যায়ামের পাশাপাশি অশ্বারোহ, তীরন্দাজী ও অভিযানমূলক কসরতও শিখানো হতো।[২০৫] রাসূল (সা)-এর শিক্ষাসূচির অপর এশটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষায় কুরআন শিক্ষা করা বাধ্যতামূলক। অতঃপর শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে অন্যবিষয়ের পঠন-পাঠনে অগ্রসহ হতেন।[২০৬] তার যুগে সাহাবী হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ) অংক বিদ্যায় পারদর্শ ছিলেন। ভাষা শিক্ষায় তারা শুধু আরবিকেই প্রাধান্য দিত না বরং আরব দেশের বাইরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তারা অন্যান্য ভাষাও শিখতেন এবং এটা রাজনৈতিক কারণেও প্রয়োজন ছিল।[২০৭]

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের শিক্ষাব্যবস্থা

ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) শিক্ষার প্রচার প্রসার ও পরিচালনার জন্যে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা চালু করেন। এ ছাড়া অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠা করেন, যার সাক্ষীরূপে মদিনা শরীফে মাদ্রাসায়ে আবু বকর যুগ যুগ ধরে বিদ্যমান ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বিভিন্ন ভাষা থেকে আরবি ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের পুস্তক রচনা করেন। পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য জয় করে আরবে আজমে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেন। আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগের উপযোগী শিক্ষা কাঠামো পুনর্বিন্যাস করেন। হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআন সংকলন করে ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা চিরভাস্বর হয়ে

---

[২০১] মোঃ ইসমাইল মিয়া, শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ-পৃষ্ঠা-২২২-২২৪, ঢাকা।

[২০২] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২০, ২২৯।

[২০৩] আশরাফী, মাওলানা ফজলুর রহমান, মদিনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলামিক নলেজ এণ্ড ডায়েরি ১২ নভেম্বও ১৯৯৪, ঢাকা, পৃ-১৫০।

[২০৪] M.A. Satter, Tarikh-E-Madrasha-E-Aliah, Research Publication Section, Madrasha-I-Aliah, Dhaka, 1957, p-141

[২০৫] খুলাফায়ে-ই-রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ২৭ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ-৩১৬।

[২০৬] History of Muslim Education, Vol-II, Karachi, 1967, P-22

[২০৭] The Islamic University Studies, Vol-I, June 1990, Kushtia, P-38.

Dhaka University Institutional Repository

আছে। তিনি মসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা সম্প্রসারণ করেন যার মধ্যে মদিনা শরীফে মাদ্রাসায়ে ওসমান (রাঃ) তার স্মৃতি বহন করছে।

হযরত আলী (রাঃ) আরবি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন এবং কুরআন পাঠের চিরস্থায়ী সমাধান দান করেন। তিনি কুফা, বসরা, মক্কায়, মদিনায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এর মধ্যে কুফায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাউউদ (রাঃ) কে শিক্ষা হিসেবে নিয়োগ দান করেন যা মাদ্রাসায়ে আলী (রাঃ) বলে খ্যাতি অর্জন করে।[২০৮] এছাড়া বিভিন্ন হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) মদিনায় এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কায় শিক্ষার প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[২০৯]

মহান আল্লাহপাক পবিত্র কুরআন[২১০] এ পড়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাসুল (সঃ) সকলকে জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করিয়েছেন। রাসুল (সাঃঃ) এর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে খুলাফায়ে রাশেদা শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর চার খলিফা[২১১] হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত উমার ফারুক (রাঃ), উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)। এই চার খলিফা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান অর্জনকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। "খলিফাগণ মুসলিম জাহানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। খুলাফা-ই- রাশেদীনের সময় হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ জ্ঞান সাধনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তারা উভয়ই কবিতা, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, অংকশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। এ সময়ে হস্তলিপি চর্চা, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল।[২১২] "উমর (রাঃ) রাজ্যের সর্বত্র মক্তব প্রতিষ্ঠা করে তাতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেন। বায়তুল মাল থেকে তাদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মদিনা শহরে শিশুদের মক্তবগুলোতে কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি কিছু লিখন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমগ্র রাজ্যে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন। তার শাসন আমলে সিরিয়ার এক বিদ্যালয়ে ১৬০০ ছাত্র অধ্যয়ন করত।[২১৩] বিদ্যালয়ে কুরআন, হাদিস ও ফিকহ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। এসময় গণিতও পাঠ্য তালিকায় অন্ত র্ভুক্ত ছিল। ইমাম ইউসুফ লিখেছেন উমার (রাঃ) কোথাও সৈন্য প্রেরণকালে হাদিস ও ফিকহ এর অভিজ্ঞ আলেমকে তার অধিনায়ক নিযুক্ত করতেন।

ইলমে দীনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সেনাপতি নিয়োজিত করার এক উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করা।[২১৪] হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় জ্ঞানী ব্যক্তিদের বক্তৃতা বিবৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের আয়োজন করেন। এ সময় পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিষয় শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাঁর আমলে কাব্য চর্চা বেশ সফলতা লাভ করে। তখন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে কাব্যচর্চার আসর বসত এবং মাঝে মাঝে কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতা চলত।[২১৫] হযরত আলী (রাঃ) আরবী গদ্যের জনক ছিলেন। তার হাতেই আরবি গদ্য রচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। শুধু তাই নয়, তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিও ছিলেন। তার রচিত "দীওয়ান-ই-আলী" আরবি সাহিত্যের এক উল্লেখ্যযোগ্য সংযোজন। হযরত আলী (রাঃ) শুধু মক্কাও মদিনায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন নি বরং কুফাতেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং সেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দান করেন। যা মাদ্রাসায়ে আলী (রাঃ) বলে খ্যাতি অর্জন করে। তায়েফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ মদিনায় আবু হুরায়রা (রাঃ), আয়শা (রাঃ) ও মক্কা শরীফে হযরতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তাদের এই অবদান ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।[২১৬]

---

[২০৮] শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম, গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২৬।

[২০৯] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭।

[২১০] আল কুরআন, ইকরা-কারাউন শব্দ থেকে এসেছে। অর্থ পাঠ করা। আবার 'মাকরুউন-মাফউলুন' থেকে অর্থ পঠিত। পারিভাষিক অর্থে কোরআন হচ্ছে আল্লাহতায়ালার ঐ ঐশী মহাগ্রন্থ, যা তিনি তার রাসূল হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর উপর নাজিল করেছেন। (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, অষ্টম খণ্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ-৪৪৮-৪৯০।

[২১১] খলিফা মূল শব্দ অর্থ স্থলবর্তী, প্রতিনিধি। ইহার বিশেষ অর্থ মহানবী (সঃ) এর প্রতিনিধি। দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯ম খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯০, পৃ-৩৯৩।

[২১২] মোঃ নূরুল ইসলাম, ইসলাম ও জীবন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৭৫, পৃ-১৪২।

[২১৩] আল্লামা শিবলী নেমোনী, আল-ফারুক, অনুবাদঃ মহিউদ্দীন খান, ইমদাদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ-২৫৭।

[২১৪] প্রাগুপ্ত- প্র-২৫০।

[২১৫] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ. এস. এম আলাউদ্দিন, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকাঃ ১৯৯৯, পৃ-২২

[২১৬] বজলুর রহমান খান, শক্তির বাণী, ৪২/২, আজিমপুর, ঢাকাঃ ১৯৯৪, পৃ-১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ঘটে। সেটা আব্বাসীয় ও উমাইয়া যুগে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদের ধারাবাহিকতায় এই যুগ স্বর্ণযুগে পরিণত হয়েছিল। তাদের যুগে সকল শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছিল। তাদের এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তারা শিক্ষার সকল পার্শ্বে উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল এবং শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে ধর্ম ও নৈতিকতা বিরাজমান ছিল।

উমাইয়া শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা (৬৬১-৭৫০) ঃ

উমাইয়াদের শাসন ব্যবস্থা ছিল একটি শক্তির স্বর্ণযুগ। এই যুগে শাসকগণ তাদের শাসন কার্য পরিচালনা করতেন কুরআন, সুন্নাহ ও নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে। যারা উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন তাদের কয়েকজনের কথা আলোচনা করা হলো।

মুয়াবিয়া (৬৬১-৬৮০) ঃ

৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩০ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী (সঃ) এর জীবনদশায় তিনি তাঁর সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইমাম হাসানকে খিলাফতের পদ থেকে বঞ্চিত করে নিজে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। মানুষ ও শাসক হিসেবে মুয়াবিয়া সাহসী, উচ্চাকাঙ্খী ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ৬৮০ সাল পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[২১৭]

ইয়াজিদ (৬৮০-৬৮৩) ঃ

"মৃত্যুর পূর্বে মুয়াবিয়া তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাদের ডাকলেন এবং তার পুত্র ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করলেন, তাকে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেছিলেন।
এভাবেই ইয়াজিদ খলিফা পদে বরিত হন।[২১৮] তিনি ছিলেন একজন অদক্ষ শাসক। মানুষের দুঃখে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন। তিনি ৬০০ সালে শাসন ভার গ্রহণ করার পর থেকে খুব ভালোভাবে শাসনভার চালাতে পারেনি। তিনি ৬৮৩ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

দ্বিতীয় মুয়াবিয়া (৬৮৩-৬৮৪) ঃ

ইয়াজিদের পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়া তার পিতার মৃত্যুর পর ৬৮৩ সালে ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। তিনি ৬৮৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন। ফলে মুয়াবিয়ার বংশধরের হাত হতে ক্ষমতা চলে যায়। উমাইয়া বংশের অন্যর গোত্র আবুল আসের বংশধর উমাইয়া বংশের শাসনভার চালাতে থাকেন।

মারওয়ান (৬৮৪-৬৮৫)[২১৯] ঃ

উমাইয়া বংশের মারওয়ান শাখার প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান ৬৮৪ সালে সিংহাসনে বসেন এবং ৬৮৫ সাল পর্যন্ত শাসনভার চালান। অন্যমতে তিনি ৬৮৩-৬৮৫[২২০] খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন।

আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫) ঃ

মারওয়ান এর পর সিংহাসনে বসেন তার সুযোগ্য পুত্র আব্দুল মালিক। আব্দুল মালিক ৬৮৫ সালে ক্ষমতায় বসেন এবং ৭০৫ সালে পর্যন্ত শাসনভার পরিচালনা করেন। তিনি একজন সার্থক রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। এজন্য তাকে রাজাদের পিতা হিসেবে অভিহিত করা হতো। আব্দুল্লাহ আল মালিক এবং তাঁর চার পুত্রের[২২১] শাসনে দামেস্কে এই রাজবংশ ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের শিখরে পৌছায়।[২২২] আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান আদেশ জারি করে মদিনাতে রওজা শরীফ জিয়ারত তীর্থযাত্রীদের জন্য

---

[২১৭] দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, স্যার সৈয়দ আমীর আলী, অনুবাদ ডঃ রশীদুল আলম, প্রকাশনী- মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৯৫, পুনঃমুদ্রণ- জানু ২০০০, পৃ-৪০২।
[২১৮] দ্য স্পিরিট অব ইসলাম, স্যার সৈয়দ আমীর আলী, অনুবাদ ডঃ রশীদুল আলম, প্রকাশনী- মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৯৫, পুনঃমুদ্রণ- জানু ২০০০, পৃ-৪০২।
[২১৯] History of the Muslim, আফরোজা বেগম, লেখা-পড়া প্রকাশনী, প্রকাশকাল- জুলাই, ২০০৪, পুনঃ প্রকাশ জুন, ২০০৫, পৃ-২৪৮।
[২২০] আরব জাতির ইতিহাস, ফিলিপ কে, হিট্টি, প্রকাশনী- মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, মূলগ্রন্থ- হিস্ট্রি অব দি অ্যারবস, দশম সংস্করণ, পৃ-২৩০।
[২২১] আল-ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খৃঃ), সুলাইমান (৭১৫-৭১৭), দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-৭২৪) এবং হিশাম (৭২৪-৭৪৩)।
[২২২] আরব জাতির ইতিহাস, ফিলিপ কে, হিট্টি, প্রকাশনী- মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, মূলগ্রন্থ- হিস্ট্রি অব দি অ্যারবস, দশম সংস্করণ, পৃ-২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।[২২৩] মদিনা শরীফকে সকল শাসকগণ বিরানভূমিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। সর্বোপরি উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তিনি কিছুটা হলেও উত্তম ছিলেন, এজন্য তাকে Father of Kings বলা হতো।

ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রিঃ) ঃ

খলিফা আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম পুত্র প্রথম ওয়ালিদ ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে সিংহাসনে বসেন। খলিফা নিজে যোদ্ধা ও সমরকুশলী না হলেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, কুতাইবা, মুসা, তারিক ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো বিশ্বনন্দিত যোদ্ধার সহায়তা লাভ করেন। তাদের প্রচেষ্টায় ইসলামের বিজয় পতাকা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় উত্তোলিত হয়। তিনি ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে তুখারিস্তান, ৭০৬-৯ খ্রিঃ বুখারা, ৭১০-৭১২ খ্রিঃ সমরকন্দ এবং খোয়ারিজম এবং ৭১৩-১৫ খ্রীঃ জ্যাকসার প্রদেশ দখল করেন।[২২৪]

সোলায়মান (৭১৫-১৭ খৃঃ) ঃ

ওয়ালিদের পর তার ভ্রাতা সোলায়মান দামেস্কের সিংহাসনে বসেন ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে । ৭১৫-৭১৭ খ্রীঃ সুলাইমান এর অভিযানকেই ইতিহাস গুরুত্ব দেয়। "সোলায়মান নিজেকে হাদিসে-বর্ণিত সেই খলিফা হিসেবেই মনে করতেন, তাঁর ধারণা ছিল তিনি পয়গম্বরের নামধারণ করে কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করতে আবির্ভূত হয়েছেন।[২২৫]

দ্বিতীয় ওমর (৭১৭-৭২০) ঃ

খলিফা সোলায়মানের মৃত্যুর পর তার চাচাত ভাই ওমর-বিন-আব্দুল আজিজ ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) এর সাথে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল থাকায় তাকে দ্বিতীয় ওমর বলা হতো। তার শাসন সংস্কার ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি উমাইয়া শাসকদের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বাদ দিয়ে খুলাফায়ে রাশেদার পথ অনুসরণ করেন। এজন্য তাকে উমাইয়া বংশের সাধু পুরুষ ও পঞ্চম খলিফা বলা হয়। তিনি ৭২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। শক্ত হাতে তিনি শাসনভার পরিচালনা করেন। রাজ্য বিস্তার ঘটান এবং ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তার ভূমিকা অপরিসীম। ওমর (রাঃ) তার এক কর্মচারীকে বলেন,– আল্লাহর নামে বলছি, আমি খুশি হতাম যদি দেখতে পেতাম যে সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কেননা আপনাকে এবং আমাকে জীবন ধারণের জন্য নিজের হাতেই জমি চাষ করে খেতে হবে।[২২৬] মুয়াবিয়ার সময় প্রচলিত শুক্রবারের নামাজ পাঠের সময়ে মিম্বর থেকে 'আলীর' প্রতি কটূক্তির প্রথা তিনি বন্ধ করে দেন"।[২২৭] দ্বিতীয় ওমর (৭১৭-৭২০) অবশ্য পরে ধর্মান্তরিত হওয়া মুসলমানদের অসন্তোষ দূর করতে কিছু ব্যবস্থা নেন। তিনি পুনরায় প্রথম ওমরের নীতি চালু করেন। নিয়ম হলো- আরবের লোকই হোক বা মাওলা-ই হোক কোন রকম কর দিতে হবে না। তবে তিনি পরিষ্কার ঘোষণা দেন যে, "খারাজ" জমি মুসলমানদেরই যৌথ সম্পত্তি[২২৮] শক্ত হাতে শাসনভার পরিচালনার জন্য তাকে দ্বিতীয় উমর বলা হয়।

হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রিঃ) ঃ

দ্বিতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা হিশাম ইসলামী খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ তিনি নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেও স্বীয় দক্ষতা ও যোগ্যতার মাধ্যমে নিজ কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করেছিলেন। তার শাসনকালেই আরব সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, ভূমধ্যসাগরস্থ, মেজবর্গ, মিনর্বা, ইভিকা, ক্রীট, সিসিল, সাইপ্রাস প্রভৃতি তার শাসন আমলেই আরব সমাজের অন্তর্ভূক্ত। তাই ঐতিহাসিকগণ তাকে উমইয়া বংশের শেষ গৌরব বলে অভিহিত করেন।

---

[২২৩] দ্য স্পিরিট অং ইসলাম, স্যার সৈয়দ আমীর আলী, অনুবাদ ডঃ রশীদুল আলম, প্রকাশনী- মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৯৫, পুনঃমুদ্রণ- জানুয়ারি ২০০০, পৃ-৪০৬।

[২২৪] সংক্ষিপ্তকরণ, আরব জাতির ইতিহাস, ফিলিপ কে, হিট্টি, প্রকাশনী- মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, মূলগ্রন্থ- হিস্ট্রি অব দি অ্যারবস, দশম সংস্করণ, পৃ-২৩৫।

[২২৫] প্রাগুক্ত, পৃ-২২৫।

[২২৬] ইবনে আল জাওযী, সীরাত উমার ইবন আবদ আল-আযিয (কায়রো-১৩৩১), পৃ-৯৯-১০০। কিতাব আল-উয়ুন-অ-আল হাদায়িক ফি আখবর আল-হাকায়িক, গোজি সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৬৫), পৃ-৪।

[২২৭] ইবন আল তিকতাকা, আল-ফাখরী, সম্পাদনা এইচ ডেরেনবুর্গ (প্যারিস ১৮৯৫), অনুবাদ সি-ই জে হুইটিং (লন্ডন, ১৯৪৭)।, পৃ-১৭৬।

[২২৮] ইবনে সাদ, কিতাব আল তাবাকাত, আল-কাবীর সম্পাদনা, এডুয়ার্ড স্যাচো, পঞ্চম খন্ড, পৃ-২৬২, ২৭৭। ইবন আসাকির, আল তারীখ আল কবীর, সম্পাদনা আদ-আল কাদির বদরান (দামাস্কাস), চতুর্থ খন্ড, পৃ-৮০। আল ইয়াকুবী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৩৬২, ইবনে আল জাওযী, সীরাত উমার ইবন আবদ আল-আযিয (কায়কেরা-১৩৩১), পৃ-৮৮-৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় ওয়ালিদ (৭৪৩-৭৪৪) ঃ

দ্বিতীয় ওয়ালিদ ৭৪৩-৭৪৪ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন, শাসক হিসেবে তিনি অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থা করেন।

দ্বিতীয় মারওয়ান (৭৪৪-৭৫০ খ্রিঃ) ঃ

দ্বিতীয় ওয়ালিদের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মারওয়ান ৭৪৪ সালে ক্ষমতা অধিকার করেন। তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তার সময় শিক্ষাব্যবস্থা অনেক বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি ইসলামী শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেন।

উমাইয়া যুগে শিক্ষাব্যবস্থা (৬৬১-৭৫০) ঃ

উমাইয়া খলিফাগণ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করা এবং বিজিত অঞ্চলে তাদের শাসককে সুদৃঢ় ও জাতীয়করনের দিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারা আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করেন। সিরিয়ায় সিরীয় ও গ্রীক, মিশরে কপটিক, পারস্য ও মেসেপটোমিয়া আরমাইকের পরিবর্তে আরবি ভাষা প্রচলিত হয়। এরূপ প্রাথমিক অবস্থায় উমাইয়াদের পক্ষে কোনো নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন ও পরিচালনা করা সহজ ছিল না। তবে এ সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও উমাইয়া আমলে হাদিস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ছাড়াও ইতিহাস, ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন শুরু হয়। এ সময়ে অবাধ বক্তৃতা ছিল শিক্ষাদানের বিশেষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি উমাইয়া আমলে শেষ পর্যন্ত চলছিল।[২২৯] শাসকগণ যত ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল ইসলামী শিক্ষা, তারা সকলেই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নৈতিকতা দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন। "শুধুমাত্র শাসক বংশেই পরিবর্তন হয়নি বরং শাসননীতিরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল এবং এটি সাম্রাজের ভাগ্য ও জাতির ক্রমবিকাশের উপর প্রভুত্ব প্রভাব বিস্তার করার মতো অনেক নতুন উপাদানের জন্ম দিয়েছিল।[২৩০]

উমাইয়া যুগের প্রথম খলিফা ছিলেন মুয়াবিয়া। তিনি উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ক্ষমতা দখলের পর শাসনভারের বিভিন্ন শাখার নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখেন। যেখানে অন্য ধর্মের পণ্ডিতরা রাজত্ব করতেন সেখানে তিনি তাদের শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা প্রয়োগে গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের বিখ্যাত বইসমূহকে আরবিতে অনুবাদ করেন।

ইবনে আসল নামক জনৈক খ্রিষ্টান চিকিৎসক দিয়ে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা শাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদ করান। অপরদিকে এক খ্রিষ্টান কবি আল-আখতার তার রাজ দরবারের সভাকবি ছিলেন। খ্রিষ্টানদের এডেসার গির্জাটি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৩১] ইসলাম যে উদারতার শিক্ষা দেয়, সে কথা তিনি কাজে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন। অনেক বৈজ্ঞানিক তার অবদানের কারণে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসতে পেরেছিলেন। মসজিদগুলিতে অন্যান্য শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। সেই আমলে মুসলমানদের পরিচয় হলো আরববাসী। তারা সকলেই মুহাম্মদ (সঃ) এর অনুসারী। এরপর থেকে একজন আরববাসী মানেই এই বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হলো যে তিনি ইসলাম ধর্ম চর্চা করেন এবং আরবি ভাষা লিখতে ও বলতে জানেন। তাঁর জাতি বা বর্ণ যাই হোক না কেন, ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে এই ঘটনার তাৎপর্য ছিল বিরাট।"[২৩২] "মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া অল্প বয়সে মারা যান। অপর পুত্র খালিদ ইবনে ইয়াজিদ রাজনীতির পরিবর্তে জ্ঞানচর্চার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রে কতিপয় গ্রন্থ তার রচিত বলে উল্লেখ করা হয়।"[২৩৩] তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যত উন্নতি সাধন করেছিলেন তার মূলে ছিল ইসলামী শিক্ষা। সর্ব ক্ষেত্রে তিনি ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তবে উমাইয়া শাসকদের শিক্ষা বিস্তারের উদার মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। উমাইয়া রাজ দরবারে গুণীজনকে সম্মান ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হত। খালিদ ইবন ইয়াজিদ ইবনে মাবিয়াও উন্নত সাহিত্য চর্চা ও দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একজন কবি, বক্তা, ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনিই প্রথম জ্যোতির্বিদা, চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রের উপর গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা

---

২২৯. Mohd Abdul Muid Khin , The Muslim Theories Of Education During the Middle ages, The Jounnal of Slamic Culture, oct. 1944, p-420.

২৩০ সৈয়দ আমীর আলী, দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম, অনুবাদঃ ড. রশীদুল আলম মল্লিক ব্রাদার্স, নতুন ংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫ পুন মুদ্রণঃ জানুয়ারী-২০০০।

২৩১. History of Muslim, আফরোজা বেগম, প্রকাশনা : জুলাই-২০০৪; পৃ-২৬০।

২৩২. আরব জাতির ইতিহাস ফিলিপ কে হিট্টি, প্রকাশকঃ মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা; প্রকাশকালঃ বইমেলা ,১৯৯৯; পৃ-২৭১।

২৩৩. ইসলামিক বিশ্ব কোষ ৫ম খণ্ড, প্রকাশনাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ। পৃ-৬৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। উমাইয়া যুগের অন্যতম চিকিৎসাবিদ হাবিস ইবনে কালাদাহ" আরববাসীদের ডাক্তার' উপাধি লাভ করেন। কথিত আছে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আলেকজান্দ্রিয়া হতে এন্টিয়ক ও ইরাকে মেডিকেল স্কুল স্থানান্তরিত করেছিলেন। তার আমলে বহু গ্রীক বই আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। কাজেই দেখা যায় শিক্ষা, দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উমাইয়া যুগ পিছিয়ে ছিল না। এ ছাড়াও এই বংশের আব্দুর রহমান আরাসীয়দের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে স্পেন উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারই চেষ্টায় স্পেন মধ্যযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তারা সকলেই ইসলামী শিক্ষাকে অন্যান্য শিক্ষার সাথে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিল।

মুসলিম সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল আরবে। ইসলাম আরবদের মধ্যে যে উন্নত মানসিকতার সৃষ্টি করে মূলত তা ছিল ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ফল, আর ইসলাম ধর্মের গোড়ার কথা ছিল শিক্ষা। ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রতিপালককে জানার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভংকে চিনেছে। নিজেকে উপলব্ধি করে আল্লাহর সম্পর্ক নির্ণয় ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য।[২৩৪] ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে আজ বিজ্ঞান এতদূরে অগ্রসর হতে পেরেছে। সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে উমাইয়া যুগ অবধি শিক্ষার্থীদের প্রধান প্রধান পঠিত বিষয় ছিল তাফসীর, হাদিস, আরবিভাষা, কবিতা, গণিত ইত্যাদি।[২৩৫] উমাইয়া যুগে সাধারণত ধর্মভিত্তিক শিক্ষাই প্রচলিত ছিল। সাম্রাজ্যের মসজিদগুলোই ছিল প্রধানত শিক্ষার ক্ষেত্র। সেখানে কুরআন হাদিসকে ভিত্তি করেই শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে মক্কা, মদিনা, বসরা, কূপা ও মিশরে শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বেশি হতো। সিরিয়ার মরুভূমি, কুসায়েরুল আমরাহ এবং বাদিয়াহ, নামক স্থানদ্বয়ে রাজপুত্রদের বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। সেখান থেকে বছরের শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রদেরকে আল-কামিল ডিগ্রি দেয়া হতো। যখন আরবি ভাষা শিক্ষার জোয়ার আসে, তখন খলিফা আব্দুল মালিক আরবীকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মর্যাদা দান করেন। এতে আরবিতে শিক্ষিতরা সরকারি চাকরির সুযোগ পান।[২৩৬] হযরত আলী (রাঃ) এর বিখ্যাত শিষ্য আবুল আসওয়াদ দুআলী ৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে আরবি ভাষাকে তথা কুরআনকে সুন্দরভাবে পড়ার জন্য প্রথমে আরবি ব্যাকরণের সূত্রাবলী নির্ণয় করেন। তারপর বিখ্যাত পণ্ডিত খলিল ইবনে আহম্মদ বিশেষ আরবি অভিধান গ্রন্থ 'কিতাব উল আইন'[২৩৭] রচনা করেন। বসরার বিদ্যালয়ে সর্ব প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ পড়িবার নিয়ম প্রচলিত হয়।[২৩৮]

কুরআন, হাদিস ও আইনশাস্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে উমাইয়া যুগ ছিল এক বিরল ইতিহাস। কুরআন হাদিসের গবেষণার ক্ষেত্রে তারা বহু গ্রন্থ রচনা করে। গবেষণা ক্ষেত্রে খলিফাগণ তাদের সাহায্য করতেন। এই ক্ষেত্রে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, আমির ইবন শারাইল, ইবন-শিহাব-আল-জহুরী, প্রভৃতি। হাসান বসরী বসরায় এতদসংক্রান্ত একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[২৩৯] তারা কঠিন সাধনা করতেন এবং পড়ালেখা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ যখন হাদিস বর্ণনা করতেন তখন কাপতেন, তার কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরত, কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে বলে যেতেন। যাতে যেন কোনো ভুল বলা না হয়ে যায়। এ সম্পর্কে সাবধান থাকতেন।[২৪০] উমাইয়া খলিফাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ধর্ম ছিল, সেকালে শিক্ষার নৈতিক আদর্শ ছিল সাহস, সমস্যা সংকুল সময়ে ধৈর্য, অধিকার সচেতনতা এবং প্রতিবেশীদের প্রতি দায়বদ্ধতা, মনুষ্যত্ব, সহৃদয়তা, সহানুভূতি, মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রতিশ্রুতি পালনে ক্ষমতা"[২৪১] এইসব গুণাবলি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তারা এই শিক্ষা দিতেন তাদের সকলকে আলোকিত মানুষে পরিণত করার লক্ষ্যে, তাদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের বীজ বপনের ফলে আমরা এত সুফল ভোগ করতে পারছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আজ ইসলামী শিক্ষাকে সবাই অবজ্ঞা করে ফলে সমাজে অশান্তি নেমে আসছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যত উন্নত হউক না কেন আসল জ্ঞানী হচ্ছে না। সুতরাং সকল শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা একান্ত অপরিসহার্য। আমরা যদি বিজ্ঞানের দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখব সেখানেও বিজ্ঞান শিক্ষার সাথে সাথে উমাইয়া শাসকগণ তথা পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে ওতপ্রোতভাবে বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। ইসলামী শিক্ষার ফলে তারা আজও বিশ্বের বুকে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তারা যত কিছু আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে তারা ইসলামী জ্ঞানকে প্রয়োগ করতেন। অনেকে মনে করেন আরবদের চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রীক ও পারসীয়দের অনুকরণ।

---

[২৩৪]. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ-২৬৯-২৭০।

[২৩৫]. Uyun al-Akbar and Bayan wat Tabyin by Jahiz ed. Samduli, Vol-11. p-134.

[২৩৬]. History of Muslim আফরোজ বেগম, প্রকাশনী লেখাপড়া, প্রকাশকাল-প্রথম জুলাই, ২০০৪ পুন-জুন-২০০৫, পৃ-৩৩৩।

[২৩৭]. প্রাগুপ্ত.

[২৩৮]. ইসলামের ইতিহাস, কে. আলী, আলী পাবলিকেশনস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৮০, উমাইয়া যুগ ২য় খণ্ড, পৃ-৩৯৯।

[২৩৯]. History of Muslim আফরোজা বেগম, প্রকাশনী লেখাপড়া, প্রকাশকাল-প্রথম জুলাই, ২০০৪ পুন-জুন-২০০৫, পৃ-৩৩৩।

[২৪০]. আরব জাতির ইতিহাস ফিলিপ কে হিট্টি, প্রকাশক: মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা; প্রকাশকাল: বইমেলা ,১৯৯৯; পৃ-২৭৪।

[২৪১] প্রাগুপ্ত. পৃ-২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

আরবদের মতে, বিজ্ঞান ও ধর্ম এ দুটি বিষয়ে বিভক্ত। তায়েফের আল হারিস ইবন কালাদা (মৃত্যু ৬৩৪) চিকিৎসা শাস্ত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। খলিফা মুয়াবিয়ার রাজ চিকিৎসক ছিলেন ইবন উথাল, মারওয়ানের গৃহ চিকিৎসক ছিলেন মাসার গ্রাওয়া। তিনি গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন, খলিফা ইয়াজিদের পুত্র খলিদ (মৃত্যু ৭০৪) গ্রীক ও কপটিক ভাষায় রচিত চিকিৎসা এবং জ্যোতি বিজ্ঞান বিষয়ক পতিয় গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। ইমাম সাদিক রসায়ন ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২৪২] ইসলামী আমলের প্রথম শতকে বেশ কিছু আরব চিকিৎসক পারস্যে পড়াশোনা করতে যান। এদের নেতৃত্বে ছিলেন আল-হারিস ইবন কালাদাহ্ (মৃ. ৬৩৪)। তিনি থাকতেন আল-তাঈফে।[২৪৩] হারিসই ছিলেন প্রথম বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রশিক্ষণ পাওয়া একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। রোগ উপশমের ওষধ আবিষ্কারের ক্ষমতায় তার পরেই তাঁর পুত্র আল-নাজর সফর হন।[২৪৪] তারা যখন কোন কিছু আবিস্কার করতে যেতেন তখন প্রথমে তারা ইসলামী শিক্ষার ধারণা গ্রহণ করতেন। সেই সময় কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত যে সব মানুষ সমাজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ছিলেন। তাদের জন্য পৃথক চিকিৎসালয় স্থাপন করার কৃতিত্ব কিন্তু খলিফা আল ওয়ালিদের।[২৪৫] দ্বিতীয় উমর গ্রিক ঐতিহ্যবাহী আলেকজান্দ্রিয়ার চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো তুলে এনেছিলেন এন্টিয়োক এবং হাররানে।[২৪৬] পি.কে হিট্টি বলেন "উমাইয়া যুগের আরবী ইতিহাস লিখা হাদিসকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।" মহানবী (সাঃ) এবং তার সাহাবীদের জীবনযাপন ও কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল উমাইয়া যুগের ইতিহাস চর্চা। যাকে "সিরাহ' বলা হতো। "এ যুগের প্রধান ঐতিহাসিক ছিলেন উবাইদ ও ওহাব ইবনে মুনাব্বি। উবাইদ খলিফা মুয়াবিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি কিতাব আল-মূলক ওয়া আখবার আল –মাদিনা নামক শাসকগণ ও প্রাচীণ ইতিহাসের এক গ্রন্থ রচনা করেন।"[২৪৭]

উমাইয়া খলিফাগণ কাব্য তথা সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের কেউ কেউ স্বয়ং কবি ছিলেন। হাম্মাদ উর রাবিয়াহ্ খলিফা ২য় ওয়ালিদের দরবারের সভাকবি ছিলেন। এ যুগের অপর সভাকবি ছিলেন আল ফারাজদাক। তারা কাব্য রচনার মাঝেও ইসলামী চেতনার উদ্বুদ্ধ হতেন। স্থাপত্যবিদ্যায় উমাইয়া যুগ ছিল এক নবযুগের সূচনাকারী। এই সময় তারা বিভিন্ন মসজিদ নির্মাণ করেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো কুররাতুর সাখ্‌রা, আকসা মসজিদ, উমাইয়া মসজিদ, প্রভৃতি। সে সমস্ত মসজিদ বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সেখানে ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা হতো।

Abbasids time (750-1258):

"ABBASIDS, The dynasty of the calipis from 132/750 to 656/1258. The dynasty takes its name from its ancestor, al-Abbas b. Abd al-Muttalib, b. Hashim, the Uncle of the Prophet."[248]

শিক্ষা ব্যবস্থায় আব্বাসীয়দের ভূমিকা চিরস্বরণীয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শাসকের অবদানের কথা আলোচনা করা হলো:

আবুল আব্বাস আস্‌সাফ্‌ফাহ (৭৫০-৭৫৪) ঃ

'ইসলামের রাজনৈতিক নাটকের তৃতীয় পর্বের সূচনায় প্রধান ভূমিকা নিলেন খলিফা আবু আল-আব্বাস (৭৪০-৭৫৪ খ্রিঃ)। এই নাটকের রঙ্গমঞ্চ ছিল আল-ইরাক। আল-কূফার মসজিদে প্রতি বছর প্রথম আব্বাসীয় খলিফা যে উদ্বোধনী খুত্‌বাহ দিতেন, তাতে নিজেকে তিনি "আল-সাফ্‌ফাহ বলে অভিহিত করতেন।[২৪৯] তিনি মুয়াবিয়া শাসনব্যবস্থা হটিয়ে আব্বাসীয় শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করেন।

আল-মনসুর (৭৫৪-৭৫৫) ঃ

আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাসের মৃত্যুর পর ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আবু জাফর আল মনসুর আব্বাসীয় খিলাফতে বসেন। আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবু জাফর আল-মনসুরের কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে

---

[২৪২] . History of Muslim আফরোজ বেগম, প্রকাশনী লেখাপড়া, প্রকাশকাল–প্রথম জুলাই, ২০০৪ পুন–জুন–২০০৫, পৃ–৩৩৪।
[২৪৩] . ইবন-আবি উসাইবিয়া, উয়ুন-আল- ানবা' ফি তাবাকাত আল আতিব্বা। সম্পাদনা–এ মুলোর, কায়রো–১৮৮২), ১ম খণ্ড, পৃ–১০৯, ইবন আল, ইবরি, পৃ–১৫৬।
[২৪৪] প্রাগুপ্ত, পৃ–১১৩।
[২৪৫] ইবনে আল ইবরি, পৃ–১৯৫, তাবারী ২য় খণ্ড, ১১৯৬ ।
[২৪৬] . ইবন-আবি উসাইবিয়া, উয়ুন-আল- ানবা' ফি তাবাকাত আল আতিব্বা। সম্পাদনা–এ মুলোর, কায়রো–১৮৮২), ১ম খণ্ড, পৃ–১১৬, ইবন আল, ইবরি, ।
[২৪৭] . History of Muslim আফরোজ বেগম, প্রকাশনী লেখাপড়া, প্রকাশকাল–প্রথম জুলাই, ২০০৪ পুন–জুন–২০০৫, পৃ–৩৩৩।
[২৪৮] The Encyclopedia of Islam (New Edition), Vol-1, Edition- 1960, p-15.
[২৪৯] তারাবী, ৩য় খন্ড, পৃ-৩০, ১, ২০, ইবনে আল আসীর, ৫ম খন্ড, পৃ-৩১৬।

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে। ৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২১ বছর তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে আল-মানসুর বাগদাদে নতুন রাজধানীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার আগ পর্যন্ত তিনি থাকতেন আল কুফা এবং আল হিরার মাঝামাঝি আল-হাশিমীয়া নামক স্থানে।[২৫০]

আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫) ঃ

খলিফা আল-মানসুরের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদি খিলফতের স্বর্ণযুগ ছিল তৃতীয় খলিফা আলমাহদীর আমল থেকে ৯ম শতাব্দীর পর্যন্ত। খলিফা ৭৭৫ থেকে ৭৮৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। আব্বাসীয় বংশের আল-মাহদী প্রথম খলিফা, যিনি বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ আরম্ভ করেন।[২৫১]

আল-হাদী (৭৮৫-৭৮৬) ঃ

আল-হাদী ১ বছর খলিফা ছিলেন। তিনিও সমাজের বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেন।

খলিফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯) ঃ

৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ২৫ বছর বয়সে হারুন-অর-রশীদ ভ্রাতা হাদীর মৃত্যুর পর বাগদাদের সিংহাসনে বসেন। তিনি ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর আব্বাসীয় সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি কতিপয় সফল অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালকে আব্বাসীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। তিনি তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়।

আল-আমীন (৮০৯-৮১৩) ঃ

খলিফা হারুন-অর-রশীদের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-আমীন পিতার মনোনয়ন প্রাপ্ত হন এবং ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় বসেন। ৮১৩ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। তিনি খলিফা আল মামুনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং তাঁর ক্ষতি সাধিত হয়।

আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩) ঃ

খলিফা আল আমীনের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা আল-মামুন ৮১৩ সালে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন ইসলাম তথা বিশ্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানরা ছিল শীর্ষস্থানীয়। সৈয়দ আমির আলী বলেন, মামুনের খিলাফত সন্দেহাতীতরূপে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় অধ্যায়। যথার্থই তার শাসনকে ইসলামের ইতিহাসে অগাস্টান 'যুগ বলা হয়। আল মামুন ৮৩০ সাল পর্যন্ত সুনামের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি আব্বাসীয় আমলের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আজও স্বীকৃত আছেন।

পরবর্তী শাসকগণ (৮৩৩-১২৫০) ঃ

খলিফা মামুনের পর খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর ৮৪২ থেকে ৮৪৭ পর্যন্ত খলিফা ওয়াসিক ক্ষমতায় থাকেন। ৮৪৭ থেকে ৮৬১ সাল পর্যন্ত আল মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতায় থাকেন। বুয়াইয়া বংশ ৯৪৪-১০৬৫ পর্যন্ত, সেলজুক বংশ ১০৫৫ থেকে ১১৯৪ পর্যন্ত ও আয়ুবী বংশ ১১৭৪ থেকে ১২৫০ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। তারা সকলেই দক্ষতার সাথে শাসনভার পরিচালনা করেন।

আব্বাসীয় আমলে শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

ড্রেপারের ভাষায় "ইউরোপীয়রা তখন বর্বর, বন্য অবস্থা ছাড়িয়ে উঠেনি বললেই হয়। তাদের দেহ অপরিষ্কার, হৃদয় তিমিরাচ্ছন্ন ছিল।[২৫২] ঠিক সেই সময় উমাইয়া খলিফারা তাদের শিক্ষাব্যবস্থার বীজ বপন করেন এবং আব্বাসীয় যুগে এসে

---

[২৫০] ইয়াকুবী, বুলদান, পৃ-২৩৭।
[২৫১] আরব জাতির ইতিহাস, ফিলিপ কে, হিট্টি, প্রকাশনী মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রকাশকাল বইমেলা ১৯৯৯, পৃ-৩৩৭।
[২৫২] ড. এম আবদুল কাদির ও ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস, (ঢাকা জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭), পৃ-১০১।

Dhaka University Institutional Repository

এর পরিণতি লাভ করে। আব্বাসীয় যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষাব্যবস্থার স্বর্ণযুগ। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আব্বাসীয় যুগটি স্বর্ণযুগে পরিণত হয়েছিল। তৃতীয় শতকে হাদিস সমৃদ্ধ শহর" মক্কা, মদিনা, রাকা, বসরা ও সিরিয়ায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যাপীঠ বলে পরিচিতি ছিল।"[২৫৩] ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে আব্বাসীয় যুগ এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে বিশ্বের বুকে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আল্লাহপাক বলেন,– "পড়, তোমার প্রভুর নাম যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[২৫৪] আব্বাসীয় যুগে শিক্ষার যে উন্নতি ঘটে ছিল তার মূলে ছিল আল্লাহ্‌পাকের দেয়া বাণী। এই বাণীর আলোকে তারা চিন্তা, গবেষণা শুরু করে। ফলে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। "মুসলিম সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল আরবে। ইসলাম আরবদের মধ্যে যে উন্নত মানসিকতার সৃষ্টি করে মূলত তা ছিল ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ফল। আর ইসলাম ধর্মের গোড়ার কথা ছিল শিক্ষা।"[২৫৫] ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রতিপালককে জানার মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি, ইসলামের দৃষ্টিতে যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকে চিনেছে। নিজেকে উপলব্ধি করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নির্ণয় ইসলামে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।"[২৫৬] আব্বাসীয় যুগে মসজিদকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিল। ঐতিহাসেক খোদা বখ্‌স বলেছেন, খ্রিষ্টানদের গির্জা যেমন শিক্ষা দান করে মুসলমানদের মসজিদ তেমন নয়, মসজিদ শুধু ধর্মীয় উপাসনারই স্থান নয় জ্ঞান বিজ্ঞানেরও কেন্দ্র।"[২৫৭] সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আব্বাসীয় যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছিল। উমাইয়া যুগের যেখানে শেষ আব্বাসীয় যুগের সেখানে শুরু। বস্তুত উমাইয়া যুগে বসরা কুফা যেখানে শেষ; আব্বাসীয় আমলে সেখান হতে যাত্রা শুরু।[২৫৮] আব্বাসীয় আমলে যখন সর্ব স্বীকৃত নীতি স্কুল (হানাফী, শাফী, মালেকী, হাম্বলী) প্রতিষ্ঠা হয় তখন মৌখিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে লিখিত বিষয়ে শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করে।"[২৫৯] আব্বাসীয় আমলে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা দুইভাগে ভাগ করা যায়।

(১) প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা
(২) উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তব বা কুত্তাব। মসজিদের সামনে মক্তব তৈরি করে সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হতো। "এখানে আরবি ভাষা, কুরআন পাঠ, ইসলামী শ্রুতি বা স্মৃতিশাস্ত্র, দৈনন্দিন ধর্মীয় ব্যবহারিক বিষয়ে মৌলিক পাঠদান করা হত। একই সাথে আরবী হস্তলিপি হিসাব বিজ্ঞানে প্রাথমিক পাঠ ও কবিতা শেখানো হত। প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করা হতো। মেয়েদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ দানে উৎসাহিত করা হত।"[২৬০] লেখা পড়ার পাশপাশি পর্যায়ে ব্যাকরণ, ধর্মপ্রচারকদের জীবন কাহিনী, বিশেষত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সম্পর্কে হাদিসের কাহিনী, পাটি গণিত ও কবিতা শেখানো হতো।[২৬১]

উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা ঃ

ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তারা চিত্রকর্ম, বিজ্ঞান অথবা হস্তলিখন বিদ্যা অর্জন করত। আব্বাসীয় আমলে বাগদাদ, বসরা, কুফা, কর্ডোভা, কায়রো প্রভৃতি স্থান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। "এখানে অধ্যাপক নিয়োগ দেওয়া হত।" শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষকরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ধর্ম বিপদাপন্ন হলেই শুধু সরকার হস্তক্ষেপ করত।"[২৬২] এখানে ধর্ম-দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করা হত। আব্বাসীয় সোনালি যুগে ধর্মজ্ঞান বিকাশে আর একটি বড় অবদান হলো মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্রের উদ্ভব। আব্বাসীয় আমলে পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন ধর্মীয়, সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যাবলির সমাধানের প্রচণ্ড তাগিদে তাদের ধর্ম জ্ঞানের আর একটি

---

[২৫৩] হাদিস সংকলনের ইতিহাস, মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, বাংলা একাডেমী: বর্ধমান হাউজ, ঢাকা, প্রকাশকাল- নভেম্বর, ১৯৭০, পৃ-৪৬৭।
[২৫৪] সূরা আলাক, আয়াত নং ১, ২।
[২৫৫] ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ-২৬৯।
[২৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ-২৭০।
[২৫৭] Khuda Bakhsh, Contributions to the History of Islamic Civilization, Vol. 11, p-268.
[২৫৮] P.K. Hitti, History of the Arabs, London 1951, P-245.
[২৫৯] Mohd Abdul Muid Khin, The Muslim Theories of Education During the Middle ages, The Journl of Islamic Culture, Oct, 1994, p-421.
[২৬০] P.K. Hitti, History of the Arabs, London 1951, P-281.
[২৬১] আরব জাতির ইতিহাস, ফিলিপ কে হিট্টি, প্রকাশক, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা: প্রকাশকাল, বই মেলা ১৯৯৯, পৃ-৪৬১।
[২৬২] Khuda Bakhsh, Contributions to the History of Islamic Civilization, Vol. 11, p-281.

Dhaka University Institutional Repository

নতুন স্বতন্ত্র, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা আইন বিদ্যার উদ্ভব হয়।[২৬৩] চারটি মাযহাব বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দামাস্কাসে ৩৩টি হানাফী, ৩১টি শাফী, ৯টি হাম্বলী, ১টি মালেকী মাদ্রাসা আর ৬টি শাফীও হানাফী উভয় মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।"[২৬৪] এখানে চিকিৎসাশাস্ত্র, হাদিস, কুরআন, জীবনী, গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা শিক্ষা প্রদান করা হত। মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল আল-হিকমা। খলিফা আল-মামুন ৮৩০ সালে বাগদাদে এটা প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়াও তিনি নিজামিয়া মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নৈতিক চেতনার সঙ্গে শিক্ষার একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন।"[২৬৫] মুসলিম মনীষীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন- রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, সমুদ্রবিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, স্থাপত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষি বিজ্ঞান, দর্শন, আইনশাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখেন।

ধর্মতত্ত্ব ঃ

আব্বাসীয় আরব, অনারব, মুসলমান মনীষীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনায় ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, অংক, রসায়ন, পদার্থ, উদ্ভিদ, স্থাপত্য, ভাষা ও কাব্যে যে অবদান রেখেছিলেন, তা গোটা পৃথিবীকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। ধর্মতত্ত্ব বিস্তারে মুসলমানেরা সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহ প্রদর্শন করেন। মহাগ্রন্থ আল কোরআন যেহেতু মুসলিম জীবনাদর্শের মূল উৎস, তাই আব্বাসীয় উলামায়ে কেরাম কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত, তাফসীর ও গবেষণায় নিজেদের শ্রম, অর্থ ও সময় অকাতরে বিলিয়ে দেন। একদিকে কুরআন মজিদকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের তাগিতে যেমন একদল হাফিজে কুরআন সৃষ্টি হয়, অপরদিকে কুরআনকে বুঝার জন্য বড় বড় ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অনুবাদ ও তাফসীরের কাজটিও সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। তাফসীরকারকদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন বাকী ইবন মাখলাদ (মৃ. ২৭৬)। ইবন মাখলাদই সর্বপ্রথম তাফসীর গ্রন্থ রচনা করে।[২৬৬] তাফসীরের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ও মধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের রেওয়াজও প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রে আবু আমর উসমান ইবন সাঈদ আল-দানী ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ক্বারী। তিনি হিজরী ৩৭১ সালে কর্ডোভা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশরে গমন করে তথাকার পণ্ডিতদের কাছে কিরাত শাস্ত্রের উপর প্রচুর অধ্যয়ন করেন। কুরআনের ওপর বহু গবেষণামূলক গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। তন্মধ্যে তার রচিত কিতাব আল তায়সীর কুরআনের সপ্ত পাঠরীতি সম্পর্কে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই মহান ক্বারী হিজরী ৪৪৪ সালে দানিয়াতে পরলোকগমন করেন।[২৬৭] মুসলিম মুনীষীগণ হাদিস শাস্ত্রের অধ্যয়ন, গবেষণা ও গ্রন্থ প্রণয়নে গভীর সাধনার স্বাক্ষর রেখেছেন। হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে হাদিসচর্চা ব্যাপক আকার ধারণ করে।[২৬৮]

গ্রন্থাগার ঃ

আব্বাসীয় আমলেই গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল, বইয়ের দোকান আব্বাসীয় আমলেই ব্যবসায়িক ও শিক্ষাগত সংস্থা হিসেবে প্রথম বইয়ের দোকান চালু হয়।[২৬৯] খলিফা মামুনের সময় বাইতুল হিকমা গড়ে তোলেন। এর তিনটি শাখা ছিল, এক গবেষণাগার, দুই; লাইব্রেরী, তিন, অনুবাদ শাখা। আব্বাসীয় আমলেই অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে ইসলামী শিক্ষা যে অবদান রেখেছিল তার বড় অবদান ছিল বাইতুল হিকমার।

মোগল আমলে ইসলামী শিক্ষা ঃ
ভারতীয় উপমহাদেশ

অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু রাজা দাহিরের পরাজয় ও মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ এলাকায় তাদের সঙ্গে আসে এক নতুন শিল্প, সংস্কৃতি, নতুন সভ্যতা লিপি ও ধর্ম। তাদের নিয়ে আসা শিক্ষা ও সংস্কৃতিই মূলত আরবীয় সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্য।[২৭০]

---

[২৬৩] মুসা আনসারী, মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ-৩৪৩।

[২৬৪] Encyclopedia of Islam. Masjid, p-381.

[২৬৫] আরব জাতির ইতিহাস, ফিলিপ কে হিট্টি, প্রকাশক, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা; প্রকাশকাল, বই মেলা ১৯৯৯, পৃ-৪৬৪।

[২৬৬] আল-হাফিয আবু আল-ওয়ালীদ ইবনে আল ফারদী, তারিখ আল-উলামা ওয়া আল রুওয়াহ লি আল-ইলম বি আল-আন্দালুস (আল-সায়্যিদ ইযযাত আল আত্তার, (১৯৫৪), ১ম খন্ড, পৃ-১০৭।

[২৬৭] ইবন উমায়রাহ আল-দাব্বী, বুগইয়াহ আল মুলতামিস ফী তারীখ রিজাল আহ্‌ল আল-আন্দালুস (মাতাবি সিজল আল-আরব, ১৯৬৭ খৃঃ), পৃ-৩৯৯।

[২৬৮] আবু আব্দ আল্লাহ মুহাম্মদ আল-হুমায়দী, জাযওয়াহ আল-মুকতাবিস, সম্পাদনা ড. মাহমুদ মক্কী (বৈরুত), পৃ-২৬৪।

[২৬৯] আরব জাতির ইতিহাস, ফিলিপ কে হিট্টি, প্রকাশক, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা; প্রকাশকাল, বই মেলা ১৯৯৯, পৃ-৪৬৬।

[২৭০] শেখ মোহাম্মদ ইকরাম, পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (পাকিস্তান পাবলিকেশন-১৯৬৬) পৃষ্ঠা-৩০০।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস স্বাক্ষী মুসলমানদের আগমনের পরপরই ভারতবর্ষে সভ্যতার নতুন দিগন্ত শুরু হয়। শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ধর্মীয় প্রয়োজনেই মূলত এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলো। মসজিদ মক্তব কে কেন্দ্র করে এ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ইসলামে ধর্ম ও শিক্ষা একটি অন্যটির পরিপূরক। ফলে শাসকরা প্রজাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার দায়িত্বও বহন করেন। প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলে যেমনি মসজিদ গড়ে উঠে। তারই সাথে সে সকল স্থানে মসজিদ কেন্দ্রিক বিদ্যা শিক্ষা কেন্দ্রও গড়ে উঠে।[২৭১]

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে তারা বিদ্যা শিক্ষাকেন্দ্র গ্রন্থাগার স্থাপন এবং এগুলো তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে তাঁদের সীমাহীন উৎসাহ ছিল। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গরিব ইয়াতীম ও অনার্থদের সাহায্য করার জন্য এবং তাদের বিনা বেতনে পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়ে ছিলো। বৃত্তি ও উপবৃত্তি ইত্যাদি দ্বারাও উৎসাহী করার ব্যবস্থা ছিল। ধনী ও গরিব পরিবারের মধ্যে কেনো পার্থক্য নির্ণয়ের সুযোগ ছিল না। শিক্ষাদান করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করা হতো।[২৭২] কয়েক শতাব্দীকালের এ দীর্ঘ শাসনামলে এ দেশে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা। মুসলমানরা এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী বিপ্লব সাধন করেন।[২৭৩]

গজনীর সুলতান মাহমুদ (১০০০-১০২৬ খ্রি.) তার আমলে গজনীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করে।[২৭৪]

সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৩ খ্রি.) এ উপমহাদেশের ইসলামী শিক্ষার বুনিয়াদ রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনিই ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের জন্য আজমীরে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[২৭৫] সুলতান ইলতুতমিশ (১২১১-৩৬) ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দরবারে তৎকালীন সময়ে উচ্চতর ডিগ্রধারী পঁয়তাল্লিশ পন্ডিত ছিলেন, যাঁদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন।[২৭৬]

তুঘলক বংশের শাসনামলে ও মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নতি লাভ করে। এ বংশের প্রথম সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫ (খ্রি.) ছিলেন একজন মহান শিক্ষানুরাগী। তিনিই সামরিক ও বেসামরিক কর্মকান্ডে এবং প্রশাসনিক কর্মকান্ডে কুরআন ও প্রচলিত বিধির সমন্বয় করে আইন বিধি প্রণয়ন করেন। এ বংশের অপর দুজন সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১) এবং সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খৃ.) ধর্মীয় শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ইতিহাস, আইন ও দর্শন শাস্ত্র বিভিন্ন রচনাবলি প্রণীত হয়েছিল। সর্বোপরি ধর্ম ও নৈতিকশিক্ষা প্রসারে তাদের অবদান অপরিসীম।[২৭৭] ভারতবর্ষে মোগল আমলের বহু পূর্বেই এ মহাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ঘটে। তবে গজনীর শাসনকর্তা সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী (মৃ-১২০৬ খ্রি.), ও তার দুই সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবেক (মৃ-১২০৮/১২১০) এবং ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী (মৃ-১০১৬) এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়।[২৭৮] মোগল সম্রাটের সবাই বিদ্যার সমাদর করতেন। মোগল শাসন আমলে আরব দেশের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হয়েছিল।[২৭৯] ফলে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন, হাদিস চর্চা এবং ফিক্‌হ বিদ্যার ক্ষেত্রে এখনকার মুসলমানগণ তুলনামুলকভাবে অনেক বেশি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[২৮০] এভাবে মোঘল আমলে সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটে। ইংরেজরা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে গেছে তাতে এ উপমহাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি সুতরাং এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে সার্বিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো সম্ভব। ভারতবর্ষে মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০)। মধ্যযুগের অন্যতম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যানুরাগীদের কদর

---

[২৭১] জোৎস্না বিকাশ চৌধুরী, শিক্ষার ইতিহাস, (ঢাকা-১৯৯৪) পৃঃ ৭৫-৭৮।
[২৭২] প্রাগুক্ত, (ঢাকা-১৯৯১) পৃঃ ২৭-৩৭।
[২৭৩] আব্দুল শহীদ নাসিম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি (শতাব্দী প্রকাশন ঢাকা) পৃষ্ঠা-১২৯।
[২৭৪] ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (গবেষণা বিভাগ) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃঃ ৭০।
[২৭৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০।
[২৭৬] অধ্যাপক কে আলী, পাক ভারতের ইতিহাস, (ঢাকা-১৯৯৪) পৃঃ ২৭৮।
[২৭৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৮।
[২৭৮] ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, আব্দুল করিম, বাংলা একাডেমী, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ-২৫-৩৪।
[২৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬৩-৩৬৮।
[২৮০] তারিখে ফিরোজ শাহী, গিয়াসউদ্দীন বারনী, কলকাতা, সং-১৮৬২, পৃ-৩৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন।[২৮১] সম্রাট বাবরের সময় সোলায়মান ইবন আরাকান মানদুভী নামে একজন ইসলামী পণ্ডিত ছিলেন।[২৮২] তার কাছ থেকে বহু লোক ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬) সিংহাসনে বসেন। তার শাসনামলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। বিশেষত ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মান উন্নত হয়। এই সময় যে পণ্ডিতগণ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গহী, মীর সৈয়দ মুহাম্মদ মাক্কী, কাজী কাযন ভূকারী ও শায়খা আব্দুল মালিক গযনভী প্রমুখ। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) সাম্রাজ্য পরিচালনার সাথে সাথে রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই যোগ্যতা ও সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৮৩] তিনি এত উন্নয়ন করতে পেরেছিলেন তার নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র সেলিম নুরুদ্দীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। শিক্ষিত উদারপন্থী ও রাষ্ট্রনীতিতে জাহাঙ্গীর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সাথে রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি অন্যান্য শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৬৫৮ খ্রিষ্টব্দে মৃত্যুবরণ করেন। অত্যন্ত যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে তিনি সাম্রাজ্য শাসন করেন। তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন[২৮৪] তার সময়ে ইলমে তাজবীদের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। পার্থিব সকল শিক্ষার সাথে তিনি ইসলামী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭) সবসময় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে থাকতেন। তার পরও তিনি শিক্ষার প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করতেন। সম্রাট আলমগীরের সময়ে শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষত ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেছিল তার নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে লিখিত ফাত্ওয়াযে আলমগীরী তার উজ্জল সাক্ষর বহন করে চলছে। এ সময়ে দু'জন জগদ্বিখ্যাত কারীর নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি। একজন হচ্ছেন হাফিজ কারী ইব্রাহিম (রঃ)। সম্রাট আলমগীর স্বয়ং ক্বারী ইব্রাহিমের ছাত্র ছিলেন।[২৮৫] তিনি তাজবীদে নিয়মিত পাঠদানের মাধ্যমে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।[২৮৬] উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে যে শিক্ষার উন্নয়ন ঘটেছিল তার মূলে ছিল ইসলামী শিক্ষার অবদান। ইসলামী শিক্ষাকে তারা মৌলিক শিক্ষা ধরে নিয়ে শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজ করেছিল। একজন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, গণিতবিদ প্রথমে আরবি শিক্ষা গ্রহণ করত। আরবি শিক্ষার প্রতি তারা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে যে বিশ্ব বিখ্যাত হয়েছিলেন তার মূলে ছিল নৈতিক জ্ঞান। সেই সময় বিভিন্ন মসজিদে মক্তবে বা উন্মুক্ত মাঠে তারা শিক্ষারব্যবস্থা করতেন। একজন আলিম সবার সম্মুখে ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। হাজার হাজার লোক এখানে এসে জ্ঞান আহরণ করতেন। তারা বিজ্ঞানের বা অন্যান্য কোনো বিষয় গবেষণা করার আগে কুরআন ও সুন্নাহ এর জ্ঞান আহরণ করতেন পরে তারা তাদের সেই মূল বিষয়ের দিকে ধাবিত হতেন। ফলে তাদের এই যুগ স্বর্ণযুগে পরিণত হয়েছিল।

জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তাঁরা অবদান রাখেননি। তারা কুরআন, হাদিস, ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গবেষণা করেছেন। আব্বাসীয় আমলের পরে মুসলমানরা তাদের নৈতিক তথা ইসলামী জ্ঞান থেকে বহু দূরে সরে গেছে ফলে আজ তারা সমাজে অবহেলিত অপমানিত হচ্ছে। একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার অনেক বড় শিক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান তাদের মধ্যে না থাকার কারণে আজ সকলে দূর্নীতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। যদি একজন বৈজ্ঞানিক, একজন ডাক্তার, একজন বড় অফিসার দূর্নীতি করতে না পারত তবে এত সমস্যা হতো না। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে। তাদের মধ্যে যদি সেই নৈতিক জ্ঞান শক্তিশালী হতো তাহলে তারা এক থাকত এবং বিশ্বের কেউ তাদের সন্ত্রাসী বলতে সুযোগ পেত না। আজ যদি আমরা আমাদরে ছেলে মেয়েদের ইসলামী জ্ঞান প্রদান করতে পারতাম তাহলে সে যত বড়ই হউক না কেন? বা বড় শিক্ষিত হউক না কেন? সে তার জীবনকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেত না। বিশ্বের যুব সমাজকে ইসলামী জ্ঞান প্রদান করতে পারলে আমরা ভবিষ্যৎ জাতিকে আবার ওই যুগের ধারায় নিয়ে যেতে পারব। আমরা আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে যদি ইসলামী জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারি তাহলে আমাদের বাস্তব জীবন স্বর্ণমুখর হয়ে উঠবে। আমাদের সমাজ থেকে দুর্নীতি, রাহাজানি, দলাদলি কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব থাকবে না। শান্তি র সুবাতাস আনতে হলে সকল শিক্ষাব্যবস্থার সাথে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

---

[২৮১] ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, আব্দুল করিম, বাংলা একাডেমী, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ-১৫৮-১৬৮।

[২৮২] আখবারুল আখইয়ার, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, দিল্লী, মুহাম্মদী প্রেস, ১২৮৩ খৃ, পৃ-২১২।

[২৮৩] ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, আব্দুল করিম, বাংলা একাডেমী, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ-১৯০, ২১৭, ২১৯, ২২৭-২৫৩।

[২৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ-২৫৬, ২৯৯, ৩০০।

[২৮৫] আরবী যবান ও আদব আহদে মোগলিয়া মে. ড. শিববীর আহমদ, কাদিরাবাদী, লক্ষী ছাপাখানা, দিল্লী, ১৯৮২, পৃ-২২১।

[২৮৬] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম ও নৈতিকতাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার অন্যতম প্রধান ইস্যু হলো শিক্ষা। আমেরিকা ও পশ্চিমাদের চ্যালেঞ্জ, সেটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক যাই হোক-এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা দরকার। সভ্যতার দ্বন্দ্বে ইসলাম জয়ী হবে-নামে হোক বেনামে হোক যদি আমাদের একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভালো শিক্ষিত জনশক্তি (পুরুষ ও নারী) থাকে। কিংবা যদি আমরা তা গড়তে পারি, তবেই তা সম্ভবপর হবে বলে আমি মনে করি[২৮৭]

শিক্ষিত জনশক্তি তৈরির জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিকতার সংমিশ্রণ ঘটতে হবে। তবেই আশা করা যায় নৈতিকতা সম্পন্ন দক্ষ ও যোগ্য আলোকিত মানুষ তৈরি হবে। আর সে জন্য শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার উপাদান থাকতে হবে। উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক গুণাবলি অর্জন করা। দুর্ভাগ্যবশত তা হচ্ছে না। আমাদের জাতীয় নৈতিক অবক্ষয়ের এটিও একটি কারণ।[২৮৮] সমাজে আজকের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে হলে মানবসমাজের দীর্ঘদিনের লালিত সৎ গুণাবলি সমূহের বিকাশ ঘটানো জরুরি। এ কারণেই নৈতিকতা হচ্ছে Customs of a people, the social glue that defines how individuals should live together.[289] Islam is that God is one and he is the supreme Lord of all creation. He has no off spiring because he has no consort. He has created the universe and Heavens to reveal Truth. Everything good and evil in this world exists by its will.[290]

আল্লাহর বিধি নিষেধ পালনে মুসলমানকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়। ইসলাম নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হওয়াই নৈতিকতার অন্যতম মানদন্ড। The concept of morality in Islam centres around certain basic beliefs and principles. Among those are the following: (1) God is the creator and source of all goodness, truth and beauty (2) Man is a responsible dignified, and honorable agent of his creator.[291] আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস নৈতিকতাকে মজবুত অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়। The range of morality in Islam is so inclusive and inteqrative that it combines at ones faith in God, religious rites, spritual observances social conduct, decision making, intellectual pursuits, habits of consumptions, manners of speech and all other aspects of human life.[292] ইসলামের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করা যায় না। চিন্তা, বাক্য ও কার্যের মধ্যে সঙ্গতি বিধানই নৈতিক জীবনের লক্ষ্য। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি কিংবা কৃচ্ছতা সাধন নয়-আর্থ সম্পন্ন ও অর্থপলব্ধি কর্মময় জীবন যাপনের মাধ্যমে নিজের ও বিশ্বের কল্যাণ সাধনই ইসলামী নৈতিক জীবন ব্যবস্থার আসল লক্ষ্য।[২৯৩]

বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে ইসলাম প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাই একমাত্র দিতে পারে শান্তি। যে পরিকল্পনা ও নীতির অনুসরণ করিয়া ইসলাম একদা পাপাচারি মরু বেদুইনদের জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছিল এবং তাহাদিগকে বিশ্বের অন্যতম সভ্যতার ধারক ও বাহকে পরিণত করিয়া ছিল।[২৯৪] মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে নৈতিকতা ব্যাপক ও বিস্তৃত। সর্বক্ষেত্রেই নৈতিক উন্নতি মানুষকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করে। মানবিক গুণাবলি সমূহ বিকশিত হয়। This total concept of development can perhaps best be expressed as the "human ascent"- the ascent of all men in their integral humanity, including the economic, biological, psychological, social, cultural, ideological, spiritual, mystical and transcendental dimensions.[295] বর্তমান বিশ্বের ভয়াবহ

---

287 শাহ আব্দুল হান্নান, বিষয়চিন্তা ডিসেম্বর ২০০৪-পৃষ্ঠা-২০

288 দৈনিক প্রথম আলো-২৫শে মে শুক্রবার ২০০৬ (শিক্ষাঙ্গন পাতা মতামত আনোয়ারুল কবীর)

289 http://education.stateuniversity.com

290 Muhammad Kunju Salim, Islam Ethics and Teaching, Kitab Bhavan. New Delhi-II 0002-Page-9

291 Hammudan in Focus, Islam in Focus, Islamic Teaching center libery of conorren, catalog no-75-4382 Page-40

292 প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা-৪৩

293 অধ্যাপক রাশিদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া, প্রকাশ ১৯৬৯-পৃষ্ঠা-১৪

294 প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮

295 Mohammad, Ansari-The American journal of Islamic Social Science. The AMSS and IIIT, Volume-II-Fall-1994-Number-3

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাধি AIDS প্রতিরোধে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়। ৮ মার্চ ১৯৯৭ কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিতব্য A life worth living: Teenagers, The Family and Health শীর্ষক সেমিনারে সুপারিশমালায় বলা হয়েছে।

Parents and elders in the family be made aware of their responsibilities to teach, guide, and modify the behaviors of their young people whenever necessary to ensure the passing on of good moral values and ethics in society.
Both moral and religious education must be made available to all school children.[296]
চারিত্রিক দৃঢ়তা মানবিক মূল্যবোধ তৈরিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠদান অপরিহার্য। World Assembly of Muslim Youth (WAMY) এর সৌদি আরবের রিয়াদে ২৯/১০-১/-১১/২০০২ অনুষ্ঠিতব্য ৯ম আন্তর্জাতিক সেমিনারে বলা হয়–

1) To prepare students spiritually, morally socially and intellactually for their role as Muslims in the adult world which they are entering.
2) To give them an in into the broad view of Islam in both the past and the present.
3) To enable them practice all their religious duties properly.
4) To enable them further with their studies of Islam formally or otherwise.[297]

সমাজকর্মীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে শুধুমাত্র উন্নয়নের পুঁথিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করলে চলবে না। তাদের প্রয়োজন নৈতিকতার উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

When added to the knowledge and skills offered by traditional social science and clinical disciplines, such approaches, I believe can be extremely useful in preparing social workers to meet the daunting challenges presents by the AIDS epidemic. It is becoming Increasingly clear that helping professionals need not only appropriate knowledge and specific skills they also need qualities of moral excellence of what we used to call situations. Evoking the concrete and experiential, the arts often focus in a concentracted way on the moral dimensions and qualities of real situations and people.[298]

সমাজকর্মীদের নৈতিক উন্নয়ন ও পাঠদান যেমন জরুরি ঠিক তেমনি অন্য পেশার লোকদেরও নৈতিক শিক্ষা জরুরি।[২৯৯] স্কটিশ মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডাম উনিশ শতকের বিশের দশকে বাংলা ও বিহারের শিক্ষা পরিস্থিতি অনুসন্ধান পূর্বক ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে বিবরণ পেশ করেন তা সাধারণভাবে অ্যাডামস রিপোর্ট) হিসেবে পরিচিত। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ সাল এই দীর্ঘ তিন বছর ধরে গভীর মনোনিবেশ সহকারে গবেষণার জন্য তিনি সুদীর্ঘকাল যাবৎ সর্বমহলে প্রশংসীত হয়ে আসছেন।

অ্যাডাম শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন– যদি আমি এই শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করি। তাহলে একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে উঠবে যে, প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত বা বিদ্যালয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, যতক্ষণ না দেশীয়দের নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধের উন্নতি ঘটবে ততদিন পর্যন্ত জাতীয় উন্নতি সম্ভব হবে না। এই নৈতিক শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশ করানো সম্ভব হলে শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা দেশীয় জনগণ উপকৃত হবে।[৩০০]

---

296 A seminar on Teenagers, Family and Health was held in Kualalumpur on 8 March 1997. It was jointly organised by the Pan Pacific and South-East Asian Women's Association (PPSEAWA) and National Population and Family Development Board (NPFDB)

297 Proceedings of wamy's Ninth International Conference. Riyadh, Saudi Arabic Shaban-23-26/1423 H 29/10-1/11/2002

298 http://www.sccs.swarthmore.edu/users/00/pwillenl/it+/aids.htm 314/2007-page of 7.

299 মোঃ আব্দুল লাহ আল-মাসুম, অ্যাডামস্ রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮০৮) ও বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা-সংখ্যা ৮২ জুন-২০০৫-আষাঢ়-১৪১২, পৃষ্ঠা-১৩৫।

300 প্রাগুক্ত-১৫১

Dhaka University Institutional Repository

অ্যাডামস এর রিপোর্টে বলা হয়েছে- মুসলমানেরা শিক্ষাকে শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি, তাঁরা শিক্ষাকে নৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তার উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন।[৩০১] এছাড়া তিনি কোন রকম নীতিবিরুদ্ধ বা ধর্মহীন শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তার মতে, ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার সুষ্ঠু উপায় হলো কোনো ধর্মীয় বিতর্কে না গিয়ে অথবা ধর্মীয় সংস্কারের চেষ্টা না করে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা। অর্থাৎ কোন বিশেষ ধর্মে বদ্ধমূল না থেকে প্রত্যেক ধর্মের মানবাধিকার ও আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলো গ্রহণের মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়গুলোকে সে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রভাবিত করার ব্যবস্থা করা।[৩০২]

আমাদের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকার, এ-কথা বোধহয় অস্বীকার করা মুশকিল। তবে আমরা ভুলে যাই যে, ঔপনিবেশিক শক্তি সহজে এদেশে শিক্ষাদান করতে চায়নি। আঠারো শতকের শেষে যখন ভারতে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দের প্রশ্ন ওঠে, তখন ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টররা এই বলে আপত্তি জানিয়েছিলেন যে, লেখাপড়া শেখানোর ফলে আমেরিকার মতো কলোনি তাঁরা হারিয়েছেন, ভারতে আর তার পুনরাবৃত্তি করতে চান না। ১৮১৩ সালে কোম্পানি সর্বপ্রথম ভারতে শিক্ষাবিস্তারে অর্থব্যয়ের অনুমতি পায়। তার আগে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথাগত শিক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। এটাই ছিল এদেশে শিক্ষার মূল ধারা, তবে এর সঙ্গে পরিবর্তশীল জগতের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এ কথা উপলব্ধি করে অবস্থাসম্পন্ন বাঙালিরাই পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভের জন্যে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন ১৯১৭ সালে– এটাই এশিয়া মহাদেশে পাশ্চাত্য ধারার উচ্চশিক্ষার প্রথম কেন্দ্র। এর প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের যুবসম্প্রদায়ের পরিচয় করিয়ে দিতে। তখন পর্যন্ত উদ্যোগ ছিল বেসরকারি, কোম্পানির কাজ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তত্ত্বাবধান করা। তার পর মেকলের আবির্ভাব। তিনি সংস্কৃত বা আরবি জানতেন না, কিন্তু ভারতীয় ও আরবি ভাষায় লেখা সকল গ্রন্থকে ভালো ইউরোপীয় লাইব্রেরির এক শেলফ বইয়ের সমতুল্য বিবেচনা করেছিলেন। তাঁরই প্রণীত নীতিমালার অনুসরণে ফারসির বদলে ইংরেজি সরকারি ভাষা হয় এবং কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের জন্যে সরকারি অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হয়।

এই শিক্ষাপদ্ধতি একেবারে বাইরে থেকে আমদানি করে আমাদের জমিতে বসানো হলো। এর মহৎ গুণ, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এর যোগ। কিন্তু এর বড় দোষ, জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্রবহীনতা আর এর মাধ্যম বিদেশি ভাষা। বিদেশি ভাষা বাহন বলে এই ব্যবস্থায় জোর পড়ল মুখস্থ বিদ্যার ওপরে। আরো একটি কথা। এই শিক্ষার লক্ষ্য কী অর্থাৎ এই শিক্ষা নিয়ে একজন যে কী করবে, সেটাও সুস্পষ্ট হলো না। তবু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, এই বহুনিন্দিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা এমন সব মানুষ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, নানাক্ষেত্রে যাঁদের অবদান এ-দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে। উপনিবেশ-উত্তরকালে তেমন মানুষ কমই তৈরি হয়েছেন।[৩০৩] ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার একটা ত্রুটি জাতীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা। ঔপনিবেশিক কালের শেষেও এ কাজে আমরা উদ্‌যোগী হতে পারিনি। বৃথা ঐতিহ্যগর্ব ভালো নয়' কিন্তু নিজের প্রত্ন-সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব-সম্পদ সম্পর্কে জানতে হবে; জানতে হবে কোথায় আমাদের শক্তি, কোথায় আমাদের দুর্বলতা। আজো যখন স্কুলপাঠ্য বইয়ে শীতমণ্ডলীয় এলাকার মানুষের তুলনায় উষ্ণমণ্ডীয় এলাকার মানুষকে ছোট করতে দেখা যায় তখন বুঝতে পারি, উপনিবেশবাদের ভূত আমাদের ঘাড় থেকে নামেনি।[৩০৪]

আমাদের ঘরটা আজ বড়ই এলোমেলো বড়ই অশান্ত। এই অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় যে, কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছে, তা সংবাদপত্রসমূহ পড়লেই বোঝা যায়।[৩০৫]

We believe that education without religious teaching is devoid of morality and ethical values. It leads the whole nation to corruption and crimes. I hope you would excuse me if I say that any effort for getting rid of corruption or dending poverty to the museum through implementation of man made laws is hardly possible, unless we take shelter to the Law of Allah (SWT) and teaching of Islam. Our continuous effort is to combine morality with quality education to produce a new generation equipped with accademic excellence and moral height.[306] আমার প্রায়ই মনে হয়, যে মহান প্রভু সপ্তম শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞান সম্পর্কে এমনকি যখন পণ্ডিতদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ বিশেষ করে ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) সম্পর্কে বলতে গেলে তাঁরা কিছুই জানতেন না, তখন মাতৃ জরায়ুতে এঁটে থাকা নিষিক্ত ডিম্বকোষ 'আলাক' থেকে মানুষের জন্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি কি তাঁর রসূল (সাঃ)-এর কাছে

---

৩০১ প্রাগুক্ত, ৩

৩০২ প্রাগুক্ত ৩

৩০৩ সমাবর্তন-বক্তৃতা, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, দ্বিতীয় সমাবর্তন, ৫ডিসেম্বর ১৯৯৯, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পৃষ্ঠা নং-০১-০২

৩০৪ সমাবর্তন-বক্তৃতা, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, দ্বিতীয় সমাবর্তন, ৫ডিসেম্বর ১৯৯৯, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পৃষ্ঠা নং-০৫

৩০৫ সমাবর্তন-বক্তৃতা, ডঃ এম শমশের আলী, তৃতীয় সমাবর্তন, ২৮শে মার্চ, ২০০২, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পৃষ্ঠা নং-০১-০২

৩০৬ Speech from Trust Secretary, IUCT, , 3rd convocation, Islamic University Chattagong, 05 April, 2007 Page No.-16

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরিত ওই পঞ্চ আয়াতে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের একটা ইঙ্গিত দেননি? আয়াত পাঁচটি আমরা আবার যদি মনোযোগের সাথে পাঠ করি তাহলে কি আমাদের মনে হবে না যে, মহাজ্ঞানী মহান রাব্বুল আলামীন চাইছেন যে, আমরা নরনারী নির্বিশেষে সকলে জানি ঃ

(ক) তিনি আমাদের মহিমান্বিত প্রভু ও প্রতিপালক।
(খ) জাতি তাঁর মহান সৃষ্টিকে এবং সে সৃষ্টিতে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু (মানুষসহ) এর অবস্থিতি, পরিবেশ ও পরিণতি।
(গ) জাতি পড়তে, লিখতে এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং
(ঘ) জানি জানার মাধ্যমে অজানাকে।

তা-ই যদি হয়, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোনো তাঁকে আমরা দূরে রাখতে পারি না। তিনি থাকবেন আমাদের চিন্তা ও কর্মে সদা বর্তমান। আর সেসব কারণেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সুন্দর ও সুসামঞ্জস্য মিলন ঘটবে mind ও matter, দীন ও দুনিয়া, মানুষ ও তার পরিবেশ এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের। আমি তাই মনে করি অধুনালুপ্ত মাওলানা আবু নসর ওয়াহিদ প্রবর্তিত নিউস্কীম মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণী সিলেবাস আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তারই আদলে আমরা একটা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। ধর্মশিক্ষা ও ধর্মবহির্ভূত শিক্ষাকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করতে আমি প্রস্তুত নই। তবুও পরিসংখ্যানের প্রয়োজনে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র যে, কুদরাত-এ-খুদা কমিশন কর্তৃক পরিচালিত জরিপে ১৯৫১ জন উত্তরদাতা (প্রায় দুই তৃতীয়াংশ) মত প্রকাশ করেছিলেন যে ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। এই পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির ওপরে আমি সমধিক গুরুত্ব এজন্য আরোপ করছি যে এটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম সোপান এবং এই পর্যায় থেকে অধিকাংশ নাগরিক তাদের লেখাপড়া সমাপন করবেন। কাজেই এখানেই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় চেতনা ও দেশপ্রেমে, পরিচিত করতে হবে দেশের মাটি ও মানুষের সাথে, অনুপ্রাণিত করতে হবে সত্যাশ্রয়ী, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও স্বনির্ভর হতে, গড়ে তুলতে হবে তাদের ব্যক্তিত্ব, জাগ্রত করতে হবে তাদের ঐক্যবোধ, সমাজপ্রীতি ও পারস্পরিক মমত্ব, তীক্ষ্ণ করতে হবে তাদের চিন্তাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের দক্ষতা।[৩০৭]

আমাদের শিক্ষা কি আমাদেরকে দুর্নীতি রোধ করতে শেখাচ্ছে না? কেউ হয়তো বলতে পারেন 'দুর্নীতির সাথে শিক্ষার সংযোগটা কোথায়?' সংযোগটা যে কোথায়, তা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থার দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পূনর্গঠন করার কাজে আমরা পৃথিবীর সব জাতির কাছ থেকেই অভূতপূর্ব সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর সারা বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশকে যে ৭৫ হাজার কোটি টাকা সাহায্য প্রদান করেছিল, তা গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্শাল প্লানের আওতায় যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপকে পূর্ণগঠিত করার জন্য যে সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল, তার চাইতেও বেশি ছিল। এত টাকা-পয়সা পেয়েও আমরা দেশটাকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারলাম না কেন, এ প্রশ্ন অনেকেরই। এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আরেকটি প্রশ্ন করা দরকার। তা হলো 'কারা এই টাকাটা হ্যাণ্ডেল করেছিলেন?' এই টাকা তো দেশের শ্রমিকরা খরচ করেনি, কৃষকরা খরচ করেনি, জেলে, তাঁতী রা খরচ করেনি, কামার কুমোররা খরচ করেনি, মাঝি-মল্লারা খরচ করেনি। এই টাকা খরচ করেছিলেন আমরা তথাকথিত ডিগ্রিধারি শিক্ষিত লোকেরাই। আমাদের দেশপ্রেমের অভাবে, নৈতিকতার অভাবে, মূল্যবোধের অভাবে আমরা দেশ গড়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারলাম না। সবচেয়ে বড় কথা আমরা বিশ্ববাসীর আস্থা হারিয়ে ফেললাম। এই অবস্থারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় পরবর্তীকালের অনেক ঘটনাতেই। উদাহরণস্বরূপ- ইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিদেশি যেসব সরকার ও সংস্থা বাংলাদেশকে সাহায্য পাঠিয়েছে, তা তারা বাংলাদেশের সরকারকে না দিয়ে সে সাহায্য তাদের মনোনীত কতকগুলো এনজিওর মারফত জনগণের কাছে পৌছে দেওবার প্রয়াস পেয়েছে। সরকারের জন্য এর চাইতে বিব্রতকর আর কী হতে পারে? সরকারের প্রশাসনযন্ত্র যেসব শিক্ষিত লোকের দ্বারা পরিচালিত, তারা যে কতটুকু সৎ, সরকার তা ভালোভাবেই জানে। আর জানে বলেই মুখবুজে এই অপমান সহ্য করতে বাধ্য হয়। সরকারের মধ্যে যদি দুর্বলতা না থাকত, তাহলে সরকার 'মেরুদণ্ড সোজা করেই বলতে পারত যে, সাহায্যের ব্যবস্থাপনায় তোমরা আমাদেরকে বিশ্বাস করো না, সেই সাহায্যের আামাদের কোন প্রয়োজন নেই।" এই সব থেকে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সরকারে মধ্যে যেসব কর্মচারী জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তারা যদি নৈতিকতা বিবর্জিত হন, তাহলে সরকারের পক্ষে শক্ত হাতে বিদেশিদের মোকাবেলা কঠিন হয়ে পরে শুধু তাই নয়, দেশের সাধারণ মানুষের কাছেও সরকারকে হেনস্তা হতে হয়।[৩০৮]

বিশ্ব বিজ্ঞান প্রযুক্তি অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তো দিন দিন বেড়েই চলেছে। The world has been experiencing a tremendous scientific and technological advancement. But the civilization failed to

[৩০৭] প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী, প্রধান অতিথির ভাষণ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা, সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ৩১-৩২

[৩০৮] সমাবর্তন-বক্তৃতা, ডঃ এম শমশের আলী, তৃতীয় সমাবর্তন, ২৮শে মার্চ, ২০০২, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পৃষ্ঠা নং-০২-০৩

Dhaka University Institutional Repository

ensure peace, integrity, dignity and fraternity as a whole. This is the result of disrespect to moral and ethical values.[309]

আজ আমরা যে মানবসম্পদ উন্নয়নের কথা বলছি প্রতিনিয়ত, আলোকিত মানুষ ছাড়া সেই মানব সম্পদ গড়া সম্ভব নয়। আমরা এখনও যে টিকে আছি, তা কিছুসংখ্যক আলোকিত মানুষ আছে বলেই। এদের সংখ্যা সীমিত। অথচ দেশের স্বার্থে এদের সংখ্যাটা বাড়ানোটাই এই মুহূর্তে একটা বড় কাজ। শিক্ষিত লোক ও আলোকিত লোকের মাঝে তফাৎটা কোথায়। বস্তুগত বিদ্যার সাথে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ যুক্ত করতে পারলেই একজন শিক্ষিত মানুষ আলোকিতক মানুষ হতে পারে। আজ দেশ ও সময়ের দাবি আলোকিত মানুষের শুধু শিক্ষিত মানুষের নয়। এমন একটা সময় এসেছে যখন সৎ মানুষ খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে। সব পেশাতেই চিত্র এখন একই রকম দাঁড়াচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথাই ধরা যাক। এদের মধ্যে অনেকে নিজের ছাত্রদের ক্লাস বাদ দিয়ে হলেও অন্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ক্লাস নিয়ে থাকেন। অনেকে মাসের পর মাস খাতা দেখেন না, বিভিন্ন জায়গায় কনসালটেন্সিতে ব্যস্ত থাকেন বলে। সেশন জ্যামের এটাও একটা কারণ বটে। কিন্তু সবচাইতে মজার ব্যাপার এই যে, এ জন্য শিক্ষকরা বিবেকের দংশনে ভোগেন বলে মনে হয় না। সব শিক্ষকই এরূপ আচরণ করেন না। করলে হয়তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দিতে হত। সব প্রতিষ্ঠানে এখনও কিছু আদর্শবান লোক আছেন, আমরা তাই এখনও টিকে আছি। তবে সবক্ষেত্রে যে নৈতিকতার ধস নেমেছে তা ঠেকাতে হলে আমাদেরকে একবারেই গোড়াতে ফিরে যেতে হবে– শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঠেকাতে হবে। পরিণত বয়সে মানুষকে নৈতিকতা শেখান যায় না। শেখাতে হয় একেবারে গোড়াতে এবং তা করতে হলে প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো বর্তমানে যে বস্তুগত পাঠদান (ম্যাটেরিয়াল নলেজ) করা হচ্ছে তার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করাতে হবে।[৩১০]

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তৃতায় প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন ঃ

It is eqally important that teaching of morality and religious belief is essential for disciplining human nature so that life may be balanced, sober, happy and contented. Otherwise, human beings may turn out to be indifferent and casual in attitude and sadist, cruel and voilent in nature. For a happy life the intellectual skill, which is the outcome of the existing system of education, should be happily married with spiritual vigor, which stems out of moral values and religious beliefs.

The development of the intellect and of the moral force are not only intimately related but in fact are inextricably linked up in terms of origin also. Just as there is an order in nature in the form of laws of science, so too is there a moral order. The academics must strive to re-orient the belief that there is a transcendent moral order and it has to be restored as the central axis of the system of education. Many eminent thinkers have asserted that human happiness is dependent on living our lives in accordance with this transcendent order. Not only that, peace and order within human society largely demand a respect for this order. It has also been asserted by many a one that the education which ignores moral and religious belief can not qualify as a quality education. And it is the quality education which can globally serve peace, generally care for emancipation, universally bring about happiness, continually develop nature and make the whole world a happy habital for the man kind.[311]

শিক্ষা সম্বন্ধে একই ধরনের প্রত্যয় [Concept] এর অনুসরণ ঘটেছে Dr. Benjamin S. Bloom এর Taxonomy of Education objectives [1956, 1964], Handbooks গুলোতে, যেগুলো নানান দেশের শিক্ষাবিদনগণের কর্মশালায় আলোচনা ও গবেষণায় প্রকাশ পায়। যেখানে Cognitive Domain বা জ্ঞান বা মস্তিষ্কের চেতনার বিকাশ, Psychomotor Domain বা Skill বা কর্মদক্ষতার বিকাশ ও Affective Domain বা Moral values বা নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। Kipling এর Head, hand and heart [বা 3H's] অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের সুসমন্বিত বিকাশের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বা ইতিবাচক পরিবর্তন এলেই ব্যক্তির প্রকৃত অর্থে শিক্ষা লাভ হয়। মূল্যবোধের বিকাশ ছাড়া শিখন বা Learning হয় বা একজন ব্যক্তি কেবল সাক্ষরতা লাভ করে 3R's এর [Reading, Writing & Arithmetic] কিন্তু শিক্ষা বা Education হয় না অর্থাৎ একজন শিক্ষিত হয় না, সত্যিকার অর্থে মানুষও হয় না।

---

৩০৯ Prof. Dr. A.K.M. Azharul Islam, Speech from Vice-Chancellor, 3rd convocation, Islamic University Chattagong, 05 April, 2007 Page No.-19

৩১০ সমাবর্তন-বক্তৃতা, ডঃ এম শমশের আলী, তৃতীয় সমাবর্তন, ২৮শে মার্চ, ২০০২, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পৃষ্ঠা নং-০৫-০৬

৩১১ 3rd convocation, Islamic University Chattagong, 05 April, 2007 Page No.-13

Dhaka University Institutional Repository

অতএব দেখা যাচ্ছে, মূল্যবোধের বিকাশের ক্ষেত্রে ইসলামিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক। কেন না মদ খাওয়া হারাম, ঘুষ খাওয়া হারাম, তালাক দেয়া সর্বনিকৃষ্ট হালাল [এর পর থেকে হারাম শুরু], অকারণে 'তালাক' বলা হারাম [তালাক সিদ্ধ হয় না], গরিবের হক যাকাত, মনের সাথে শারীরিক ইবাদত; নামাজ পড়া, রোজা রাখা ও নিজ রিপুকে সংযত রাখার ওপর ইসলাম ধর্মের কঠোর নির্দেশ রয়েছে।[৩১২] ইউনেস্কোর শিক্ষা বিশেষজ্ঞ জীন টমাস বলেন, Modern Education is an artificial barrier between education and society, between education Institutions and Life.[313]

-এ দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে রেখে ১৯৮০ সালে ইউনেস্কো সম্মেলনের প্রস্তাবনায় একটি দেশের শিক্ষানীতি প্রনয়ণে সে দেশের ধর্ম, সামাজিক মূল্যবোধ এবং নীতিবিজ্ঞান অন্তর্ভূক্ত করার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্যক্তি সচেতনতা ও ধর্ম নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Self-awareness in religious education includies pupils:

- feeling confident about their own beliefs and identity and sharing them without fear of embarrassment or ridicule
- developing a realistic and positive sense of their own religious, moral and spiritual ideas
- recognizing their own uniqueness as human beings and affirming their self-worth
- becoming increasingly sensitive to the impact of their ideas and behavior on other people.[314]

ধর্ম ও নৈতিকতা বিকাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান:

বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্পকালীন দেশ পরিচালনাকালে আইন করে মদ-জুয়া, ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘোড়দৌড়ের নামে জুয়া, হুইস্কি, লটারী, গেট-এ-ওয়ার্ল্ড প্রভৃতি ইসলামবিরোধী ব্যাপার নিষিদ্ধ করে দেন। এমনকি সরকারি অনুষ্ঠানাদিতে বিদেশিদেরও মদ পরিবেশন বন্ধ করেছেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছর শাসনামলে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা। মুসলমানদের সমাজ জীবনে সত্যিকার ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, দেশের বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এবং ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা ও ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১৫]

মুসলিম শিক্ষার উপরে চারটি World Conference (মক্কা- ১৯৭৭, ইসলামাবাদ-১৯৮০, ঢাকা-১৯৮১ এবং জাকার্তা-১৯৮২) অংশগ্রহণকালীর সকলেই ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুধু তাদের প্রতিশ্রুতিই ব্যক্ত করেননি বরং Detail work plan ও তৈরি করেছেন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন প্রসঙ্গে একটি আন্তর্জাতিক জার্নালের সংবাদ ছিল-

President Ziaur Rahman's Support for Islami education :

President of Bangladesh H.E. General Ziaur Rahman, was to inaugurate the Third World Conference on Muslim Education but could not do so as he was away as a member of the Islamic Summit Goodwill Mission for the Gulf War. He sent a message wishing the Conference 'a grand success.' On his return the president invited the delegates to the President's House. He stressed that progress and prosperity of the Muslims depended on unity. President Ziaur Rahman recalled that his Government had taken various initiatives in the international Islami forums to promote the cause of Muslims. He referred to the initiatives of the Bangladesh Government in the recently concluded Islamic Summit at Taif and spoke of the Makkah Declaration. He made a strong plea for evolving a suitable curriculum catering to the growing needs of the Muslim World. He expressed firm hope

---

৩১২ প্রেক্ষণ, জুলাই-আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত, প্রকাশ আগষ্ট-২০০১, পৃষ্ঠা- ১২১

৩১৩ (UNESCO Press, Paris, ১৯৭৫, চ-১০৪)

৩১৪ Religious education: The non-statutory national framework, Qualifications and Curriculum Authority, U.K, p-8,10,13-14,21,24,26,28,30

৩১৫ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ, সম্পাদক, ডা: শাহাদাত হোসেন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, পৃ: ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

that the deliberations of the Third World Conference on Muslim education would produce positive results.[316]

মালয়েশিয়ার শিক্ষানীতিতে উল্লেখ আছে– The National Education Philosophy (NEP) states that : Education in Malaysia is an on-going effort towards further developing the potential of individuals in a holistic and integrated manner, so as to produce individuals who are intellectually, spiritually, emotionally and physically balanced and harmonious, based on a firm belief in and devotion to God. Such an effort is designed to produce Malaysian citizens who are knowledgeable and competent, who possess high level of personal well being as well as being able to contribute to the harmony and betterment of the family, the society and the nation at large.[317]

মালয়েশিয়া সরকার তাদের শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে অর্থাৎ primary Schoo, Lower Secondary School, Higher Secondary School, Technical Secondary School, Vocational Secondary School এর Curriculum এ Islamic religious education এবং Moral education নামে দু'টি কোর্সকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এছাড়া Teacher Education, Higher Education এবং Research area তেও Islamic religious education কে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। তা ছাড়া International Islamic University Malaysia (IIUM) তার প্রত্যেকটি Discipline-এ Islamic Civilization কোর্সকে Introduce করেছে।[৩১৮] অনুরূপভাবে ভারতের শিক্ষানীতিতেও উল্লেখ আছে- The National system of Education will be based on a national curricular that the flexible. The common core will include the history of India's freedom movement, the constitutional obligations and other content essential to nurture national identity. These element will cut across subject areas and will be designed to promote values such as India's common culture heritage, egalitarianism, democracy and secularism, equality of the sexes, protection of the environment, removal of social barriers, observance of the small family norm and inculcation of the scientific temper. All educational programmers will be carried on in strict conformity with secular values.[319]

Oxford Centre for Islamic Studies-এ ১৯৯৩ সালে প্রদত্ত সেন্টারের পেট্রন H.R.H. The Prince of Wales-তার বক্তৃতায় পাশ্চাত্যের বর্তমান অন্ধ ইহজাগতিকতা, স্বার্থসর্বস্ব বস্তুবাদ, ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের পেছনে বিরামহীন ছোটাছুটি এবং প্রকৃতিকে পদানত করে ফেরআউনী স্বেচ্ছাচারিতার লাগামহীন প্রতিযোগিতায় শ্রান্ত, ক্লান্ত ও খণ্ডিত জীবনের অধিকারী হতাশ মানবগোষ্ঠীর করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন এভাবে: "More thats this, Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost. At the heart of Islam is its preservation of an integral view of the Universe. Islam like Buddhism and Hinduism-refuses to separate man and nature, religion and science, mind and matter, and has preserved a metaphysical and unified view of ourselves and the world around us. At the core of Christianity there still liesan integral view of the sanctity of the world. And clear sense of the trusteeship and responsibility given to us for our natural surroundings.[320]

[৩১৬] News & Views-Vol-1, No. 2 & 3 (A bi-montly magazine of World center for Islami education Makkah and King Abdul Aziz University Jeddah)

[৩১৭] Education in Malaysia, Educational planning and research division, Ministry of Education Malaysia, P-VII

[৩১৮] Education in Malaysia: Curriculm, Teacher Education, Higher Education chapter. P-32

[৩১৯] National Policy of Education-1986, Ministry of Human Resource Development, Department of EducationNew Delhi-3, 4.

[৩২০] প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী, প্রধান অতিথির ভাষণ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা, সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ২৮

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে যে প্রশ্নটির উত্তর সবসময় আমাদের মনে রাখা দরকার তা হলো আমরা কি প্রচলিত ব্যবস্থাটিকে সংস্কারের মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী করতে চাই, নাকি আমরা ন্যায়-বিচারভিত্তিক একটি নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁদের গোটা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের, সার্বিক পরিবর্তনের কথা কখনও তোলা উচিত নয়। অধিকন্তু মনে রাখতে হবে, কোনো আদর্শ, কোনো নীতি, কোনো পরিকল্পনা ও কোনো কর্মসূচিরই কোনো মূল্য নেই, যদি তা শ্রেয়োবোধ ও শুভবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হয়। যাঁরা নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী তাঁদেরকে নৈতিক বলে বলীয়ান এবং শুভবুদ্ধির শক্তিতে শক্তিমান হতে হবে এবং সাহসের সঙ্গে ধূর্ততা, চতুরতা, ভাঁওতা ও চক্রান্তের মোকাবিলা করতে হবে।[৩২১] এ সংকট উত্তরণে যা করা দরকার। এসব ধূর্ততা, চতুরতা, ভাঁওতা ও চক্রান্তের মোকাবিলা করার জন্য আমি যে প্রস্তাবটি এখানে করতে চাই তা হলো প্রাথমিক পর্যায়ে সকল শিশুদের জন্য একটি অভিন্ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন। একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারণের পূর্ণ এখতিয়ার একমাত্র আমাদের। কোন দেশ প্রাচ্য বা প্রতীচ্য-এর অন্ধ অনুসরণ যেমন আমরা করব না তেমনি অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু গ্রহণ করব না এমন অহেতুক জিদও আমাদের থাকবে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের অধিকাংশ নাগরিকদের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমাদেরই ধর্ম, ইতিহাস, ঐহিত্য ও জাতীয় চরিত্রের পরিপূরক হবে। জাতীয় চিন্তা থেকে তা উৎসারিত হবে এবং জাতীয় চেতনাকে আবার তা সমৃদ্ধ ও সতেজ করবে।[৩২২] শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষা সংযুক্ত করতে হবে। ইংরেজিতে আমরা যাকে এথিক্স ও মরাল ফিলসফি বলি, তার উৎপত্তি যথাক্রমে এথস্ ও মস (ethos) (mos) এই দুইটি ল্যাটিন মূল থেকে। দুটি শব্দেরই অর্থ প্রথা, কাস্টম বা প্রচলিত রীতি-নীতি। মানবাতিহাসের সূচনালগ্নে মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানবুদ্ধিও পরিসর ছিল খুবই সীমিত। তখন তাদের কর্ম ও আচরণের মূল্যবিচারের কেনো প্রতিষ্ঠিত প্রামাণিক মানদণ্ড ছিল না। এমতাবস্থায় দৈনন্দিন জীবনের জরুরি প্রয়োজন এবং সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা সুরক্ষার স্বার্থে তাদের নির্ভর করতে হতো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু রীতি নীতি ও প্রথা প্রচলনের ওপর। ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিতর্কের নিরসন এবং নৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের লক্ষ্যে পূর্বপুরুষরা যেসব বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং যেগুলো ছিল পুরুষানুক্রমে গৃহিত ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত, সেগুলোকেই তারা গ্রহণ করত সমাজজীবনের শক্তি এবং নৈতিক সদাচরনের আদর্শ মানদণ্ড হিসেবে। এক কথায়, প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতিই (customs) ছিল আদিকালের নৈতিক আদর্শ।[৩২৩]

নৈতিক চেতনা বিকাশের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও সুপ্রাচীন। তবে পাশ্চাত্য জগতে এথিক্স বা নীতিবিদ্যার প্রণালিবদ্ধ আলোচনা শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলই এই প্রারম্ভিক আলোচনার পথিকৃৎ। তাঁদের মতে, যেসব কর্ম ও আচরণ মানুষকে ভালো বা খারাপ প্রতিপন্ন করে, সেগুলো কোনো আকস্মিক আপতিক ব্যাপার নয় বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা ইচ্ছাকৃত কাজ। এ ঐচ্ছিক আচরণকেই তাঁরা এথ্স বলে অভিহিত করেন, আর তাঁদের এই শিক্ষা থেকেই শুরু হয় এথিকস কথাটির। পরবর্তী পর্যায়ে সিসেরো, সেনেকা (৩ খ্রি.পূ. ৬৫খ্রি) মার্কাস অরেলিয়াস (১২১-১৮০) প্রমুখ রোমান দার্শনিক মস্ কথাটিকে ব্যবহার করেন প্রথাগত আচরণের অর্থে. আর এ থেকেই উৎপন্ন হয় মরাল্স ও মরালিটি শব্দদ্বয়।[৩২৪]

শিক্ষাব্যবস্থায় নীতি ও নৈতিকতা তথা মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার কথা নতুন কিছু নয়। তাই তো আমরা দেখি আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক সুবর্ণ যুগে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো আর এরিস্টটল তাদের দর্শন চিন্তায় সত্যিকারের সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক তৈরি করতে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে গেছেন। প্লেটো তার রিপাবলিক গ্রন্থে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা ও লিখে গেছেন। এরিস্টটল ও তার নেকোমেকিয়ান এথিক্স গ্রন্থে নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শুধুমাত্র নৈতিক শিক্ষা দানের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি আচরণকে নৈতিক করার ব্যাপারেও বাধ্যবাধকতা প্রয়োগ করতে বলেন। বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে নৈতিক আচরণ করতে করতেই মানুষ স্বভাবগত ভাবেই নৈতিক হয়ে উঠে বলে তিনি মনে করেন। অভ্যাসগত নৈতিকতাই পরবর্তী কালে স্বভাবগতভাবে নৈতিক হওয়ার পথে সহায়ক হয়। নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব এখানেই।[৩২৫]

---

৩২১ আবুল কাসেম ফজলুল হক, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রসঙ্গে, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৪।

৩২২ প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী, প্রধান অতিথির ভাষণ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা, সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ৩১

৩২৩ আমিনুল ইসলাম, জগতজীবন দর্শন, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৯।

৩২৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০।

৩২৫ হাসনা বেগম, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নৈতিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের মাঝামাঝি নৈতিক শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। তিনি নিজেই নৈতিক শিক্ষার উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্যবই রচনা করেন ও কয়েকটি বিদেশী বই অনুবাদ করেন। একেবারে প্রথমেই তিনি শিশুদের জন্য রচনা করেন বোধদয় ও বর্ণ পরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ। প্রাথমিক স্তরের উচ্চতর শ্রেণী ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রাছাত্রীদের জন্য তিনি ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ করেন। তার অনুদিত বই কথামালা (Easops Fable) ও জীবন চরিত (Chambers Biogrphics) এর অনুবাদ তার লিখিত ও অনুদিত বইগুলোকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থাও করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের রচিত ও অনূদিত বই শিশু ও কিশোরদের জন্য বইগুলোতে নৈতিক শিক্ষার দিকেই মন দেওয়া হয়েছে।[৩২৬] শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার ধারণা অনেক পুরনো। এমনি একটি সময়ে আমরা নৈতিক শিক্ষার উপর আলোচনা করছি, যখন চারদিকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দুর্নীতি জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। চারদিকে সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, খুব রাহাজানি, এসিড নিক্ষেপ। ব্যাপক মাদকসক্তি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়েছে আজকে এদেশে। অথচ এদেশের সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা সবসময় ছিল। আজোও আছে। অন্তত কারিকুলামে আছে। বাংলাদেশের শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই এদেশের শিক্ষা কয়েক সহস্র বছর ধরে পরিবর্তন পরিমর্জিত হতে হতে আজকের এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। নৈতিক শিক্ষা দিয়েই এই শিক্ষা শুরু হয়েছিল। সাধু, সন্ন্যাসী, মুনী-ঋষিগণই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্থ-শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষার মূল কথা ছিল ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস। আর্যরা বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরই এই বিশ্বে এক পরিপূর্ণ সত্তা এবং মানুষ তার অংশ বিশেষ এবং মানুষ ক্রমে ক্রমে এই পরম সত্তার সাথে মিশে যাবে। এই বিশ্বাসে সমাজেও শিক্ষা পরিচালিত হতো। পরম সত্তার সাথে মিশে যাওয়াই ছিল ঋষিদের মতবাদ এবং ভারতীয় জীবনদর্শন। ঋষীরা বলতেন মানুষের দেহ নশ্বর এবং আত্মা অবিনশ্বর।[৩২৭]

নীতিবোধের ঘাটতি আজ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও বিনোদন- সর্বত্র বিরাজ করার ফলে বিপর্যয় লক্ষ করা যাচ্ছে। অন্য দিকে বিস্তার ঘটেছে অশালীনতার। মানুষ কমবেশি রোবটের মতো হয়ে গেছে। একইসাথে অর্থ উপার্জনের মেশিনে পরিণত হয়েছে। এসব কারণে মানুষের ভিতর মূল্যবোধের এবং তার ভিত্তি ধর্মের প্রতি প্রতিশ্রুতি খুব কম লক্ষ করা যাচ্ছে। সেইসাথে তার প্রভাব নৈতিক মূল্যবোধসহ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এবং জনগণের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতির ফলে আমাদের দেশেই শুধু নয়, আজ সারা বিশ্বে, গোটা মানবজাতির মধ্যে বিপর্যয় নেমে আসছে। আমরা সবাই এর ফলে গভীর সংকটের মুখে পড়ে যাচ্ছি। এদিকে শীতল যুদ্ধ আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। বর্তমান সভ্যতা যে সংকট মোকাবেলা করছে তার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। এটা হয়েছে মূলত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে। এই শিক্ষা আমাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত না থাকায় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেবল এমন মানুষ তৈরি করছি যাদের মধ্যে কোন ভালবাসা, স্নেহ আকর্ষণ, মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের মধ্যে সাধারণ মানবিক নাগরিকবোধের স্পর্শকাতরতাও লক্ষ করা যাচ্ছেনা। অথচ বাস্তবে আমাদের এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। এই সংকট মানবতার। বিশ্বব্যবস্থা একটা বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বত্র চেষ্টা করতে হবে, যাতে শিক্ষা ও নৈতিকতা পুরোপুরি সংযুক্ত হয়।[৩২৮]

তবে আশার দিক হচ্ছে মেডিকেল পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) অধ্যাপক খন্দকার মোঃ সিফায়াত উল্লাহ দৈনিক প্রথম আলো কে বলেন, মূলত দুটি কারণে পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। দেশে অসংক্রামক ব্যাধির (non communicable Diseas) প্রবেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্বাসতন্ত্রের জটিলতা আগের চেয়ে দেশে বেশি দেখা যাচ্ছে। অথচ এসব বিষয়ে বর্তমান পাঠ্যসূচিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া হয়নি। নতুন পাঠ্যসূচিতে নীতি-নৈতিকতা আইন এসব বিষয়কে আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবছে সরকার। অধ্যাপক সিফায়েত আরো বলেন, এদেশের চিকিৎসকদের প্রতিভা ও দক্ষতার কমতি নেই। কিন্তু রোগির সঙ্গে চিকিৎসকের আচরণ দিয়ে অনেক অভিযোগ শোনা যায়, তাই আচরণ ও নৈতিকতায় বিষয়গুলোকে আরো গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের জানানো প্রয়োজন রয়েছে।[৩২৯] আমাদের দেশে একটা বড় সংকট হচ্ছে আমরা হঠাৎ খুব জোরে জাম্প দিয়েছি। জাম্প দিতে যেয়ে একটা কালচারাল ক্রাইসিস হয়েছে, আইডেন্টিটির ক্রাইসিস হয়েছে, মরালিটির ক্রাইসিস হয়েছে, স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিস হয়েছে। এটা আমাদের এডজ্যাস্ট করতে হবে। সে জন্য আমি

---

[৩২৬] প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৬।
[৩২৭] হাসনা বেগম, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন; প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২।
[৩২৮] শাহ আব্দুল হান্নান, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮, উপ-সম্পাদকীয়, পৃঃ ৬।
[৩২৯] প্রথম আলো, বুধবার ১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯।

Dhaka University Institutional Repository

মনে করি যে, ধর্মীয় নৈতিকতাকে ছাড়া যাবে না। পছন্দ করি আর না করি, কোটি কোটি লোক এটিকে বিভিন্ন ধর্মের কমন এলিমেন্ট হিসেবে বিশ্বাস করে। ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মরালিটি বেজড অন রিলিজিয়ন। সব ধর্মে বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম বলেন, ইহুদি বলেন, হিন্দু বলেন সব বড় ধর্মেই তিনটি দিক থাকে। একটি হচ্ছে তার দার্শনিক ভিত্তি, অন্যটি তার আচার অনুষ্ঠানের দিক এবং মানবিক মূল্যবোধের দিক। এই যে ফিলসফিক্যাল ফাউন্ডেশন বা মেটা ফিজিক্যাল বেসিস এ ব্যাপারে ধর্মে ধর্মে পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় যে দিক, রাইট, রিচুয়াল, এবং সেরিমোনির দিক। এখানে ও ধর্মে ধর্মে পার্থক্য আছে, ব্যবধান আছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ধর্মে ধর্মে ব্যবধান নেই, সেটা হচ্ছে নৈতিক দিক। কোনো ধর্মই মানুষকে অনৈতিক হওয়ার কথা বলেন না।[৩৩০]

মূল্যবোধ বা নৈতিকতাকে বিভিন্নভাবে বিকশিত করা যায়। তবে নৈতিকতা বা মূল্যবোধ বিকাশের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষানীতি। Before discussing about rational policy it is necessary to say something about the underlying values and objectives inherent in our education policies.
Vlaues : The goals and objective of education are determinant factors in education. The coustitation of Bangladesh was the basis on which the values of our education policies underlie. The values as identified in the commission are as follows:

Education would :

a. Promote feeling of partiontism and good citizenship.
b. Develop a feeling of unity and solidarity.[331]

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবেএ শিক্ষাকে জীবনধর্মী ও প্রাসঙ্গিক করতে হবে, নিতান্ত কেতাবী শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে উপযুক্ত স্থানে দিতে হবে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন হতে হবে যেন সুস্থ মূল্যবোধ জেগে উঠে এবং সৃজনশীলতা বিকশিত হয়।[৩৩২] যে নীতি দেশের বেশির ভাগ মানুষকে আওতার বাইরে রাখে, তাকে জাতীয় নীতি বলা যায় না।[৩৩৩] আজ আমরা যে শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকার তা ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থেই করেছে এবং সঙ্গত কারণেই সব শ্রেণী পেশার মানুষকে এ নীতির আওতায় আনা হয়নি। এক্ষেত্রে আমরা মেকলের কথাকে উল্লেখ করতে পারি, তিনি বলেন, "Clearly if the curriculum was to be modern, the medium of instruction has to be English", তখন তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। মেকলে তাঁর শিক্ষানীতিতে শাসক ইংরেজদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, "We must atpresent do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern–a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals and intellect."। মেকেলের সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। রাম মোহনদেরও এদেশে সৃষ্টি হয়েছে ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী একটি শিক্ষিত শ্রেণী যারা শাসক ইংরেজ ও শোষিত জনগণের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে নিজেদের ক্ষুদ্র শ্রেণী স্বার্থে সর্বতোভাবে ইংরেজদের সহযোগিতা করে গেছেন।[৩৩৪]

মানবসভ্যতার প্রাণশক্তি হলো শিক্ষা। মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগিতা ও সার্বিক সমন্বয়ের উপর নির্ভর করে প্রতিভা বিকাশের মাত্রা। দেশ ও জাতি গঠনের জন্যও শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সাথে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় অতীব জরুরি। শিক্ষাব্যবস্থার সামঞ্জসতা এমন হওয়া দরকার যে, যাতে তা শিক্ষার্থীদের আর্থিক, নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করতে পারে। শিক্ষাবিদ ও অন্যান্যদের মূল দায়িত্ব হল তাই। এ প্রসঙ্গে Spiritual, Moral, Social and Cultural Devlopment Policy তে বলা হয়েছে যে,

---

[৩৩০] হাসনা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০।
[৩৩১] Dr. Sharifa Khatun, National Policy on Education, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২, পৃষ্ঠা নং-১১৮।
[৩৩২] প্রফেসর কবীর চৌধুরী, আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২, পৃষ্ঠা নং-০৬।
[৩৩৩] প্রফেসর আনিসুজ্জামান, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২, পৃষ্ঠা নং-১৩।
[৩৩৪] শহিদুল ইসলাম, আমাদের শিক্ষানীতি ঃ অতীত ও বর্তমান, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২, পৃষ্ঠা নং-৮৯-৯০।

Dhaka University Institutional Repository

'The responsibility of education and others in the importance of encouraging pupils, Spiritual, Moral, Social and Cultural developments remains strong, whether taking about the family, teenage pregnancy, the misuge of drugs, ethics in business are politics, football hooliganism, homophobia, the promotion of good race relations, the consequences of social disadvantage, a failuse to vote at elections, or the host of other issues which raise spiritual, moral, social and cultural issues, the debate every quickly turns to schools and the role they can play spiritual, Moral, Social and cultural Development policy- Derby City Council Education Service.[335] শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির সমন্বয় থাকলে শিক্ষার্থীদের সকল দিক থেকে উন্নয়ন সাধিত হবে। অন্যান্য সকল দিকের সাথে তাদের নৈতিক উন্নতিও সাধিত হবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

"Spiritual development helps individuals to make sense of these questions, and about what it doest to help form pupils response to life and various forms of experience, or even to questions about the universe."[336]

The word moral comes from a latin root (mos, moris) mean the code or customs of a people, the social give that defines how individuals should live together.[337]

নৈতিক উন্নতি বলতে Spiritual, Moral, Social and cultural development policy তে বলা হয়েছেঃ
Moral development is about the building by pupils of a frame work of moral values, which regulates their personal behaviour it is also about the development of pupils understanding of Socity's and Shaved and agreed values. It is about understanding that there are issues where there is disagreement and it is also about understanding there society's values change. Moral development is about gaining an understanding of the range of views and the reasons for the range. It is also about developing an opinion about the different views.[338] শিক্ষামূলক ও শিক্ষা বহির্ভূত উভয় কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা যায় তাদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করে। নৈতিক মূল্যবোধ বিপরীতমুখী পরিবেশে সঠিক পথ অবলম্বনের হাতিয়ার। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর এ নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাই প্রধান।

'On a more personal level, teachers have a significant responsibility for moral education. They inevitable define, for their pupils, standards of behaviour in the classroom and around the school. They engage pupils in thingking about their responsibilities when issues arise, such as keeping promises telling the truth, or dealing with unfairness and injustice. They provide for pupils, whether consciously or unconsciously, a moral framework of values which guide their relationship with others. Teachers face moral dilemmas and demonstrate to pupils how they can be addressed. Teachers attitudes and interactions provide powerful role models.'[339]

শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো চারিত্রিক যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি যা দেশ ও জাতির জন্য উপকারী। আর চারিত্রিক মানুষ তৈরির জন্য নৈতিকতা ও ধর্মের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তাই এ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ তৈরির জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থার

---

৩৩৫ Development policy- October-2009

৩৩৬ Handbook for the Inspention of schools, part 4 Inspection Schedule Guidance; consolidated edition, 1994, HMSO 1994, page 86|

৩৩৭ http://education.stateuniversity.com

৩৩৮ Handbook for the inspections of Schools, part 4, inspection schedule guidance. Consolidated Edition, 1994, HMSO 1994, Page: 86.

৩৩৯ Spiritual, Moral, Social and Cultural Development Policy, September 2005 এর Appendix দ্রষ্টব্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন যেখানে রয়েছে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সমাজকর্মী যার জন্যই প্রয়োজন সেই শিক্ষাব্যবস্থা যার মাধ্যমে এসবের পাশাপাশি ভাল মানুষ তথা সৎ চরিত্রবান নাগরিক হিসেবেও শিক্ষার্থী গড়ে উঠে যার সুফল পাবে দেশ ও জাতি। অন্যথায় তারাই দেশ ও জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্যান্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় আবশ্যক। ধর্মীয় শিক্ষা সামাজিক উন্নতির সোপান বলে বিবেচিত হয়। Religious education provides opportunities to promote ***social development*** through:

- considering how religious and other beliefs lead to particular actions and concerns
- investigating social issues from religious perspectives, recognizing the diversity of viewpoints within and between religions as well as the common ground between religions
- articulating pupils own and others ideas on a range of contemporary social issues.[340]

আমাদের দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে বলা হয়েছে:
১(ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি।[৩৪১] অবশ্য বর্তমানে সংশোধিত। সঙ্গত কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ধর্মীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের সংবিধানেও ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন যাপনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

1. The muslims of Pakistan should be enabled, individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concept of Islam, and should be provided with facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to those principles and concepts.
2. The teaching of the Holly Quran and Islamiat to the Muslims of Pakistan should be compulsory.
3. Unity and the observance of Islamic moral standards should be promoted amongst the Muslims of Pakistan.[342]

বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদেও শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ৮ম সংশোধনী বিতর্কে অংশ নিয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য মোফাজ্জল কায়কোবাদ বলেছেন, দুইশত বৎসর যখন ব্রিটিশরা এদেশকে শাসন করেছিল, তার পূর্বে এদেশে মুসলমানরা রাজত্ব করেছিল। ব্রিটিশ যখন এদেশের শাসনভার নিয়েছিল, তখন সেই দুইশত বৎসরে বৃটিশরা ইসলামকে মুছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা নিয়েছিল, সে পরিকল্পনার একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থাকে। এমনভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছিল, যাতে এই দেশ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্টান থেকে ইসলামের নামকে মুছে দেওয়া যায়।এই দেশ থেকে ছাত্র এবং শিক্ষকদেরকে ইসলামের দুশমন হিসেবে গড়ে তোলা যায়। তাদেরই সেই চেষ্টা আজকের প্রতিফলন।[৩৪৩]

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণ ঘটেছে। স্থানীয় লৌকিক উপকরণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেও বহু উপকরণ সংমিশ্রিত হয়েছে। ধর্মীয় মুল্যবোধটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধান এবং সংখ্যাগরিস্টের ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রভাব বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে একটি প্রবল প্রভাব। এর সঙ্গে হিন্দু প্রভাব, বৌদ্ধ প্রভাব এবং খ্রিষ্টান প্রভাব মিলিত হয়েছে। মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালের সম্মেলনের একুশ সংখ্যক প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুবকদের চরিত্র এবং মানসিকতা গঠনের জন্য ধর্ম এবং আত্মিক আদর্শ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর সকল দেশেই এই গুরুত্ব অল্প বিস্তর তারতম্য সহ বিদ্যামান। সেই কারণে ইউনেস্কো মনে করে যে, বিভিন্ন জাতীয় সাংস্কৃতিক

---

৩৪০ Religious education: The non-statutory national framework, Qualifications and Curriculum Authority, U.K, p-8,10,13-14,21,24,26,28,30

৩৪১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রস্তাবনা, পৃ: ১। ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত।

৩৪২ The constitution of the Republic of Pakistan, Chap-2, Principles of policy, page 12. (The Manager, Gov. of Pakistan press, Dacca 1962, 7th March.)

৩৪৩ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, কুমিল্লা-৩, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে অষ্টম সংশোধনী বিতর্ক, বিল ১৯৮৮, খণ্ড ১, সংখ্যা ২৩, সংবিধান, পৃ: ২০৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্যের মূলে ধর্মের প্রভাব আছে। সুতরাং পৃথিবীর সকল দেশের কর্তব্য হচ্ছে, ধর্ম ও আত্মিক চৈতণ্যকে যথার্থ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা নির্ধারণের সময় ধর্মের স্থান সম্পর্কে সচেতনভাবে চিন্তা করা। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউনেস্কোর প্রস্তাব হচ্ছেঃ

১. একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সে দেশের ঐতিহাসিক ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা ।
২. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আত্মিক চৈতন্যকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান।
৩. ধর্মের একটি আন্তর্জাতিক বিশিষ্টার্থক এবং সর্বমানববাদী রূপ আছে। সেই রূপকে সংরক্ষণ করা। এবং তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে সমন্বিত করা।

৪. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিতে যে আত্মিক মূল্যবোধ বা (Spiritual values) রয়েছে আপনা আপনি সে সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে সেই মূল্যবোধকে মর্যাদা দেওয়া।[৩৪৪]

বর্তমান সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তি কোনো বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষা নয়। সেখানে সকল ধর্মের শিক্ষাই বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে যে আদর্শটা সক্রিয় তা হচ্ছে, সকল বিদ্যার্থী একটি আস্তিক্যবাদে যেন গড়ে উঠে। হিন্দুদের জন্য হিন্দু ধর্মশিক্ষা, বৌদ্ধদের জন্য বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, মুসলমানদের জন্য ইসলাম ধর্মশিক্ষা এবং খ্রিষ্টানদের জন্য খ্রিষ্ট্রিয় ধর্ম শিক্ষা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমন। এখানে সহাবস্থানের একটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সকল ধর্মের সারতত্ত্ব নিয়ে নীতি শিক্ষার প্রচলন এখানে ঘটেনি কিন্তু প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী আপন আপন ধর্মীয় গন্ডিতে বিশ্বাসী হয়ে যাতে গড়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টা এখানে আছে। সুতরাং এখানে এক ধরনের মিশ্রিত ধর্মশিক্ষা বলা যায়। টিএস ইলিয়ট তিন ধরণের ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলেছেন, প্রথমত হচ্ছে, একটি একক ধর্মীয় শিক্ষা যা রাষ্ট্রীয় ধর্ম। যদি রাষ্ট্রে কোনো ধর্ম থেকে থাকে। দ্বিতীয়ত, সকল ধর্মের সারতত্ত নিয়ে একটি মাত্র নীতিশিক্ষার প্রবর্তন। এবং তৃতীয়ত, একটি মিশ্রীত ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নিজস্ব ধর্ম শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে। টিএস ইলিয়ট প্রতিটি ব্যবস্থারই সুবিধা অসুবিধার কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি মূলতঃ বলতে চেয়েছেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রশ্রয় না থাকলে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যার্থীদের জীবন গঠনে যথার্থভাবে সহায়তা করে না।[৩৪৫] শান্তি, ভালোবাসা, সম্মান, সহনশীলতা, সহযোগিতা ও স্বাধীনতা এ সব মূল্যবোধ পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত। এসব মূল্যবোধই মানবসমাজ ও অগ্রগতির চালিকাশক্তি। আপামর জনসাধারণের জন্য একটি উন্নত দেশ ও পৃথিবীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হলে, শিক্ষার্থীর মনে এ মূল্যবোধগুলো জাগ্রত করতে হবে। যাতে তারা সমাজের নাগরিক হিসেবে এগুলোর চর্চা করে। মূল্যবোধ শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রথমেই শিক্ষালয়ে মূল্যবোধভিত্তিক পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। যেখানে শিক্ষার্থীরা নিরাপদ এবং ভালোবাসার ও সম্মানের পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয় এবং যেখানে শিক্ষার্থীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাদের বুঝবার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিসত্তার তিনটি মাত্রা রয়েছে, শারীরিক, আবেগিক ও আধ্যাত্মিক। একথা মনে রেখে এ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমগ্র সত্তার উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হয়।[৩৪৬]

মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মূল্যবোধ সম্পর্কে চিন্তা ও অনুধাবন করতে সাহায্য করা। যাতে তারা নিজেদের ও অন্যের ক্ষেত্রে কমিউনিটির ক্ষেত্রে ও বিশ্ব পরিমন্ডলে এসবের বাস্তব প্রয়োগের নিহিতার্থ (Implication) উপলব্ধি করে। ব্যক্তিগত সামাজিক পর্যায়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উপলব্ধি, প্রেরণা ও দায়িত্ববোধ দৃঢ়মূল করে। ব্যক্তি বিশেষকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বেছে নেওয়া ও সেসব অনুসরণ করার বাস্তবসম্মত পথে চলার জন্য উৎসাহিত করা। শিক্ষকদের উৎসাহিত করা যাতে তারা শিক্ষাকে দেখেন শিক্ষার্থীর জীবনাদর্শ গড়ে তোলার হাতিয়ার হিসেবে যাতে তারা সমাজ জীবনে উদ্দেশ্য আত্মবিশ্বাস ও সম্মানের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে।[৩৪৭]

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতি বিশ্বকে নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্বের বর্তমান নৈতিক অধঃপতনের প্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক নেতা দালাইলামার মূল্যায়নঃ Thus it is only logical to try to strike a balance between material developments on the one hand and the development of spiritual, human values on the other. In order to bring about this great adjustment, we need to revive our humanitarian values.

---

[৩৪৪] সৈয়দ আলী আহসান, আমাদের আত্ম পরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, বার্ড পাবলিকেশন্স, জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং পৃঃ ১৪-১৫।
[৩৪৫] প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩-৪৪।
[৩৪৬] আবু হামিদ লতিফ, শিক্ষা শিখন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউন, ঢাবি, জুন ২০০৭, পৃঃ ২৪।
[৩৪৭] প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

I am sure that many people share my concern about the present worldwide moral crisis and will join in my appeal to all humanitarians and religious practitioners who also share this concern to help make our societies more compassionate, just, and equitable. I do not speak as a Buddhist or even as a Tibetan. Nor do I speak as an expert on international politics (though I unavoidably comment on these matters). Rather, I speak simply as a human being, as an upholder of the humanitarian values that are the bedrock not only of Mahayana Buddhism but of all the great world religions. From this perspective I share with you my personal outlook - that:

1. Universal humanitarianism is essential to solve global problems;
2. Compassion is the pillar of world peace;
3. All world religions are already for world peace in this way, as are all humanitarians of whatever ideology;
4. Each individual has a universal responsibility to shape institutions to serve human needs.[348]

শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের খুব কম দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়ই আমরা এর অনুপস্থিতি দেখতে পাই। প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় এটি একটি মৌলিক দাবি। তাই আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ অনেক দেশেও এর সমন্বয় বিদ্যমান। ভারতসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা এর প্রভাব দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে value of education in India-তে বলা হয়েছে Ancient Indian education had always been loaded with value components. The education upto eighteenth century of scriptures and Upa-nishads which are heavily loaded with the discourses on morality ethics and virtuosity. The was the pyretic concern around which other knowledge areas were women.[349] নৈতিক মূল্যবোধ একটি সর্বজনীন বিষয়। ধর্মীয়, সামাজিক বিভিন্ন দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও অনেক বিষয়ে আমরা নৈতিক মূল্যবোধের মিল তথা একরূপতা দেখতে পাই। আর শিক্ষা ব্যবস্থায় এর প্রভাব আরও জরুরি। সঙ্গত কারণেই শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুপস্থিতি কাঙ্ক্ষিত উন্নতি দিতে পারে না।

The detachment of education from its ethical and moral character, and introductory topics in curriculum did not bring about any desirable improvement in respect of affective and social outcome deterioration. These development were not unknown to those concerned with planning and execution of education efforts are continuing to reconstruct education to fulfill its role in preservation of the moral character of the society and with the economic and technological developments.[350]

অশান্ত পৃথিবীতে শান্তির পূর্বশর্ত ধর্মের মর্মবাণী বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করা। আধ্যাত্মিক নেতা দালাইলামা বলেন: The principles discussed so far are in accordance with the ethical teachings of all world religions. I maintain that every major religion of the world - Buddhism, Christianity, Confucianism, Hinduism, Islam, Jainism, Judaism, Sikhism, Taoism, Zoroastrianism - has similar ideals of love, the same goal of benefiting humanity through spiritual practice, and the same effect of making their followers into better human beings. All religions teach moral precepts for perfecting the functions of mind, body, and speech. All teach us not to lie or steal or take others' lives, and so on. The common goal of all moral precepts laid down by the great teachers of humanity is unselfishness. The great teachers wanted to lead

[348] http://www.dalailama.com/messages/world-peace/a-human-approach-to-peace
[349] National council of Education Research and Training http://ncert.nic.in/sites/publication/vechap.htm Page-2
[350] http://ncert.nic.is/sites/publications/vechap6.htm

Dhaka University Institutional Repository

their followers away from the paths of negative deeds caused by ignorance and to introduce them to paths of goodness.

ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে বলে না। স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, বর্ণবৈষম্য দূরীকরণে ধর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। All religions agree upon the necessity to control the undisciplined mind that harbours selfishness and other roots of trouble, and each teaches a path leading to a spiritual state that is peaceful, disciplined, ethical, and wise. It is in this sense that I believe all religions have essentially the same message. Differences of dogma may be ascribed to differences of time and circumstance as well as cultural influences; indeed, there is no end to scholastic argument when we consider the purely metaphysical side of religion. However, it is much more beneficial to try to implement in daily life the shared precepts for goodness taught by all religions rather than to argue about minor differences in approach.

ধম্য মানুষে মানুষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে। মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তোলে। There are many different religions to bring comfort and happiness to humanity in much the same way as there are particular treatments for different diseases. For, all religions endeavour in their own way to help living beings avoid misery and gain happiness. And, although we can find causes for preferring certain interpretations of religious truths, there is much greater cause for unity, stemming from the human heart. Each religion works in its own way to lessen human suffering and contribute to world civilization. Conversion is not the point. For instance, I do not think of converting others to Buddhism or merely furthering the Buddhist cause. Rather, I try to think of how I as a Buddhist humanitarian can contribute to human happiness.[351]

মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পরার্থপরতা। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ সে পরার্থপরতা শিখে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিকতার ছোঁয়া না থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে পরার্থপরতা করে তুলতে পারে না। আর তা সম্ভব না হলে পৃথিবীতে অরাজকতা ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। পৃথিবীর সুশৃংখলতা ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন মানবিক উন্নতি। মানবিক উন্নতি শুধু বস্তুত উন্নতি হলেই চলবে না। শুধু বস্তুগত উন্নতি অনেক সময় পৃথিবীতে বিশৃংখলতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি ধর্ম ও নৈতিকতার সমন্বয় সাধন করা না হয়; ভারসাম্যপূর্ণ ভাবে ধর্ম ও নৈতিকতাকে স্থান দেওয়া না হয় তবে সে শিক্ষাব্যবস্থা কার্যত সুফল বয়ে আনতে পারে না। তথা বিশ্ব কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে না। তা বিশ্বের শান্তির জন্য আরও হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ধর্ম ও নৈতিকতার সাথে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাই সমাজ গঠনে অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। আর তাহলেই বস্তুগত উন্নতির পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার্থীরা ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিকতাকে সমন্বিত করে শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করা দরকার যাতে তা সমাজের উপকারে আসতে পারে। তাই ধর্ম ও নৈতিকতার সমন্বয় সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ গঠনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। সকল ধর্মের মূল শিক্ষা হলো পরোপকার, সমাজের উন্নয়ন। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্ম নেই যা মানুষের উপকারের কথা বলে না, সমাজের কল্যাণের কথা বলে না, ক্ষতিকর প্রয়োগ থেকে দূরে থাকতে বলে না। প্রতিটি ধর্মই দেহ ও মনের সর্বোত্তম বিকাশ দেখতে চায়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল ধর্মই এক সুতোয় গাথা। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের সমন্বয় করা হলে তা বাস্তবে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় এর সমন্বয় অতীব জরুরি। নৈতিক মূল্যবোধহীন শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে তুলতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে সে শিক্ষা ব্যবস্থা রোবট তৈরি করে প্রায় যার আত্মা থাকে না, থাকে না সুস্থ সুন্দর অনুভূতি। তাই সুস্থ-সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ে তোলার জন্য নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প নেই। আর নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হল ধর্ম। তাই ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থাই মানুষ গড়ার প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিকতার সমন্বয় কেমন হওয়া দরকার সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রফেসর Stanly Hall বলেন: If you teach your children the three R.S (i.e, Reading, Writing and

[351] http://www.dalailama.com/messages/world-peace/a-human-approach-to-peace

Dhaka University Institutional Repository

Arithmetic) and leave the fourth R (i.e., Religion), you will get a fifth R (i.e, Rascality). শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো এমন মানুষ গড়ে তোলা যারা বিশ্বে শান্তি বজায় রাখবে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে লেখাপড়া আর যোগ বিয়োগ করার যোগ্যতার সাথে ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা না দিলে নিশ্চিতরূপে তা থেকে মানুষরূপী বর্বর পাওয়া যাবে। সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটিয়ে তারা গোটা জাতির জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।

পারমানবিক বোমা আবিষ্কারের পর 'The philoshophy of Modern Education' বইতে Prof. Brabacher বিশ্বব্যাপী নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, এটা না করলে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ, মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশি যোগাড় করে ফেলেছে। আসলে গোটা বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থাই যদি নৈতিকতা ও ধর্মের দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে বিশ্বশান্তি অসম্ভব।

সকল শিক্ষা ব্যবস্থারই একটি আদর্শিক ভিত্তি রয়েছে আর সে ভিত্তি হল ধর্ম। ধর্ম মানুষকে অনুশাসন দেয়, ধর্ম মানুষকে নির্ভরতা দেয়, ধর্ম মানুষকে আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করে অর্থাৎ মানুষ যে পৃথিবীতে জীবনযাপন করবে সেই জীবনযাপনের অধিকার সে ধর্ম থেকে অর্জন করবে। এই অধিকার সে অর্জন করে বিজয়ের সাহায্যে এবং অন্তর্গূঢ় চৈতন্যের সাহায্যে। যদি বিশ্বাস ও অন্তর্গূঢ় চৈতন্য না থাকে তাহলে শিক্ষা শুধু সাধারণ অবস্থায় নির্বাসিত হবে এবং সেই শিক্ষার দ্বারা একটি জাতি কখনও উপকৃত হবে না।

নৈতিক মূল্যবোধ মানবাধিকার রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, The most sever problem appears, if moral issues are not discussed in class. If you use a proper approach, moral education is a powerful way to promote human right, global understanding and personal groth of young people. They have to be exposed to see how moral issues intersect their lives and the lives of millions of people in history and in the current world.[352] নৈতিক শিক্ষা মানুষের জীবনকে উজ্জীবীত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, A better course seemed to be to help young people learn the skills of moral reasoning and responsible decision making that would enable them to lead more personally satisfying and socially constructive lives.[353] নৈতিকতার সমন্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা না হলে তা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, As many schools attempted to ignore the moral dimension of schooling; three things happened; Achievement scores began to decline, discipline and behaviour problems increased; and voices were raised accusing the schools of teaching secular humanism.[354]

ধর্মীয় মূল্যবোধবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা মানবসমাজ তথা পৃথিবীর তেমন কোন উপকারে আসে না। মহাকবি মিল্টন শিক্ষার উদ্দেশ্য ও দর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন: "Education is a continuous process through which mental, physical and moral training is provided to new generation who also acquire their ideals and culture through it." বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে শান্তিও সংস্কৃতি গড়ে তোলার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হচ্ছে: 'পৃথিবীর শিশুদের জন্য শান্তি ও সংঘাতহীন সংস্কৃতির জাতিসংঘ দশকের আহবান। এ ছাড়া একুশ শতকের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন 'জ্যাক ফলর কমিশন,১৯৯৬" এ ব্যাপারে সজাগ হয়েই বলেছে, আমরা আমাদের শিশু ও যুবকদের শুধু জ্ঞাত (To know) ও করতে (To do) শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত হব না আমরা অবশ্যই তাদেরকে 'বিকশিত শিক্ষা (To be) এবং 'মিলেমিশে বসবাস করতে শেখা (To live together) এর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলব'[৩৫৫]

এ প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক নেতা দালাইলামা তার এক বক্তব্যে বলেন:

It is not enough to make noisy calls to halt moral degeneration; we must do something about it. Since present-day governments do not shoulder such 'religious' responsibilities, humanitarian and religious leaders must strengthen the existing civic, social, cultural,

---

352 http:///www.garvardchubfinaland.com/ hellhama.htm
353 http:///www.hi-ho-w.JP/taku77/refer/kirsch.htm
354 http://education.stateuniversity.com/pages/2246/moral-Education.html
৩৫৫ আবু হামিদ লতিফ, শিক্ষা শিখন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাবি, পৃ: ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

educational, and religious organizations to revive human and spiritual values. Where necessary, we must create new organizations to achieve these goals. Only in so doing can we hope to create a more stable basis for world peace.

Living in society, we should share the sufferings of our fellow citizens and practise compassion and tolerance not only towards our loved ones but also towards our enemies. This is the test of our moral strength. We must set an example by our own practice, for we cannot hope to convince others of the value of religion by mere words. We must live up to the same high standards of integrity and sacrifice that we ask of others. The ultimate purpose of all religions is to serve and benefit humanity. This is why it is so important that religion always be used to effect the happiness and peace of all beings and not merely to convert others.

Still, in religion there are no national boundaries. A religion can and should be used by any people or person who finds it beneficial. What is important for each seeker is to choose a religion that is most suitable to himself or herself. But, the embracing of a particular religion does not mean the rejection of another religion or one's own community. In fact, it is important that those who embrace a religion should not cut themselves off from their own society; they should continue to live within their own community and in harmony with its members. By escaping from your own community, you cannot benefit others, whereas benefiting others is actually the basic aim of religion.[356]

নৈতিকতার মূল উৎস হচ্ছে ধর্ম। সঙ্গত কারণেই নৈতিক গুণাবলীর পরিস্ফুটন ঘটানোর জন্য ধর্মের কাছেই আসতে হবে। নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের এক বিশাল অংশের অভিমত এই যে, জীবন সংগ্রামের এক পর্যায়ে মানবসভ্যতার বিকাশ ঘটে। আর এই সভ্য মানুষ তার জীবনকে কল্যাণমুখী, সুন্দর ও সুখী করার জন্য জীবনে চলার পথ হিসেবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-বিধানের প্রবর্তন করে এবং সেগুলো পালন করতে শুরু করে। আবার সৃষ্টির শুরুতেই মানুষকে তার চলার পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে, এমন ধর্মতাত্ত্বিক মতও রয়েছে। তবে ব্যাপারটা যাই হোক, সেই আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত উদ্ভূত বা আবির্ভূত সকল ধর্মই মানুষকে তার দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে 'মুক্তির' পথ দেখাতে চেষ্টা করেছে। এই মুক্তি লাভের জন্য বিশ্বের প্রতিটি ধর্মই নৈতিকতার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। বিশ্বের সব ধর্মই সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং পাপ ও অন্যায় কর্ম বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে।[৩৫৭] এ প্রসঙ্গে আমরা কতকগুলো ধর্মের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

মানুষ নিজেই তার দুঃখ-কষ্ট এবং সুখ ভোগের জন্য দায়ী। সৎকর্ম তাকে পরিণামে সুখী করে আর অন্যায় ও অপকর্ম পরিণামে তার জন্য ডেকে আনে দুঃখ, কষ্ট আর অশান্তি। ব্যাপারটা প্রাচীন শীনতো ধর্মে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে: The cause of suffering ultimately lies in man' কনফিউসিয়াস শ্রেষ্ঠ মানুষের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাকে সৎ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। উদারচিত্তে তাকে পরিবার, সমাজ ও বিশ্বশান্তির মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। Lao Tzo পাঁচটি অসাধু কাজ বর্জনীয় এবং দশটি মানবিক ও কল্যাণমুখী কাজকে বাঞ্ছনীয় ঘোষণা করেন। জরথুষ্ট্র বলেন, আহুরামাজদা (ঈশ্বর)-কে ভালবাসতে চাইলে জগৎ মাঝে সদাচারীকে ভালবাসো। কারণ, সৎ ব্যক্তিই জগৎ মাঝে ঈশ্বরের প্রতিভূ। জৈনগণ মানব মুক্তির জন্য সত্য, জ্ঞান এবং চরিত্র- এই ত্রিরত্নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। হিন্দুধর্মে আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযম অর্জন করার সাথে সাথে রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ-এই চারটি পথের মাধ্যমে মুক্তি লাভের কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্মোপলব্ধিকে এখানে চরম লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কঠ উপনিষেদে বলা হয়েছে: 'যে নিজেকে পাপ থেকে বিরত রাখে না এবং যার মন প্রশান্ত নয়, তার ব্রাহ্মোপলব্ধি হবে না।' গৌতম বুদ্ধ মানুষের মুক্তি বা নির্বাণ লাভের জন্য আটটি মার্গ বা পথের নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন- বাকসংযম করা, সংযত আচরণ, সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদি। বৌদ্ধগণ তাঁদের মৈত্রীসূত্রের মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা করতে শেখায়: 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অহং

[356] http://www.dalailama.com/messages/world-peace/a-human-approach-to-peace

[৩৫৭] মোঃ জুলফিকার আলী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনবিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১/পৌষ ১৪০৮, পৃ: ১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

অবেরা হোন্ত, অব্যপজঝা হোন্ত, অনীঘা হোন্ত, সুখী অত্তানং পরিহরন্ত। অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালযাপন করুক। খ্রিস্টধর্মে বলা হয়েছে যে, তোমরা একে অপরের প্রতি সদয় হও,, একে অপরকে ক্ষমা কর যেমন- ঈশ্বর যীশুখ্রিস্টের খাতিরে তোমাদের ক্ষমা করেছেন। গুরুনানক বলতেন, অস্ত্র দিয়ে নয় বরং ঈশ্বরের বাণী এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা দিয়েই সবকিছু জয় করা সম্ভব।[৩৫৮] হিংসা বিদ্বেষ দূর করে ধর্ম মানুষকে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। তাই ধর্ম নয় বরং অধর্ম এবং ধর্মান্ধতাই মানুষকে করে তোলে স্বার্থপর ও সংকীর্ণমনা, রোপণ করে সভ্যতাধ্বংসের বীজ। তাই মানবকল্যাণ সাধনকারী ধর্মীয় অঙ্গীকারের সংরক্ষণ এবং মানবীয় সভ্যতার ধ্বংসকারী ধর্মীয় নির্বিচারদাতা এবং ধর্মীয় উন্মাদনার বিলোপ সাধনই আমাদের কাম্য। কেবল নৈতিক শিক্ষাই নয়, মনস্তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক কারণেও ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেবল পেট ভরলেই মানুষের চলে না, তার মনের দাবিও মেটানো চাই। প্রবাদ আছে; Man can not live by bread alone. কখনও কোনো সসীম মন অজ্ঞাত এক অধ্যাত্মা অসীমের সাথে মিলে-মিশে একাকার হতে চায়। তাছাড়া, বিপদ-আপদ এবং উপায়হীন অসহায় অবস্থায় যে অধ্যাত্মা অজ্ঞাত শক্তির উপর বিশ্বাস ও আস্থার মানুষ খুঁজে পায় সান্তনা আর বেঁচে থাকার প্রাণশক্তি তাকে সে অবহেলা করতে পারে না। Robert H. Thouless তাই আবিষ্কার করেন ধর্মের এক জোরালো মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। সাম্প্রতিক কালের আমেরিকান প্রয়োগবাদী দার্শনিক William James এর কথা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, I belive in God, not because I have experienced his presence, but I need it, so that it must be truth. শোনা যায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা প্রত্যয় প্রচলিত ছিলঃ We have faith in God but keep our powder dry. গোলাবারুদ শুকনো রেখে যুদ্ধে যাবার যাবতীয় বাস্তবসম্মত পরিস্থিতি পুরোমাত্রায় তৈরি রেখে যদি মনের জোরটাও খানিকটা বাড়িয়ে নেবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখা হয় তাহলে বিজয়ের নিশ্চয়তার ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়।[৩৫৯]

বিখ্যাত কয়েকজন মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান

Jean Piaget is among the first psychologists whose work remains directly relevant to contemporary theories of moral development. In his early writing, he focused specifically on the moral lives of children, studying the way children play games in order to learn more about children's beliefs about right and wrong(1932/65). According to Piaget, all development emerges from action; that is to say, individuals construct and reconstruct their knowledge of the world as a result of interactions with the environment. Based on his observations of children's application of rules when playing, Piaget determined that morality, too, can be considered a developmental process. For example, Ben, a ten year old studied by Piaget, provided the following critique of a rule made-up by a child playing marbles: "it isn't a rule! It's a wrong rule because it's outside of the rules. A fair rule is one that is in the game". Ben believed in the absolute and intrinsic truth of the rules, characteristic of early moral reasoning. In contrast, Vua, aged thirteen, illustrates an understanding of the reasoning behind the application of rules, characteristic of later moral thinking. When asked to consider the fairness of a made-up rule compared to a traditional rule, Vua replied "It is just as fair because the marbles are far apart"(making the game equally difficult).

In addition to examining children's understanding of rules about games, Piaget interviewed children regarding acts such as stealing and lying. When asked what a lie is, younger children consistently answered that they are "naughty words". When asked why they should not lie, younger children could rarely explain beyond the forbidden nature of the act: "because it is a naughty word". However, older children were able to explain "because it isn't right", and "it wasn't true". Even older children indicated an awareness of

[৩৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।
[৩৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

intention as relevant to the meaning of an act: "A lie is when you deceive someone else. To make a mistake is when you make a mistake". From his observations, Piaget concluded that children begin in a "heteronomous" stage of moral reasoning, characterized by a strict adherence to rules and duties, and obedience to authority.[360]

মনোবিজ্ঞানী Piaget নৈতিক শিক্ষা প্রদানে স্কুলের গুরুত্বের কথা বলেন:

Piaget concluded from this work that schools should emphasize cooperative decision-making and problem solving, nurturing moral development by requiring students to work out common rules based on fairness. This is a direct rejection of sociologists Emile Durkheim's view of proper moral education (1925/1961). Durkheim, similar to Piaget, believed that morality resulted from social interaction or immersion in a group. However, Durkheim believed moral development was a natural result of attachment to the group, an attachment which manifests itself in a respect for the symbols, rules, and authority of that group. Piaget rejected this belief that children simply learn and internalize the norms for a group; he believed individuals define morality individually through their struggles to arrive at fair solutions. Given this view, Piaget suggested that a classroom teacher perform a difficult task: the educator must provide students with opportunities for personal discovery through problem solving, rather than indoctrinating students with norms.[361]

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী Kohlberg বলেন, শিক্ষকরাই সরাসরি নৈতিক শিক্ষা প্রদানে বেশি সহায়ক: 466243

Kohlberg used these findings to reject traditional character education practices. These approaches are premised in the idea that virtues and vices are the basis to moral behavior, or that moral character is comprised of a "bag of virtues", such as honesty, kindness, patience, strength, etc. According to the traditional approach, teachers are to teach these virtues through example and direct communication of convictions, by giving students an opportunity to practice these virtues, and by rewarding their expression. However, critiques of the traditional approach find flaws inherent in this model. This approach provides no guiding principle for defining what virtues are worthy of espousal, and wrongly assumes a community consensus on what are considered "positive values". In fact, teachers often end up arbitrarily imposing certain values depending upon their societal, cultural, and personal beliefs. In order to address this issue of ethical relativity, some have adopted the values-clarification approach to moral education. This teaching practice is based on the assumption that there are no single, correct answers to ethical dilemmas, but that there is value in holding clear views and acting accordingly. In addition, there is a value of toleration of divergent views. It follows, then, that the teacher's role is one of discussion moderator, with the goal of teaching merely that people hold different values; the teacher does attempt to present her views as the "right" views.[362]

নৈতিক শিক্ষার সুদূর প্রসারী লক্ষ্য ও প্রভাব বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে তার মূল্যায়ন হচ্ছে:

The goal of moral education, it then follows, is to encourage individuals to develop to the next stage of moral reasoning. Initial educational efforts employing Kohlberg's theory were grounded in basic Piagetian assumptions of cognitive development. Development, in

---

[360] http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/overview.html
[361] http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/overview.html
[362] http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/overview.html

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

this model, is not merely the result of gaining more knowledge, but rather consists of a sequence of qualitative changes in the way an individual thinks. Within any stage of development, thought is organized according to the constraints of that stage. An individual then interacts with the environment according to their basic understandings of the environment. However, the child will at some point encounter information which does not fit into their world view, forcing the child to adjust their view to accommodate this new information. This process is called equilibration, and it is through equilibration that development occurs. Early moral development approaches to education, therefore, sought to force students to ponder contradiction inherent to their present level of moral reasoning.[363]

অপর বিজ্ঞানী Domain নৈতিক শিক্ষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার মতামত তুলে ধরেছেন এভাবে: The implications of domain theory for values education are several. First, the identification of a domain of moral cognition that is tied to the inherent features of human social interaction means that moral education may be grounded in universal concerns for fairness and human welfare, and is not limited to the particular conventions or norms of a given community or school district. By focusing on those universal features of human moral understanding, public schools may engage in fostering children's morality without being accused of promoting a particular religion, and without undercutting the basic moral core of all major religious systems.

A related function of the teacher would be to focus student activity (verbal or written) on the underlying features concordant with the domain of the issue. Thus, students dealing with a moral issue would be directed to focus on the underlying justice or human welfare considerations of the episode. With respect to conventions, the focus of student activity would be on the role of social expectations and the social organizational functions of such social norms.[364]

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞান নৈতিকতার জন্য নিম্নোক্ত উপাদাগুলো প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। A moral orientation based on justice was proposed as more prevalent among boys because their attachment relations with the mother, and subsequent masculine identity formation entailed that boys separate from that relationship and individuate from the mother. For boys, this separation also heightens their awareness of the difference in power relations between themselves and the adult, and hence engenders an intense set of concerns over inequalities. Girls, however, because of their continued attachment to their mothers, are not as keenly aware of such inequalities, and are, hence, less concerned with fairness as an issue. Further research has suggested, however, that moral reasoning does not follow the distinct gender lines which Gilligan originally reported. The preponderance of evidence is that both males and females reason based on justice and care. While this gender debate is unsettled, Gilligan's work has contributed to an increased awareness that care is an integral component of moral reasoning.[365]

---

[363] http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/overview.html
[364] http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/overview.html
[365] http://tigger.uic.edu/~lnucci/MoralEd/overview.html

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি

বেগম রোকেয়া সর্বপ্রকার শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ১৯২৯ সালে তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় কলকাতায় 'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি বলেছিলেন: Our girls should not only obtain university degrees, but must be ideal daughters, wives and mothers of I may say obedient daughters, loving sisters, dutiful wives and instructive mothers. তিনি তার ছাত্রী ও সহকর্মীদের ঠিক এভাবেই গড়ে তোলেন। তিনি সর্বপ্রকার শিক্ষা বিশেষত, তাফসিরসহ কোরআন পাঠ থেকে শুরু করে ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, ফারসি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গার্হস্থ্য পরিচালনা, রান্না, সেলাই, সন্তান লালন-পালন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে মেয়েদের শিক্ষার আয়োজন করেন। তাঁর প্রবর্তিত এ শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তৎকালীন লেডি জ্যাকসন মন্তব্য করেছিলেন: The girls here are not merely given an education of a scholastic type, but are given religious instruction and practical training which will fill them to be good house wives and capable mothers and families[366]

বেগম রোকেয়া বাংলা ও নিখিল ভারত পর্যায়ে এক সংগ্রামী সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করেন। নারীসমাজের মধ্যে দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, দক্ষ নেতৃত্বের গুণাবলি সৃষ্টি এবং সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার সচেতনতা করে গড়ে তোলা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর ইসলাম নির্ধারিত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯১৬ সালে তিনি 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই মুসলিম মহিলাদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম সংগঠন। এর কার্যক্রম ছিল দরিদ্র বালিকাদের শিক্ষা প্রদান, আশ্রয়হীন মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কুটিরশিল্প স্থাপন, মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা, অজ্ঞ ও অশিক্ষিতদের শিশুপালন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞানদান এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়। রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র ছিল এই আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম। নারী জাতিকে সংগঠিত করার মানসে তিনি বিভিন্ন সংগঠন ও সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'নারীতীর্থ সংস্থা' নিখিল ভারত মুসলিম সমিতি, বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশনাল কনফারেন্স প্রভৃতি সংস্থার আজীবন-সদস্য ছিলেন।[৩৬৭] ধর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তবতাকে আজ সবাই স্বীকার করে নিচ্ছে এবং যথাযথ সম্মান দিচ্ছে। অক্সফোর্ড এবং ক্যাম্ব্রিজ সহ পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় সমুহে Theology কিংবা Relegious Studies বিদ্যমান।

Religion being a panacea of all evils all countries of the world give due respect to it. For example, in East London if you desire, to say prayer, the people of those places will give necessary permission to do so. In England and Wales religious education has been made compulsory and that is a necessity. To solve the manifold problems at primary level, England needs good people which is possible through religious education and practices, In Oxford, Cambridge or any other universities of the world religious studies are given due respect. Theology is a respectable subject there.[368]

মুসলিম দেশের শিক্ষানীতি ধর্মভিত্তিক হওয়া উচিত বলে মক্কা ঘোষণায়[৩৬৯] আমরা দেখতে পাই:

In 1981 the third world conference was held at Makkah on 'Muslim Education' The decision taken there is known as Mecca Declaration. In that declaration it was stated that Muslim education is seriously deteriorated which must be restored to.[370]

---

৩৬৬ মোঃ নুরুল ইসলাম* মোঃ নুরুল ইসলাম**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা: ৭৬, আষাঢ় ১৪১০, জানুয়ারি ২০০৩,পৃ: ১৪৩।

৩৬৭ মোঃ নুরুল ইসলাম* মোঃ নুরুল ইসলাম**, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা: ৭৬, আষাঢ় ১৪১০, জানুয়ারি ২০০৩,পৃ: ১৪৩-১৪৫।

৩৬৮ Islamization of Academic Disciplines, BIIT, Edited by M. Zohurul Islam FCA, Page-14.

৩৬৯ মুসলিম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি বা রূপরেখা কি হওয়া উচিত, সেটি পবিত্র মক্কা নগরিতে Organization of Islamic Conferrence (OIC) এর তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনের (২৫-২৮ জানুয়ারী-১৯৮১) এক ঘোষণায় বিদৃত হয় যা মক্কা ঘোষণা নামে পরিচিত। ঐ সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি শিক্ষা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ মতৈক্য উপনিত হন। এগুলো হলো: (ক) মুসলিম সংস্কৃতিকে সুসংহত করা (খ) নৈতিক গুণের বিকাশ ঘটিয়ে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করা। (গ) ইসলামের নীতি ও আদর্শকে মুসলিম জাহান তথা সারাবিশ্বে প্রচার করা।

370 Islamization of Academic Disciplines, BIIT, Edited by M. Zohurul Islam FCA, Page-14.

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মের সম্পৃক্ততা অনেক পুরানো। প্রাচীনকালে বৌদ্ধ-শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি হিন্দু-শিক্ষাব্যবস্থা কাজ করে এসেছে। সেখানে মূলত বৌদ্ধ ধর্মের নীতি শিক্ষার উপর এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। নীতিগুলো ছিল সৎচিন্তা, সৎকার্য, সৎবাক্য, সৎউপার্জন, সৎস্মৃতি, সৎধ্যান, সৎপ্রচেষ্টা এই আটটি উপায়ে তারা মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই ঐতিহ্য, এই ইতিহাস, এই সত্য নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে শিক্ষাব্যবস্থার শুরু নৈতিক শিক্ষা দিয়ে, তা আজ বিফল হচ্ছে কেন? গোটা জাতিকে যে শিক্ষাব্যবস্থা সঠিক পথ দেখাতে পারে, তা বিফলই বলতে হবে, কিন্তু কেন? কবিগুরু বলেছেন:

হে মোর দুর্ভাগা দেশ
যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে
তাহাদের সবার সমান।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ডাকে গড়িছে সে গোড় ব্যবধান
অপমানে হতে হবে
তাহাদের সবার সমান।[৩৭১]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিক উন্নতির জন্য কোন ধরনের কর্মসূচি বেশি কার্যকরী সে সম্পর্কে বলা হয়েছে:

The second point is that any program of moral instruction from kindergarten to graduate school must first ask how character is formed by educational institutions. This point can be made most forcefully by returning to the example of ethics courses in business schools. People who enroll in business programs often do so because they wish to make money. An interest in profit is not inherently dishonorable. However, every interest has its form of excess which is its characteristic vice. The vice of the interest in profit is greed[372]

আগে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মার উন্নতি সাধন, শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন। তখন বিজ্ঞান এত উন্নতি লাভ করে নাই। সমাজ সহজ-সরল ছিল। কিন্তু এখন মানুষ উন্নতি করেছে। বিজ্ঞান উন্নতি করেছে বলেই কি আমরা এই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি। আত্মার উন্নতি সাধন শিক্ষার মূল হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন মেইন হওয়া উচিত। মানুষকে যদি মনুষ্যত্ব দিয়ে গড়ে তুলতে নাই পারি সে শিক্ষা শিক্ষা নয়। সুতরাং আমার মনে হয় সবাইকে শিক্ষা দিতে হবে। ভালো শিক্ষা দিতে হবে, মানসম্মত শিক্ষা দিতে হবে। নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে যেন সে সমাজে মানুষের মতো মানুষ হতে পারে। বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে কিন্তু আত্মার উন্নতির জন্য যা দরকার তার অভাব রয়েছে। এজন্য আমাদের শিক্ষাক্রমে নৈতিক শিক্ষা থাকতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় আছে মাধ্যমিকেও থাকতে হবে। এগুলো পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করতে হবে যাতে এতে নৈতিকতার দিকসমূহ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় চরিত্র গঠনের দিকে।[৩৭৩]

সব ধর্মেই নৈতিকতার উপাদান বিদ্যমান। সমাজ ও রাষ্ট্রকে কলুষমুক্ত করার প্রয়াসে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী এবং এসব মানুষের মধ্যে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করতে হলে নৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামের যেসব শিক্ষা আছে সেগুলো শিক্ষা দেওয়া এবং অন্যান্য ধর্মের যারা অনুসারী তারাও যদি তাদের ধর্মের নৈতিকতাগুলোকে আঁকড়ে ধরেন, তাহলে আমাদের সমস্যার অর্ধেক সমাধান হয়তো আমরা অর্জন করতে পারব।[৩৭৪] পাশ্চাত্যবিশ্বে গবেষণার অন্যতম বিষয়, বিশেষ করে অর্থনীতিশাস্ত্রে গবেষণার অন্যতম বিষয় হচ্ছে মরাল হ্যাজার্ডস-এর প্রবলেম। ইকোনমিক ট্রানজ্যাকশন্স-এর দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়ত এই মরাল হ্যাজার্ড-এর প্রবলেমের সম্মুখীন হই। মাছ বিক্রেতা আপনার কাছে পচা মাছ বিক্রয় করল কি-না, কিংবা ভেজাল দেওয়া দ্রব্য

[৩৭১] হাসনা বেগম, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমি পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা, সুশিক্ষাবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ২০০৩, মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ: ৪৫-৪৬।
[372] http://epaa.asu.edu/epaa/v1n13.html
[৩৭৩] হাসনা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২-৫৩।
[৩৭৪] হাসনা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ী বিক্রয় করল কি-না, এইরকম হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হই আমরা এবং সেইজন্যই নৈতিকতার এই যে সমস্যা, এই সমস্যা কীভাবে অতিক্রম করা যায়, সেই সম্পর্কে আজকে প্রশ্ন উঠেছে। যে কারণে ২০০১ সালের নোবেল পুরস্কার কিন্তু অর্থনীতির নৈতিকতা বিষয়েই দেওয়া হয়েছে। তারা বলছেন, যদি ইনফরমেশনের মধ্যে সিমেট্রি থাকে অর্থাৎ লেন-দেনকারী দু'পক্ষের মধ্যে যদি পারফেক্ট ইনফরমেশন থাকে, তাহলে এই মরাল হ্যাজার্ডস-এর প্রবলেম অ্যারাইজ করবে না। কিন্তু কেউ হলফ করে বলতে পারবে না, যিনি বিক্রেতা এবং যিনি ক্রেতা, এই দুই পক্ষেরই যে পণ্য বিনিময় হচ্ছে, এই সম্পর্কে দুজনেরই সমান তথ্য বা সমান ইনফরমেশন আছে। সুতরাং এই সমস্যাটি থেকেই যাবে।[৩৭৫] চরিত্র এবং মূল্যবোধ একটি অপরটির পরিপূরক। চারিত্রিক দৃঢ়তাই নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে তোলে।

The terms "character" and "values" are linked to intuitively differing views about how character and values are formed and how they are changed. Character is formed, inculcated, or molded. It is harder to think of values as formed or shaped. Talk about character is more intimately associated with training. If we think that character is central, we will want to be careful about the habits children form, and we will be sensitive to the long- term consequences of the influences that we expose them to. [376]

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION এর ALUMNI Prof. Klaus ও Prof. Sinikka তাদের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনাটি নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

Lawrence Kohlberg (1927-1987), professor of education and social psychology at the Harvard Graduate School of Education, had an immense influence on the theory and practice of moral education worldwide. His cognitive-developmental theory of stages of moral reasoning served as a basis of numerous moral curricula in schools. Kohlberg gave a new meaning to John Dewey's view that development is the aim of education. He argued that education for development through the moral stages was education for justice in a culturally universal sense. According to him, this kind of education was not indoctrinate, because it stimulated reasoning through a culturally universal sequence of structures rather than transmitting arbitrary cultural content of values. In his later work, Kohlberg complemented this stage approach by an emphasis on participation in just communities, and saw the moral atmosphere of groups and institutions as an essential ingredient in moral action.[377] আমেরিকার পাঠ্যসূচিতে কীভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উপাদান সংযুক্ত করা হয়েছে, তা তাদের এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়।

What kind of moral and ethics education does make sense at school or at the workplace?

Sinikka: Moral education might sound weird in the Finnish ears. When I found moral education courses at Harvard Graduate School 1976-77 Catalogue these headings surprised me. Coming from a Lutheran country and having just experienced quite stormy years of student radicalism with its atheistic connotations, the courses looked suspicious. I was more interested in history teaching, mass media and cultural anthropology.

When I look back to my studies at Harvard, it was a big mistake not to take those moral education courses, because quite soon I was confronted by the ethical issues of the teaching of American history. Between the years 1965 -1975 a remarkable educational revolution happened at schools and at the universities in the United States in regards to the

[৩৭৫] হাসনা বেগম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫।

[376] http://epaa.asu.edu/epaa/v1n13.html

[377] http://epaa.asu.edu/epaa/v1n13.html

Dhaka University Institutional Repository

content and the methods of teaching. Ethical questioning was one of the leading themes of this upheaval. Americans, especially young people, questioned the policies of their government. The war in Vietnam and the Watergate scandal made them wonder what is right and what is wrong.

My best teacher at HGSE was the great humanist Professor Donald Oliver. In his class there were no easy truths. We discussed enthusiastically about moral issues, but they were never labeled as "moral". He gave us a challenging and difficult syllabus. When it was discussed in class, he always pushed everybody to reconsider his or her answers. Moral was contextual and you had to relate moral to history or society. Dr. Oliver was famous for his "Harvard High School History Project". He and his workmates published a series of booklets which represented the best ideas of critical thinking, problem solving, empathy and ethics. His friend Dr. Fred Erickson taught us in his cultural anthropology class to be sensitive to every day morality, and especially to understand how racism appeared in many schools and many classes. We saw examples of the hidden curriculum when we analyzed videotaped sessions of school counselors and ordinary teachers. They spoke nice words to their students, but non-verbal communication revealed their true thoughts.

Prof. Klaus তার দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকশিক্ষা কে বিশ্লেষণ করেন এভাবে:

Moral education has always sounded a bit weird in my ears, too. I came to the HGSE in order to learn more about Kohlberg's cognitive-developmental theory of morality, first at a workshop for scoring Kohlberg's moral judgment interview in the summer of 1975, and then as his doctoral student for the academic year 1979-80. However, it was not morality in the first place that was my main reason for coming to stay with Kohlberg, but the beauty of his theory. As a social psychologist, I was interested in the way individuals organize their knowledge of the social world (my Master's thesis dealt with theories of attitude organization). When looking for a topic of a doctoral thesis, I ran across Kohlberg's notion of equilibration of socio-cognitive structures, and got fascinated by it. Morality and moral education, then, came in the bargain.

Since the moral education curriculum in the Finnish schools is based on human rights, Kohlberg's ideas of education for justice have found a fertile soil here. At least in the teaching of philosophy of life (that replaces religion for those who do not belong to the Lutheran or Greek Orthodox state churches), Kohlberg's framework has dominated the curriculum. This is illustrated by the fact that a few years ago, there was a public dispute over the question of whether you could pass the matriculation exam without being familiar with Kohlberg's famous Heinz dilemma! For my part, I have started wondering whether our emphasis on promoting moral problem solving skills through dilemma discussions is too one-sided. Morality also means self-control, which is not acquired by discussing conflicting values but through participation in groups and social institutions. In the end, morality is always looking for a balance between problem-solving or justice and self-control or willpower.

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ পরিস্থিতির বিচার নৈতিকতার বিধি বিধানকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হয়। তিনি বলেন:

I think you need both training that says: "Here are the (moral) rules that you must follow (e.g., don't steal, don't lie, help other people)" and training that says: "Moral rules could sometimes clash with one another, and you might one day be faced with a situation where you have to decide whether it would be right to lie to save a friend's life". But how much training of each type is needed cannot be decided *in abstracto* but depends on the concrete circumstances at hand.

নৈতিকতা শিক্ষা যে সর্বোত্তম এবং তা যুবসমাজের জন্য বেশি কার্যকর তার তার কথায় বেশি স্পষ্ট হয়:

As a history teacher I have to rely on the truth which is revealed by historical research. It is really difficult to differentiate morality and politics. This makes history teaching a wonderful profession: you are able to argue and to debate with the young people and to help them to see wider perspectives. It is moral education at its best.

সাধারণ মানুষের কাছে নৈতিকতার গুরুত্ব কেমন তার ব্যবস্থা করতে গিয়ে Prof. Klaus বলেন:

Historically, I think that morality has been gradually detaching itself from religion and approached politics, at least in the West. When the Association for Moral Education held its annual meeting in November 2004 in California soon after the presidential elections, I was struck by the finding that a high number of people regarded their voting decision as an obvious moral choice. My feeling is that you could find a universal core in morality, something like the Golden Rule, which far too easily gets buried under religious fanaticism or political expediency. But still I wonder what I should say if I were a history teacher and my students asked my whether it was morally right for Brutus and Cassius to kill Caesar or for President Bush to invade Iraq, to preserve or promote democracy. Or what to say to business people who inquire whether it is morally right to bribe officials in a country in which you could not otherwise sell any of your products.

নৈতিকতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করার উপায় ও বাস্তবতা সম্পর্কে Prof. Sinikka-এর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে:

The most severe problem appears, if moral issues are not discussed in class. Some educators are afraid of brainwashing, but if you use a proper approach moral education is a powerful way to promote human rights, global understanding and personal growth of young people. They have to be exposed to see how moral issues intersect their lives and the lives of millions of people in history and in the current world.

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে হিপোক্রেটিসের নীতিমালায় (যা হিপোক্রেটিসের শপথ নামে পরিচিত) নৈতিকতার যেসব উপাদান পাওয়া যায় তা হলো- দেবতাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এতে একজন চিকিৎসক জানান যে তার চিকিৎসা শিক্ষাগুরু নিজ মাতাপিতার মতোই পূজনীয় এবং গুরুর সন্তানকে তিনি নিজ ভ্রাতার মতোই মনে করবেন। এছাড়া নিজ সন্তান, গুরুর সন্তান কিংবা অন্য কোন শিষ্যকে তিনি, আর্থিক বা অন্য কোন পারিতোষিক ব্যতিরেকেই সম্ভাব্য সকল পদ্ধতির সহায়তায় এই বিদ্যা শিক্ষা দান করবেন শুধু এই শর্তে যে তারা চিকিৎসাবিদ্যার নীতি-নিয়ম মেনে চলবার শপথ নেবেন। যারা এই শপথ নেবে না তাদের তিনি শিক্ষা দান করবেন না। তার লক্ষ্য হবে শুধু রোগীর উপকার। ক্ষতিকর বা সন্দেহজনক যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকবেন। মৃত্যুর কারণ ঘটতে পারে এমন কোন ওষুধ বা উপদেশ দান থেকে তিনি বিরত থাকবেন, নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত ঘটতে পারে এমন কোনো কিছু তিনি প্রয়োগ করবেন না। যে-কোনো গৃহেই তিনি যান না কেন তা হবে শুধু অসুস্থ লোকের সেবার জন্য; কোনো অন্যায় বা দুর্নীতি তিনি পরিহার করবেন এবং নৈতিকভাবে অশোভন কাজ থেকে বিরত থাকবেন। এক্ষেত্রে তিনি দাস বা মুক্ত নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য করবেন না। দায়িত্ব পালনে পেশাগত

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসক অবশ্যই প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা বজায় রাখবেন।[৩৭৮] শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে এই শপথ চিকিৎসা শিক্ষার্থীদের নৈতিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে যদিও আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়ার বিষয়টি এখন সারাবিশ্বে খুব কম পালিত হয়, বাংলাদেশেও তাই। এই শপথের আলোকে এখন আরো গড়ে উঠেছে আরো কিছু নীতিমালা যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Declaration of Geneva, International Code of Medical Ethics & Canons of American Medical Association. এগুলোর সবকটিতেই রয়েছে হিপোক্রেটিসের নীতিমালার ছায়া।[৩৭৯] বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে কি? প্রশ্নটি আরো একটু স্পষ্ট করলে দাঁড়ায়: বর্তমানে বাংলাদেশে চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে মোটের উপর যে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র রয়েছে তার একটি প্রধান কারণ কি এই যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন ছাত্রকে শুধুমাত্র যান্ত্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং সত্যিকার মানবিক গুণসম্পন্ন একজন সংবেদনশীল চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলা হয় না। সাধারণভাবে দেখলে কথাটা ঠিক। আমাদের চিকিৎসা শিক্ষা পাঠ্যক্রমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতহাস নিতান্তই একটি গৌণ বিষয়, হিপোক্রেটিসের শপথ কমিউনিটি মেডিসিন কিংবা মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্সের কোনো কোনো গ্রন্থে থাকে কিন্তু পরীক্ষায় তেমন গুরুত্ব নেই বলে এগুলোর প্রতি খুব একটা মনোযোগ শিক্ষার্থীরা দেয় না। এদেশে নিয়মিত গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান হয় না, শপথ নেওয়ার বিষয়টিও তাই কোনো আইনগত বা প্রথাগত বাধ্যবাধকতা নয়। পাঠ্যক্রম বিংবা ব্যবহারিক শিক্ষাকালেও কোনোভাবেই শিক্ষার্থীদের নৈতিক স্বাস্থ্য বিকাশের কোন সমন্বিত প্রয়াস আমাদের চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় না। এই তথ্য কাউকে উৎসাহিত করতে পারে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তাহলে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো দরকার- এই কার্যক্রমে শুধু চিকিৎসক নয়, আদর্শবান মানুষ তৈরির জন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।[৩৮০]

হিব্রু-সিভিলাইজেশনের দিকে যদি আমরা তাকাই তবে দেখব, চিকিৎসকের স্থান কোথায়? চিকিৎসক নিয়ে ইংরেজিতে একটি কবিতাও আছে। তার বাংলা অনুবাদ এরূপ: চিকিৎসককে সম্মান করো, কারণ তিনি বিধাতার সৃষ্টি। অতি উঁচুতে যার স্থান সেই হতে পারে চিকিৎসক। কুশলী চিকিৎসকের মাথা সবসময়ই উঁচু থাকে, আর মহৎ মানুষের সমাগমেও তাঁকে ধন্য মনে হয়।' কিন্তু আজকের দিনে একজন চিকিৎসককে আমরা এইভাবে সম্মানিত হতে দেখি কি না সে-কথা অবশ্যই চিন্তার ব্যাপার। সেই মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন একজন চিকিৎসক, যাকে দেখলেই মানুষের মন শ্রদ্ধায় অবনত হয় সেই পরিস্থিতি আজকে বিরাজ করছে কী?[৩৮১] নৈতিকতা ব্যাপারটি হঠাৎ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আয়ত্ত করা যায় না। মানুষ শিশুকাল থেকেই বিভিন্ন পরিবেশে নৈতিকতার শিক্ষা পেতে পারে এবং তারই প্রতিফলন ঘটে পরবর্তী জীবনে। তাই শিশুকালে নিজের পরিবারে ও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নৈতিকতাবোধ গড়ে তোলার প্রয়াস থাকা উচিত।[৩৮২] উচ্চ নৈতিকতা মূল্যবোধ সম্মিলিত চিকিৎসক গড়ার আগে মূল্যাবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ার বিশেষ প্রয়োজন এবং আমরা যদি মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ সমাজে গড়তে পারি, তবে শুধু উন্নত মূল্যবোধ সম্মিলিত, নৈতিকতা সম্মিলিত চিকিৎসক নয়, সমাজের অন্যান্য পেশায়ও তার প্রতিফলন ঘটবে। সেটা রাজনৈতিক অঙ্গনে বলেন, আর অন্যান্য পেশায় বলেন, সব জায়গায়ই তার প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। সুতরাং আজকে যেটা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে: সমাজে সব জায়গায় নৈতিকতার যে অভাব ঘটছে সে দিকে নজর দেওয়া।[৩৮৩] নৈতিকতা মূল্যবোধের সংমিশ্রণ তখনই সম্ভব হবে যখন শিক্ষার্থী তার সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষা লাভ করবে। এজন্যই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন জরুরি। যাতে ধর্ম ও নৈতিকতার সমন্বয় থাকবে।[৩৮৪]

আমেরিকার পাঠ্যক্রমে ধর্মকে আবশ্যক বিষয় হিসেবে রাখার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়েছে:

Religion must be taken seriously in the public school curriculum, including in moral education, for two fundamental reasons - or families of reasons.
First, there are civic reasons. The American experiment in liberty is built on the conviction that it is possible to find common ground in spite of deep religious differences. It is rooted

---

৩৭৮ লিয়াকত আলী, বাংলদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন; হিপোক্রেটিসের শপথ ও বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষা সুশিক্ষা বর্ষ স্মারক গ্রন্থ-২০০৩, বাংলা একাডেমী ঢাক, সম্পাদক- মনসুর মুসা, পৃ: ১৩৬।

৩৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৬।

৩৮০ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৬-১৩৮।

৩৮১ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৩।

৩৮২ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪০-১৪১।

৩৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৩।

৩৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

in the civic agreement we share as citizens, in our principled commitment to respect one another. Properly understood, this means that we not exclude religious voices from the public square or from public education, but that we take one another seriously. For much of our history, Protestantism enjoyed a favored status in the ceremony, rhetoric, and often in the curriculum and textbooks of public schools. That was unjust; it meant that education didn't take others of different (or no) religious convictions seriously. In the 20th century the curriculum has often excluded religion. In *public schools* this is unjust; it means that we don't take religious people seriously. All sides need to recognize that we cannot resolve the current battles by promoting a particular religion or by excluding all religion from the curriculum.

The civic framework for the role of religion in public schools is provided by the religious liberty clauses of the First Amendment to the U.S. Constitution. For more than 50 years, ever since it first applied the First Amendment to the states, the Supreme Court has held that government, and therefore public schools, must be *neutral* in matters of religion. It is not proper for public schools to take sides on religiously contested questions. We argue that if schools are to be truly neutral they must be truly fair - and this means including in the curriculum religious as well as secular ways of making sense of the world when we disagree. Government may no more inhibit religion than promote it.

Second, as we shall see shortly, there are *educational* reasons for taking religion seriously across the curriculum. A good *liberal* education should expose students to the major ways humanity has developed for making sense of the world - and some of those ways of understanding the world are religious. An exclusively secular education is an illiberal education.[385]

আমাদের দেশে বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সংবিধানের মূল সুরের (sprit) সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির ভেতরে যেন নৈতিক মূল্যবোধ (moral values) এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটে তার জন্য সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যবোধশূন্য (value free) না হয়ে বরং মূল্যবোধ সমৃদ্ধ (value laden) হওয়াই বাঞ্ছনীয়।[৩৮৬] মূলত শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে হবে। যাতে আধুনিক সব জ্ঞানের সাথে ইসলাম তথা ধর্মের সমন্বয় সাধন হয়। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কি মুসলিম উম্মাহর চাহিদা পূরণের উপযোগী? এটা এমন একটা বাস্তবতা যা কেউ অস্বীকার করতে পাওে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম জাতির নতুন বংশধরদের শিক্ষা দীক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয় তা মূলত তাদেরকে জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নয়, জাতিকে ধ্বংস করার জন্যই তৈরি করা হয়। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রদের কে পড়ানো হয় দর্শন, অর্থনীতি আইনশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং এ ধরনের অন্যসব বিদ্যা যার চাহিদা বাজারে আছে। কিন্তু ইসলামী দর্শন, ইসলামী বিজ্ঞানের মৌলিকত্ব, ইসলামী আইন বিজ্ঞান, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ এবং ইসলামের ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শনের বিন্দু বিসর্গও তারা জানতে পারে না। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, তাদের মনমগজে মানবজীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অ-ইসলামী ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর অনৈসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের প্রতিটি বিষয়কে দেখে ও ভাবে তথা দেখতে ও ভাবতে বাধ্য হয়।[৩৮৭]

শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষা দিলে চলবে না। co-curriculler activities এর মাধ্যমেও এসব গুণের সমাহার ঘটাতে হবে। আর তাই বর্তমানে শুধুমাত্র বিষয়গত জ্ঞান চাকরির জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হচ্ছে না। বিষয়গত জ্ঞানের পাশাপাশি প্রকাশভঙ্গি, উপস্থাপনা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, নিজস্ব মূল্যবোধ সর্বোপরি বিশ্ব নাগরিক হওয়ার

---

[385] http://www.gwu.edu/%7Eccps/pop_moral.html

[৩৮৬] আব্দুর রশিদ, সুশিক্ষাবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নঃ ২০০৩ এর আলোকে সুশিক্ষা বর্ষ ঘোষণার ঐতিহাসিক তাৎপর্য, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃঃ ৩৮।

[৩৮৭] মাওলানা মওদুদী, শিক্ষা ব্যবস্থাঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা, পৃঃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষতাও অর্জন করতে হচ্ছে। যাকে কোরস্কিল বা লাইফ স্কিল বলে অভিহিত করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ গুণাবলি অর্জনে ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত কারিকুলামের (hidden curriculum) মাধ্যমে সাহায্য করতে পারে। এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে ছাত্র-শিক্ষকের সুসম্পর্ক, শিক্ষকদের আন্তরিকতা এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[৩৮৮] শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে তার আচরণিক পরিবর্তন সাধন করা। একইসাথে মানুষের চরিত্র গঠন ও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবর্তন এবং প্রসারের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটছে। তার প্রকাশ ঘটে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি সংস্কার এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে।[৩৮৯] আমাদের দেশকে দেশের মানুষকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার সম্প্রসারণ যেমন দরকার, তেমনি দরকার মানসম্পন্ন শিক্ষারও। প্রয়োজন মূল্যবোধের জাগরণ। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন নিবেদিত প্রাণ, দায়িত্বশীল ও উচ্চমূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষকের। শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োজন সুন্দর পরিবেশ। শিক্ষা প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা দরকার। আমাদের শিক্ষাক্রমে নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং একইসাথে শিক্ষাব্যবস্থায় যুগোপযোগী ও লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে।[৩৯০]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তব সম্মত উন্নত নীতি শিক্ষা দিলে তা ব্যবহারিক জীবনে কার্যকর হবে। যদি সেগুলোকে কার্যকর করার মতো সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও মানব পরিস্থিতি দেশে গড়ে তোলা যায়। মনুষ্যত্ব উদ্বোধক শিক্ষার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। মনোবৃত্তির কিংবা মানস-প্রবণতার বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান সামান্য। এই শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের সামাজিক গুণাবলী বিকাশের কিংবা মানবিক করণে (humanization of man in society) প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কোনো সুযোগ শিক্ষক, অভিভাবক, কিংবা ছাত্রদের এজন্য রাখা হয়নি। এজন্যই দেখা যায় যারা সার্টিফিকেটের বিচারে সবচেয়ে শিক্ষিত ও কীর্তিমান, অনেক ক্ষেত্রে নিচতা, হীনতা ও মনুষ্যত্বের অবমাননায়ও তারা সবচেয়ে নিপুণ ও কীর্তিমান।[৩৯১]

বর্তমান বিশ্বে মানবতার এক গভীর সংকট চলছে। এই সংকট খুবই ব্যাপক। আমরা জানি শিক্ষা, নৈতিকতা কিংবা ধর্মের একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না। এটা ইতিহাসে যেমন দেখা গেছে তেমনি বর্তমান আজকের দিনেও এই সত্য প্রযোজ্য। প্রাচীন হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ভারত থেকে খ্রিস্টান বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্ব সবখানেই শিক্ষা ও নৈতিকতা সংযুক্ত ছিল। আজকের দিনে এসে আমাদের মধ্যে তথা সারা বিশ্বে নৈতিক শিক্ষার বড়ই অভাব দেখা যাচ্ছে। এখন শিক্ষা, নৈতিকতা ও ধর্মকে আলাদা আলাদা করে দেখা হচ্ছে। ফলে বিশ্ব সভ্যতার সংকট আরো গভীর আকার ধারণ করছে। এই পৃথকীকরণ কবে থেকে শুরু তা সঠিক না বলা গেলেও একথা বলা যায়, ইউরোপের যুক্তিবাদ (enlightenment) আন্দোলনের ফলেই তা হয়েছে, যা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শুরু হয়। আগে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ধর্মীয় শিক্ষা এবং পেশাগত বিজ্ঞান একত্রে ছিল। পরে ঔপনেবেশিক শাসন আমলে শাসকরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করল যার মধ্যে তারা ইউরোপের সেই নতুন মূল্যবোধ আমাদের শিক্ষার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। যার ফলে যে শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড় করানো হলো তা কোনভাবেই আমাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলোনা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের মূল্যবোধের প্রবেশ ঘটানো হলো।[৩৯২] ধর্মের যথাযথ জ্ঞান এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই মুসলিম বিশ্বের বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী। মুসলিম দেশগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে নিয়ে সমষ্টিগতভাবে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অথচ ধর্মীয় শিক্ষাই মানুষকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে।[৩৯৩]

যুক্তরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অবস্থান

১৯৯৮ সালের শিক্ষা সংশোধন আইনে বলা হয়েছিল যে, মূল্যবোধ শিক্ষা সম্পর্কে একটা স্কুল নীতিমালা থাকতে হবে। সেখানে আরো বলা হয়েছিল শিক্ষক হচ্ছে নৈতিক এজেন্ট, এবং স্কুলগুলো মূল্যবোধ শিক্ষা দিবে। ১৯৯২ সালের স্কুল

---

[৩৮৮] মোহাম্মদ হাবিউল্লাহ, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নঃ উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, প্রাগুক্তঃ পৃঃ

[৩৮৯] মোঃ ইউসুফ ফারুক, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নঃ মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকরণের সমস্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ।

[৩৯০] আব্দুর রশিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ।

[৩৯১] আবুল কাশেম ফজলুল হক, শিক্ষা-মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক হয়না কেন?, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার দুশো বছর, সূচীপত্র, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃঃ ৩০০।

[৩৯২] শাহ আব্দুল হান্নান, দৈনিক নয়া দিগন্ত, (উপসম্পাদকীয়) মঙ্গলবার ২৩ অক্টোবর, ২০০৮ , পৃঃ ৬।

[৩৯৩] ডঃ এ. এইচ. এম. ইয়াহ্ইয়ার রহমান, The Islamic University Studies, Part-A, Volume 6, No. 1, December: 1997, p-1-5.

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাক্ট এ বলা হয়- বিদ্যালয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, শারীরিক, এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন করবে।[৩৯৪] নৈতিক উন্নয়ন বলতে সঠিক এবং ভুলের ব্যাপারে ছাত্রদের জ্ঞান, বোধগম্যতা, ইচ্ছা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণকে বুঝায়। ছাত্রদের উচিত নীতিগত বিষয়ের ক্ষেত্রগুলো আবিষ্কার করা এবং স্বৈরতান্ত্রিক নৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ পদ্ধতি অর্জন করা (অন্যের দ্বারা প্রদত্ত এবং সমালোচনাহীনভাবে গৃহীত ব্যতিরেকে)। নৈতিকতার ক্ষেত্রে শিক্ষকের যদি স্বচ্ছ এবং দৃঢ় অবস্থান না থাকে তবে বিদ্যালয়গুলো সামাজিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয় শক্তিতে পিছিয়ে পড়তে পারে এমনি ক্ষতিরও সম্মুখীন হবে।[৩৯৫]

জাতীয় পাঠ্যক্রম প্রণয়ন পরিষদ নৈতিক বিষয়গুলোর একটা তালিকা দিয়েছেঃ "স্কুলের মূল্যবোধগুলোতে থাকবে সত্য বলা, ওয়াদা রাখা, অন্যের সম্পদ ও অধিকারকে সম্মান করা, অন্যের প্রতি সুবিবেচিতভাবে কাজ করা, আমাদের থেকে যারা দুর্বল এবং কমভাগ্যবান তাদের সাহায্য করা, নিজের কাজের দায়িত্ব নিজে নেয়া, আত্মশৃঙ্খলা। স্কুলগুলো বাদ দিবে দুর্বলকে ভয় দেখানো, ঠকানো, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা, দায়িত্বহীনতা এবং অসততার ন্যায় কাজ গুলোকে।[৩৯৬] কাঠামোতে বলা হয়েছে যে, "প্রত্যেক স্কুল এর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করবে আচরণের নীতিমালা এর মাধ্যমে। ছাত্রদের নৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়কে তাদের নীতির একটা স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে, যে সমস্ত বিদ্যালয় এবং পরিচালনা পর্ষদ এক্ষেত্রে এখনও তাদের নীতিকে সুস্পষ্ট করেনি এবং নৈতিকতার মর্মবস্তুর তালিকাও করেনি যা স্কুলের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে।" ছাত্রদেরকে যোগ্য হতে হবে তাদের অর্জিত নৈতিকতা যা যুবকদের বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত এর মাধ্যমে তাদেরকে এমন অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যেখান থেকে তাদের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে তাদের মূল্যবোধ এবং বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বেড়ে উঠবে এবং তাদের পরিপক্ক, স্বায়ত্বশাসিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি হতে সাহায্য করবে।[৩৯৭]

কাঠামোতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেঃ

ভাষায় জ্ঞান এবং নৈতিকতার ধারণা এবং পর্যায়ক্রমে সেগুলো কিভাবে পৃথক করে।
অন্যের মতামতকে সম্মান এবং শ্রবণের পাশাপাশি কাউকে উদ্বুদ্ধকরণে প্রকৃতি এবং নৈতিক আলোচনার উদ্দেশ্যকে অনুধাবন।

নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা এবং নৈতিক বিচার সম্পন্নকরণের ন্যায় মূল্যবোধ অনুসারে কাজের বহিঃপ্রকাশ ও আচরণ করা।

নিজ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, যেমন- আত্ম-সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মমর্যাদা, আত্মশৃঙ্খলা, দায়িত্ব, অন্যান্য যোগ্যতার সাথে সম্পর্ক, যেমন- সহিষ্ণুতা, ব্যক্তি এবং সম্পদকে শ্রদ্ধা, সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা, গোপনীয়তা, ভালোবাসা; স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়, যেমন- ব্যক্তি এবং সমাজ, অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, যুদ্ধ-শান্তি, মানবাধিকার, শোষণ এবং সাহায্য চিকিৎসা নীতি, পরিবেশগত বিষয়, সমসুযোগ (লিঙ্গ, বংশ, অক্ষমতা, শ্রেণী)।[৩৯৮]

NCC Discussion Paper-অনুসারে নৈতিক শিক্ষার ৪টি উপাদান আছেঃ

নীতির বিষয় হিসেবে নৈতিক আচরণের ইচ্ছা।
সমাজ স্বীকৃত আচরণ বিধিমালার এবং প্রথার জ্ঞান।
নৈতিকতার বিষয়ে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদন্ডের জ্ঞান ও অনুধাবন।
নৈতিকতার বিষয়ে সুবিবেচনা থাকার যোগ্যতা।

---

394 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
395 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
396 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
397 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
398 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক শিক্ষিত বিদ্যালয় সমাপ্তকারীরা সামর্থ, হবেঃ

সঠিক এবং ভুলের পার্থক্য করতে।
নিজস্ব দৃষ্টি এবং মূল্যবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে।
নিজের কাজের দায়ভার নিতে।
অবস্থাভেদে নৈতিকতা বিস্তৃতিকে স্বীকৃতি দিতে। নিজের এবং অন্যের জন্য কাজের স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি ফলাফল জানতে।

নিজেদের জন্য সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা এক গুচ্ছ মূল্যবোধ এবং নীতিমালার উন্নয়ন করতে এবং নিজেদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশনার তালিকা নির্ণয় করতে।

স্বীকতি দিবে যে, তাদের মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তন করতে হতে পারে।
তাদের নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে সর্বদা আচরণ করতে।[৩৯৯]

যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে নৈতিক শিক্ষার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো যে, যুক্তরাজ্যের নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে একক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। "ঐতিহ্যগতভাবেই স্কুলের নৈতিক শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। একটা কারণ হল যে, সমস্ত ধর্মই নৈতিকতার উপর গুরুত্বারোপ করে এবং সাধারণ নীতিমালা, কোড অথবা নিয়মাবলির মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়। যুক্তরাজ্যে এটা সাধারণত বলা হয় যে, আমাদের আইন ও নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে খ্রিষ্টান নীতি। এটাও দেখানো যে জীবনে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিরেকে নৈতিক বিষয় অসম্ভব। অভিভাবকদের একটা জরিপে দেখা গিয়েছিল যে অধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার বিপরীতে স্কুলে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা চেয়েছিলেন শতকরা আশি ভাগ। সেখানে ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যে সংমিশ্রণ রয়েছে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তগুলি ষাটের দশক থেকে সরকারি বিদ্যালয় থেকে কৌশলে ধর্মকে বাদ দিচ্ছে। ফলে, নৈতিক শিক্ষাকে অবশ্যই ধর্ম থেকে আলাদা রাখতে হবে।[৪০০]

স্কটল্যান্ড ঃ

Scottish Consultative Council on the Curriculum (SCCC) পাঁচটি মূল মূল্যবোধকে সংজ্ঞায়িত করেছেঃ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ, নিজকে সম্মান এবং যত্ন নেওয়া, অন্যকে সম্মান এবং যত্ননেয়া, সামাজিক দায়িত্বের অনুভূতি। এই প্রধান মূল্যবোধগুলো প্রত্যেকটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং ৩ থেকে ৬টি সুস্পষ্ট সঠিকত্বের মাপকাঠি আছে।

সেখানে Values in Education Strategy Group আছে যেটা সভা, কর্মশালা, মতবিনিময়, স্কুল এবং কেস স্টাডির জন্য তহবিল এর ব্যবস্থা করে যেখানে স্কটিস বিদ্যালয়গুলোর ভালো কার্যকলাপকে ব্যাখ্যা করা হয়।

SCCC এর যে সমস্ত অগ্রাধিকার দেয়া হয় ঃ

শিক্ষায় নৈতিকতার গুরুত্বের অনুধাবন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি।
ইতিবাচক বিদ্যালয়, পরিবেশ এবং মূল্যবোধ উন্নয়নে প্রধান শিক্ষক-সহকারি শিক্ষকদের উপ-পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।
মূল্যবোধ পদ্ধতির পরিশুদ্ধ করণে সহযোগিতা করা। এ পদ্ধতিতে সহায়তা করতে পদ্ধতি এবং প্রয়োগের সহায়ক বস্তুর উন্নয়ন করা।
মূল্যবোধগুলোর চর্চায় আনয়নের মতো কৌশলগুলোর উন্নয়ন এবং প্রয়োগে পরামর্শ ও সহায়তা দান।
কার্যকরী শেখা, শিক্ষাদান এবং মূল্যবোধের গুরুত্ব পূর্ণ সম্পর্কের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

---

399 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
400 http://www.charactered.org/artusuk.htm page 9-11.

Dhaka University Institutional Repository

SCCC নিম্নোক্ত কৌশলগুলোকে সুপারিশ করেছে:

১. তাদের মূল্যবোধকে অধিকতর সুস্পষ্টকরণে তাদের সতর্কতার সাথে অনুসন্ধান করা উচিত।
২. বিদ্যালয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যবোধের বিবরণ তৈরিতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।
৩. মূল্যবোধের উপযোগী অভ্যাস গড়ে তোলা।
৪. মূল্যবোধ বিষয়টাকে চলমান বিবেচনার অধীন রাখা।[৪০১]

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড :

১৯৯২ সালে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড একটা Curriculum Order পাস করেছে। ৬টি বিষয় বস্তুর মধ্যে ১টা হচ্ছে পারস্পারিক বোঝাপড়ার শিক্ষা (EMU)। এটাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে "আত্মসম্মান, অন্যকে সম্মান এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়নকে লালন করা"।[১৬] এখানে ৪টি উদ্দেশ্য :
১. আত্মসম্মান এবং অন্যকে সম্মানের লালন এবং সম্পর্ক তৈরিকরণ।
২. পার্থক্যের অনুধাবন।
৩. পরস্পরনির্ভরতা।
৪. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

১৯৮৯ সালের Education Reform (Northern Ireland) Order-এ বলা হয় যে, বিদ্যালয়গুলো অবশ্যই ছাত্রদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শারীরিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। প্রস্তাবিত সর্বজনীন গৃহীত মূল্যবোধ হলো: মানবজীবনের মূল্য অনেক, সম্মান, ক্ষতি না করা, সহনীয়তা, সততা, ওয়াদা রক্ষা এবং সত্য বলা। নৈতিক যুক্তিবিন্যাস এ কারণে শিখানো হয় যাতে ছাত্ররা পরে নৈতিক বিষয়ের স্বীকৃতির মাধ্যমে সঠিকটা নির্বাচন করতে, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের পরিশুদ্ধকরণ, পছন্দ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অন্যের কাজ-অনুভূতি-চিন্তার বিশ্লেষণ, কাজের ফলাফলের আগাম ধারণা, এবং নৈতিক ভাবে কাজ করা।

নৈতিক শিক্ষার পাঠসূচিতে প্রধান তিনটি দিক রয়েছে, একটা হচ্ছে নৈতিকতা। নৈতিকতাকে আবার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে নিজকে, অন্যকে, ঈশ্বর এবং পরিবেশকে সম্মান করার দ্বারা; ভালবাসা, জীবনকে জানা, নিজেকে গ্রহণ, সম্পর্ক স্থাপন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ হিসেবে। Northern Ireland Curriculum Council (NICC) কর্তৃক লিখিত ধর্মীয় শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে প্রত্যেকটা স্তরের কাজের উদাহরণ এবং উদ্দেশ্যসমূহ বলা আছে।[৪০২]

ওয়েলস ঃ

যদিও পাঠ্যক্রম সামগ্রিক এবং শ্রেণীভুক্ত নয় তথাপি ধর্মীয় শিক্ষার অধীনে ব্যক্তিগত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

Educational Culture in Clwyo- তে যে সমস্ত মূল্যবোধকে তালিকার্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো: সম-মর্যাদা, সমসুযোগ, শ্রেষ্ঠতা, সমস্ত মানুষকে নিয়ে শিক্ষা, উচ্চাকাঙ্খা, স্কুল-কলেজের প্রতি যত্ন, প্রতিশ্রুতি এবং পেশাদারিত্ব। শিক্ষা নৈতিক উন্নয়ন করছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের।[৪০৩]

"ব্যক্তি, সমাজ এবং গোত্রের উন্নয়নের উপর জোর প্রদানসহ Clwyo যত্নবান মূল্যবোধগুলো পাঠক্রমের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হবে। একটা সুখী এবং নিরাপদ পরিবেশের মধ্য দিয়ে স্বশাসন এবং দায়িত্বশীলতাকে উৎসাহিত করা উচিত, নির্দেশনা এবং পরামর্শের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং কর্তার উচ্চ প্রত্যাশার সঞ্চালন করা।"

তালিকাভুক্ত অধিকার: বাসস্থান, পৃথক চাহিদা (ব্যক্তিগত চাহিদা), গোত্র, সম-অধিকার, বিশেষ চাহিদা, সাংস্কৃতিক বহুমুখিতা, দোভাষী, এবং ওয়েলস প্রসঙ্গ।

---

৪০১ http://www.charactered.org/artusuk.htm page 11-12.
402 http://www.charactered.org/artusuk.htm page 12-13.
403 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

১১ থেকে ১৬ বছর বয়সের ছাত্ররা সপ্তাহে ১ থেকে ২ ঘন্টা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। নৈতিক শিক্ষার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সামান্য, এমনি নেই বললেও চলে।[৪০৪]

ইংল্যান্ড ঃ

ইংল্যান্ড ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠক্রমের নির্দেশনা অনুসারে প্রত্যেক ছাত্রকে "প্রশ্ন, বিশ্লেষণ, নিজস্ব মূল্যবোধ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ" শিক্ষা দেওয়া হয়। "নৈতিক বিষয়ের আলোচনার প্রধান বিষয় বস্তু ইতিহাস এবং ইংরেজি। Education Act 1996-এ বলা হয়েছে:

1. Subject to the provisions of Schedule 31, and agreed syllabus in force immediately befor the commencement of this Act shall continue to have effect.
2. In this Act 'agreed syllabus' means a syllabus of religious education-
a) prepared before the commencement of this Act in accordance with schedule 5 to the (1944 c. 31). Education Act 1944 or after commencement in accordance with schedule 31, and
b) adopted by a local education authority under that schedule,
Whether it is for use in all the schools maintained by them or for use in particular such schools or in relation to any particular class or description of pupils in such schools.
3. Every agreed syllabus shall reflect the fact that the religious traditions in Great Britain are in the main Christian whilst taking account of the teaching and practices of the other principal religions represented in Great Britain.[405]

নৈতিক উন্নতি মানবিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পাঠ্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে আমরা যুক্তরাজ্যের Education Act 1996 এর The Curriculam এর Chapter-1 এর ৩৫১ নং ধারায় দেখতে পাই: General Duties in respect of the curriculum:
The curriculam for a school satisfies requirements of this section if it is a balanced and broadly based curriculum which- a) Promotes the spiritual, moral, cultural, mental and physical development of pupils at the school and of society and b) prepares pupils at the school for the opportunities, responsibilities and experience of adult life.[406]

৩৭৬ নং ধারায় ধর্মীয় শিক্ষাকে মৌলিক শিক্ষা হিসেবে ধরা হয়েছে:

In the case of a country school, the provision for religious educatin for pupils at the school which is required by section 352 (1)(a) to be included in the school's basic curriculum is provision for religious education in accordance with an agreed syllabus adopted for the school or for those pupils.[407] The provision for religious education for pupils at the school is required by section 352(1)(a) to be included in the school's basic curriculum is provision for religious education in accordance wity the appropriate agreed syllabus.[408]

৩৮০ নং ধারাতে বলা হয়েছে:

The provision for religious education for pupils at the school which is required by section 352(1)(a) to be included in the school's basic curriculum is provision for religious education-

---

404 http://www.charactered.org/artusuk.htm page 12-13.
405 http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1996/ukpga_19960056_en_23
406 http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1996/ukpga_19960056_en_23
407 http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1996/ukpga_19960056_en_23
408 http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1996/ukpga_19960056_en_23

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সপ্তাহে কতটুকু সময় ব্যয় করা যাবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

Religious education under any such arrangements shall be given during the times set apart for the giving of religious education in the school in accordance with the provision for that purpose included in the school's basic curriculum by virtue of section 352(1)(a).[409]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ বিধি বিধান পালনের প্রতি গুরুত্বারোপও আমরা যুক্তরাজ্য শিক্ষানীতিতে দেখতে পাই ।

৩৮৫ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

1) Subject to section 389, all pupils in attendance at a maintained school other than a maintained special school shall on each school day take part in an act of collective worship.
2) The arrangements for the collective worship in a school required by thes section may, in respect of each school day, provide for a single act of worship for all pupils or for separate acts of worship for pupils in different age groups for in different school groups.[410]
3) Subject to subsection (4) the arrangements for the collective worship required by this section shall be made- পারস্পারিক বুঝাপড়ার ভিত্তিতেই ধর্মীয় উপাসনা পরিচালিত হবে, এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ
a) in the case of a county school or a grant-maintained school in relation to which section 379 applies, by the head teacher after consultation with the governing body; and
b) In the case of a voluntary school or a grant-maintained school other than one in relation to which section 379 applies by the governing body after consultation with the head teacher.
5) Subject to subsection 6) the collective worship in a school required by this section shall take place on the school premises.[411]

জাপানের বর্তমান পাঠ্যক্রমে নৈতিক শিক্ষার উপদানসমূহ :

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই অধ্যায়ে জাপানের নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে । জাপানের বর্তমান পাঠ্যক্রম তিন স্তরে বিভক্তঃ প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়, নৈতিক শিক্ষা এবং বিশেষ কার্যক্রম । প্রত্যেক স্কুল শিক্ষা বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত মানদন্ডের আলোকে কোর্স অব স্টাডির উপর ভিত্তি করে একটা কার্যক্রম প্রণয়ন করেন, আইনগত ভাবেই স্কুলগুলো এ সকল মানদন্ড পালনে বাধ্য । প্রাথমিক এবং জুনিয়র হাইস্কুল উভয় ক্ষেত্রেই নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে 'কোর্স অব স্টাডি'র বক্তব্য নিম্নরূপঃ

" এটা মূলনীতি হবে যে, স্কুলের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়ে থাকবে । যার জন্য, নৈতিক উন্নয়নের সঠিক নির্দেশনা দেওয়া হবে যা কেবল নৈতিক শিক্ষার বেলায়ই না বরং প্রত্যেক বিষয়ে এবং বিশেষ কার্যক্রমে তাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে । 'কোর্স অব স্টাডি' নৈতিক শিক্ষার ৬টি উদ্দেশ্য উল্লেখ করে, যথাঃ
(১) ভয় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত গুণ লালন করা
(২) যারা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে অর্জন এবং উন্নতি করতে চেষ্টা করে এবং একটা একক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি তৈরি করে তাদের সহযোগিতা করা,
(৩) যারা একটি গণতান্ত্রিক সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন এবং উন্নয়নে প্রচেষ্টা করে তাদের প্রতিপালন করা,
(৪) একটি শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমাজের চিন্তায় যারা অবদান রাখতে পারে তাদের অনুসরণ করা
(৫) যারা আত্ম সিদ্ধান্ত নিতে পারে তাদের প্রতিপালন করা এবং
(৬) নৈতিকতার অনুভূতিকে লালন করা ।[৪১২]

[409] http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1996/ukpga_19960056_en_23
[410] http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1996/ukpga_19960056_en_23
[411] http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts1996/ukpga_19960056_en_23

Dhaka University Institutional Repository

স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে নৈতিক শিক্ষা ঃ

প্রাথমিক পর্যায় (গ্রেড ১-৬) এবং জুনিয়র হাই স্কুল পর্যায় (গ্রেড ৭-৯) একটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রথম গ্রেডের জন্য ৩৪ স্কুল ঘন্টা ২ থেকে ৯ম গ্রেডের জন্য ৩৫ ঘন্টা। প্রত্যেক গ্রেডের জন্য গড়ে বছরে ৩.৩% থেকে ৪% স্কুল ঘন্টা। অন্য কথায়, প্রতি সপ্তাহে নৈতিক শিক্ষার জন্য ১ স্কুল ঘন্টা (৪৫ মিনিট প্রাথমিক স্তরে, এবং ৫০ মিনিট জুনিয়র হাই স্কুল পর্যায়ে)। নির্দেশনা ম্যানুয়াল, কোর্স স্টাডি নির্দেশিত বই পঠিত বিষয়ের সংগ্রহ এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে শিক্ষকবৃন্দ এ ক্লাসগুলো সাজিয়ে থাকেন। ১ বছরের ভিত্তিতে শিক্ষক পাঠ্যসূচি সাজিয়ে যা শেখা দরকার সেগুলো নির্ধারণ করবে; পরম্পর সম্পর্কিত কিছু মূল্যবোধকে শিক্ষক নির্দেশিত বিষয়ের সাথে তুলনা করবে মজার কথা, সংক্ষিপ্ত গল্প, ছাত্রদের রচনা, শিক্ষামূলক টিভি অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপাদন ব্যবহারের মাধ্যমে।[৪১৩]

নৈতিক শিক্ষার উপাদানগুলো ৪ ধরনের। প্রত্যেকটি আবার ৭৬টি আইটেম নিয়ে গঠিত। ঐ চার ধরন হলো 'নিজ সম্পর্কিত', 'অন্যের সম্পর্কিত', 'প্রকৃতি এবং সৌন্দর্য সম্পর্কিত' এবং 'গোষ্ঠী এবং সমাজ সম্পর্কিত'। কোর্স অব স্টাডির একটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য বস্তুর উদাহরণ সহ নিম্নে এর উপাদানগুলোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ উল্লেখ করা হলো:[৪১৪]

নিজ সম্পর্কিত

- সংযম
  নিজে যা করতে পারে তা নিজে করা এবং সংযমী জীবনধারন করা।
- অধ্যবসায়
  পরিশ্রমী কাজ যা নিজের দ্বারা সম্ভব নিজে করা (গ্রেড ১ এবং ২, প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৫)।
- সাহস
  যা সত্য মনে হবে তা সাহসের সাথে করা (গ্রেড ৩ এবং ৪, প্রাথমিক বিদালয়: ১০৬)।
- সচেতনতা
  জীবনকে সচেতনতা এবং উৎসাহের সহিত পরিচালনা করা (গ্রেড ৩ এবং ৪, প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৬)।
- স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলা
  স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করা এবং শৃঙ্খলার সাথে কাজ করা (গ্রেড ৫ এবং ৬, প্রাথমিক বিধ্যালয়: ১০৭)।
- আত্ম উন্নয়ন
  নিজেকে জান, যা পরিবর্তন করা উচিৎ তা পরিবর্তন কর এবং ভালো বিষয়ে উন্নয় করা (গ্রেড ৫ এবং ৬, প্রাথমিক বিদ্যারয়: ১০৭)।
- সত্যকে ভালবাসা
  সত্যকে অনুসন্ধান করা এবং ভালোবাসা, এবং নিজের জীবনকে প্রস্ফুটিত করা; একটা আদর্শের উপর দৃষ্টি দিয়ে (গ্রেড ৭-৯, জুনিয়র হাই স্কুল: ১১৭)।[৪১৫]

অন্যের সাথে সম্পর্কিত

১. শিষ্টাচার
   শিষ্টাচারের গুরুত্ব অনুধাবন করা; এবং অবস্থা অনুসারে কথা বলা ও কাজ করতে সামর্থ্য হওয়া (গ্রেড ৭-৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১১৮)।
২. সহানুভূতি এবং দয়া
   নিজেকে অন্যের অবস্থায় বিবেচনা করে প্রত্যেকের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দয়াপরশ হওয়া (গ্রেড ৫ এবং ৬, প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৭)।
৩. বন্ধুত্ব

[412] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
[413] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
[414] http://www.hi-ho.ne.gp/taku77 papers/thes 595.htm page-6.
[415] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

অন্যকে বুঝতে পারা, বিশ্বাস করা এবং সাহায্য করা (গ্রেড ৩ এবং ৪, প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৬)।

৪. কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান

তাদের সাথে যোগাযোগ করা যারা মানুষের জীবনকে সহায়তা করে ও সহায়তা করে বয়স্ক নাগরিকদের কৃতজ্ঞতা এবং সম্মানের সাথে (গ্রেড ৩ ও ৪, প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৬)।

৫. বিনয়

বিনয়ী হওয়া এবং অন্যের ধারণা এবং অবস্থানকে বড় মনে সম্মান করা (গ্রেড ৫ ও ৬, প্রাথমিক বিদ্যালয়; ১০৭)।[৪১৬]

প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যের সাথে সম্পর্ক

১. প্রকৃতিকে সম্মান কর

চতুর্পাশের প্রকৃতির সাথে পরিচিত হওয়া এবং প্রাণীও গাছ-পালার প্রতি দয়াপরশ হওয়া (গ্রেড ১ এবং ২, প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৫)।

২. জীবনকে মূল্যায়ণ করা

জীবন এবং সমস্ত প্রাণীকে মূল্যায়ন করা (গ্রেড ৩ এবং ৪, প্রাথমিক স্কুল: ১০৬)।

৩. নান্দনিক সংবেদনশীলতা

নান্দনিক সংবেদনশীলতা থাকা এবং মানুষের উপর ক্ষমতা ব্যবহারের সতর্ক থাকা (গ্রেড ৫ এবং ৬, প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৭)।

৪. মহানুভবতা

মানুষের দূর্বলতা এবং কুৎসিত দিক দূর করতে মানুষের শক্তি এবং মহত্ত্বতায় বিশ্বাস করা এবং মানুষ হিসেবে জীবনের আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করা (গ্রেড ৭-৯, জুনিয়র হাই স্কুল: ১১৮)।[৪১৭]

গোষ্ঠী এবং সমাজের সাথে সম্পর্ক

১. গণদায়িত্ব

সমাজে ওয়াদা রক্ষা করা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বরং গণ দায়িত্বের অনুভূতিকে সম্মান করা (গ্রেড ৩ এবং ৪, প্রাথমিক স্কুল: ১০৬)।

২. ন্যায়বিচার

ক্ষতি-ভেদাভেদ ব্যতিরেকে প্রত্যেকের কাছে সৎ এবং নিরপেক্ষ হওয়া এবং ন্যায়বিচারকে বোঝার চেষ্টা করা (গ্রেড ৫ এবং ৬, প্রাথমিক স্কুল: ১০৭)।

৩. দলীয় অংশগ্রহণ এবং দায়িত্ববোধ

দলে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হওয়া, এবং অন্যের সহযোগিতায় নিজের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হওয়া (গ্রেড ৫ এবং ৬, প্রাথমিক স্কুল: ১০৭)।

৪. পরিশ্রম

কাজের গুরুত্ব বুঝতে পারা এবং কর্মমুখী হওয়া (গ্রেড ২ এবং ৩, প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৬)।

৫. পরিবারের সদস্যদের সম্মান করা

পিতামাতা, দাদা-দাদি কে ভালবাসা এবং সম্মান করা এবং তাদের সাংসারিক কাজে সাহায্য করা (গ্রেড ১ এবং ২, প্রাথমিক স্কুল: ১০৬)।

৬. স্কুলের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের সম্মান করা

স্কুলের শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভালবাসা এবং সম্মান করা এবং অন্যের সাথে অধিকতর ভাল স্কুল ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করা (গ্রেড ৫ এবং ৬, প্রাথমিক স্কুল: ১০৮)।

৭. সমাজে অবদান

স্থানীয় গোত্রের সদস্য হিসেবে সতর্ক থাকা, যারা সমাজে, বয়স্ক নাগরিকদের গোত্রের উন্নয়নে অবদান রেখেছে তাদের ভালবাসা এবং সম্মান করা (গ্রেড ৭-৯, জুনিয়র হাই স্কুল: ১১৯)।

---

[416] http://www.hi-ho.ne.gp/taku77 papers/thes 595.htm page-7

[417] http://www.hi-ho.ne.gp/taku77 papers/thes 595.htm page-7.

Dhaka University Institutional Repository

৮. ঐতিহ্যকে সম্মান করা এবং জাতিকে ভালোবাসা আমাদের জাতির ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিতে আগ্রহী হওয়া এবং জাতিকে ভালোবাসা (গ্রেড ৩ এবং ৪, প্রাথমিক স্কুল: ১০৭)।

৯. অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান করা
একজন জাপানি হিসেবে সতর্কতার সাথে বিদেশী সংস্কৃতি এবং জনগণকে মূল্যায়ন করা এবং আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বকে ত্বরান্বিত করা (গ্রেড ৫ এবং ৬, প্রাথমিক বিদ্যালয়: ১০৮)।[৪১৮]

প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা :

প্রাথমিক এবং জুনিয়র হাই স্কুল পর্যায়ের উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের সাথে এমন কিছু উপাদান এবং উদ্দেশ্য আছে যা নৈতিক শিক্ষার সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে জড়িত। নিম্নে কোর্স অব স্টাডি প্রদত্ত কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

জাপানি ভাষা

"জাপানি ভাষাকে সঠিকভাবে বুঝতে এবং প্রকাশ করতে ভাষার উপলব্ধি বৃদ্ধি করা, জাপানি ভাষায় আগ্রহ গভীর করা এবং জাপানি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লালন করা"।[৪১৯]

সামাজিক শিক্ষা

"ছাত্রদের কাছে জাপানের ইতিহাস পরিষ্কার করা বিশ্ব ইতিহাসের আলোকে, যার দ্বারা তারা জাপানের ঐতিহ্য এবং নৈতিক বিষয়গুলো যাতে বিস্তৃত ভাবে চিন্তা করতে পারে এবং জাপানি হিসেবে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে"। ছাত্রদের স্বীকৃতি দিতে হবে ব্যক্তির মর্যাদার গুরুত্বকে ও মানব অধিকারকে বিশেষ করে সামাজিক জীবনের উপর ভিত্তি করে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে স্বাধীনতা এবং অধিকারের সম্পর্কে যার দ্বারা গণতন্ত্রের বোধ্যগম্যকে আরো গভীরতর করবে এবং সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ প্রয়োজনীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করবে।"[৪২০]

বিজ্ঞান

"ছাত্রদেরকে বুঝতে দেওয়া যে, প্রাণীকূল তাদের পরিবেশের প্রভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রতি দয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করা, যখন তারা প্রাণীর জন্ম এবং শারীরিক গঠন নিয়ে গবেষণা করে।"[৪২১]

সঙ্গীত

"ছাত্রদের দক্ষতার উপর ভিত্তি করে জাপানের জাতীয় সঙ্গীত "Kimi-ga-yo" প্রত্যেক স্তরে পড়ানো হবে।"[৪২২]

স্বাস্থ্য এবং শারীরিক শিক্ষা

পারস্পারিক প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রদের সৎ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচর্যা করানো এবং পারস্পারিক বোঝা পড়ার মাধ্যমে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন এবং স্বেচ্ছায় নিয়মনীতি পালনের মনোভাব লালন করতে হবে"।[৪২৩]

বিদেশি ভাষা

"আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রেরণায় আন্তর্জাতিক বিষয়কে বিস্তৃত ভাবে বুঝতে সহায়ক উপাদান গুলোকে ব্যবহার করা হবে।[৪২৪]

---

[418] http://www.hi-ho.ne.gp/taku77 papers/thes 595.htm page-8-9.
[419] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
[420] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
[421] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
[422] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
[423] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
[424] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে নৈতিক শিক্ষা ঃ

কাঙ্খিত দলীয় কার্যক্রমের দ্বারা শরীর মন এবং ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য উন্নয়ন, গোত্রের সদস্য হিসেবে একটা ভালো জীবন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন এবং প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গির লালন করা, মানুষ হিসেবে আত্ম-সচেতনতাকে গভীর করা, এবং কারো চাহিদা পূরনের ক্ষমতাকে লালন করা ।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিয়ে গঠিত বিশেষ কার্যাবলি নিম্নে বর্ণনা করা হলো-
জুনিয়র হাই স্কুল কার্যক্রম:

১. শ্রেণী কক্ষের কাজ
২. ছাত্রদের পরমার্শ
৩. ক্লাবের কার্যক্রম
৪. স্কুলের বিষয়
    ক. আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম
    খ. পড়াশোনা সম্পর্কিত বিষয়
    গ. শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়
    ঘ. মাঠ পর্যায়ের কাজ
    ঙ. সমাজ সেবামূলক কাজ

একটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে নৈতিক শিক্ষার সাথে এ কার্যক্রমগুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং এগুলো একে অপরের পরিপূরক ।[৪২৫]

দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা :

যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে যে জাপানের নৈতিক শিক্ষা এমনভাবে সাজানো যে, শিক্ষাঙ্গনের সকল কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে এ লক্ষ্য অর্জন করা যায় । নৈতিক শিক্ষা, একাডেমিক বিষয় এবং বিশেষ কার্যাবলি এ তিনক্ষেত্র ছাড়াও অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে যা নীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত প্রত্যেক স্কুলকে তার ছাত্রদের দিয়ে তাদের শ্রেণীকক্ষ, জনসাধারণের ব্যবহারের জায়গা, যেমন- বিশ্রাম কক্ষ, ফটক, খেলার মাঠ, পার্শ্ববর্তী ভবন ইত্যাদি পরিস্কার করতে হয় । এটা কেবল পরিবেশ এবং বায়ুমন্ডল সম্পর্কে ভালো জ্ঞান দেওয়ার জন্যই না বরং ছাত্রদেরকে কাজের এবং জনসাধারণের কলাণে উৎসাহ দেওয়া ।

দ্বিতীয়টা হচ্চে, প্রাণী সম্পর্কিত কাজ । ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রাণী অথবা গাছ আছে যাদের তারা যত্ন নেয়, এটা প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন কিছু না । এটাকে মাঝে মধ্যে বিশেষ কাজগুলোর একটি অথবা বিজ্ঞান ক্লাসের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয় । ছাত্ররা এক এক করে এগুলোকে পানি ও খাদ্য খাওয়ায়; এমনকি মাঝে মধ্যে ছুটিতেও । এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে ছাত্ররা চতুর্পাশ্বের, প্রকৃতির সাথে পরিচিত হয় এবং প্রাণিকুলের উপর দয়াবান হয় এবং এর ফলে জীবনকে মূল্যায়ন করতে শেখে ।

তৃতীয়ত, জুনিয়র এবং হাই স্কুল পর্যায়ে স্কুলের পরে ক্লাবের কার্যক্রমকে (কারিকুলামের বিশেষ কাজ থেকে আলাদা) অভ্যন্ত রীণ ব্যক্তিত্বের দক্ষতাকে অর্জনে এবং দলে ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয় । কিন্তু জুনিয়র হাই স্কুল ক্লাবে অংশগ্রহণ করা সব ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয় । প্রকৃত অর্থে, অনেক ছাত্র সেখানে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে । এসব কার্যক্রম নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্যসমূহের অনেক বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে । যেমন: পারস্পারিক সহযোগিতা, বদান্যতা, দায়িত্বশীলতা, অধ্যবসায়, আত্মোন্নয়ন, বন্ধুত্ব ইত্যাদি, ছাত্ররা তাদের দলের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের মাধ্যমে এগুলো শেখে ।

সারকথায়, জাপানের নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ সমন্বিত এবং এর লক্ষ্য অর্জনকে অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ।

---

[425] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়গত দিক থেকে, আমেরিকার তুলনায় জাপানের নৈতিক শিক্ষা অধিক মানসম্মত। এ বিষয়গুলো কোনো শ্রেণীকক্ষেই সীমাবদ্ধ না বরং বাইরেও দৃঢ়। আলাদা নৈতিক শিক্ষার ক্লাস ছাড়াও এটা স্কুলের সারা জীবনে বাস্তবায়ন করা হয়, যেখানে আমেরিকার বিদ্যালয়গুলো নৈতিক শিক্ষাকে কোন সামাজিক শিক্ষার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৪২৬]

জাপানের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান

টেবিল ৩-৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয় এবং বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক সময় (১৮৮৬, ১৮৯১)।[৪২৭]

	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ কোর্স (১৮৮৬)	সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৮৯১)	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর বিষয় (১৮৮৬)	উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৮৯১)
নীতিবিদ্যা	১.৫	৩	১.৫	২
	১.৪	১৫	১০	৫
				২
চারুলিপি				৩
গণিত	৬	৬	৫	বালক- ৫ বালিকা-৪
ভূগোল	-	-	৪	জাপানি ভুগোল জাপানি ইতিহাস বিদেশি ভূগোল) বালক- ৪ বালিকা- ৩
ইতিহাস	-	-		
বিজ্ঞান	-	-	২	২
অঙ্কন	-	-	২	২
গান	-	-	-	২
শারীরিক শিক্ষা	৬	৩	৬	বালক-৩ বালিকা- ২
সেলাই (মেয়েদের)	-	-	২-৬	বালিকা- ৩
মোট	২৭.৫	২৭	বালক- ৩০.৫ বালিকা- ৩২.৫-৩৬.৫	৩০

টেবিল ৩-৫

সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয় এবং সাপ্তাহিক সময় (১৯০৮)[৪২৮]

বিষয়/ গ্রেড	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	৫ম বর্ষ	৬ষ্ঠ বর্ষ
নৈতিকতা	২	২	২	২	২	২
জাপানি ভাষা	১০	১২	১৪	১৪	১০	১০
গণিত	৫	৬	৬	৬	৪	৪
জাপানি ইতিহাস			-		৩	৩
ভূগোল			-		২	২

[426] http://www.hi-ho.ne.jp/taku77/papers/thes 595.htm
[427] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
[428] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান			-		২	২
অঙ্কন			১	১	বালক-২ বালিকা-১	বালক-২ বালিকা-১
গান	৪	৪	১	১	২	২
শারীরিক শিক্ষা	-	-	৩	৩	৩	৩
সেলাই (মেয়েদের)			বালিকা-১	বালিকা-২	বালিকা-৩	বালিকা-৩
হস্তশিল্প			-			
মোট	২১	২৪	বালক-২৭ বালিকা-২৮	বালক-২৭ বালিকা-২৯	বালক-২৮ বালিকা-৩০	বালক-২৮ বালিকা-৩০

টীকা ঃ

১. ১ম ও ২য় বর্ষে অঙ্কনে সপ্তাহে ১ ঘন্টা দেওয়া যাবে।

২. হস্তশিল্পে ১ম থেকে ৩য় বর্ষ পর্যন্ত সপ্তাহে ২ ঘন্টা দেওয়া যেতে পারে।

টেবিল ঃ ৩-৬

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিষয় এবং বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক সময় (১৯০৮)।[৪২৯]

বিষয় / গ্রেড	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ
নৈতিকতা	২	২
জাপানি ভাষা	৮	৮
অঙ্ক	৪	৪
জাপানি ইতিহাস	৩	৩
ভূগোল	৩	৩
বিজ্ঞান	২	২
অঙ্কন	বালক-২, বালিকা-১	বালক-২, বালিকা-১
সঙ্গীত	২	২
শারীরিক শিক্ষা	৩	৩
সেলাই (মেয়েদের)	বালিকা-৪	৪
হস্তশিল্প	বালক-২, বালিকা-১	বালক-২, বালিকা-১
কৃষি	২	২
ব্যবসা	২	২
ইংরেজি		
মোট	বালক-২৮, বালিকা-৩০	বালক-২৮, বালিকা-৩০

টেবিল ৩-৭ঃ সাধারণ মধ্যমশ্রেণীর বিদ্যালয়ের বিষয় এবং বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক সময় (১৮৮৬)।[৪৩০]

বিষয় / গ্রেড	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	৫ম বর্ষ
নীতিশাস্ত্র	১	১	১	১	১
জাপানি ভাষা ও চীনা পৌরাণিক কাব্য	৩	৩	৫	৫	২
প্রথম বিদেশি ভাষা	৬	৬	৭	৫	৫

429 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

430 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিদেশি ভাষা/কৃষি	-	-	-	৪	৩
ভূগোল	১	২	২	১	-
ইতিহাস	১	১	২	১	২
গণিত	৪	৪	৪	৪	৩
প্রাকৃতিক ইতিহাস	১	-	২	-	৩
পদার্থ	-	১	-	-	৩
রসায়ন	-	১	-	২	-
চারুলিপি	২	১	-	-	-
অঙ্কন	২	২	২	২	১
সঙ্গীত	২	২	-	-	-
শারীরিক শিক্ষা	৫	৫	৩	৩	৫
মোট	২৮	২৮	২৮	২৮	২৮

সারণি-৪

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিষয় এবং বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক সময় (১৯০১)[৪৩১]

ডবষয় / গ্রেড	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	৫ম বর্ষ
নেতিক	১	১	১	১	১
জাপানি ভাষা ও চীনা সাহিত্য	৭	৭	৭	৬	৬
বিদেশি ভাষা	৭	৭	৭	৭	৬
ইতিহাস	৩	৩	৩	৩	৩
ভূগোল	৩	৩	৩	৩	৩
গণিত	৩	৩	৫	৫	৪
প্রাকৃতিক ইতিহাস	২	২	২	-	-
পদার্থ এবং রসায়ন	-	-	-	৪	৪
শাসনব্যবস্থা ও অর্থনীতি	-	-	-	-	৩
অঙ্গন	১	১	১	১	-
সঙ্গীত	১	১	১	-	-
শারীরিক শিক্ষা	৩	৩	৩	৩	৩
মোট	২৮	২৮	৩০	৩০	৩০

সারনি ৩.৯ঃ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিষয় ও বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক সময় (চার বছর মেয়াদি কোর্স) (১৯০১)[৪৩২]

বিষয় / গ্রেড	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ
নৈতিক	২	২	২	২
জাপানি ভাষা	৬	৬	৫	৫
বিদেশি ভাষা	৩	৩	৩	৩
ইতিহাস	৩	৩	৩	৩
ভূগোল	৩	৩	২	৩
গণিত	২	২	২	২

431 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
432 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

বিজ্ঞান	২	২	২	১
অঙ্কন	১	১	১	১
গার্হস্থ্য অর্থনীতি	-	-	২	২
সেলাই	৪	৪	৪	৪
সঙ্গীত	২	২	২	২
শারীরিক শিক্ষা	৩	৩	৩	৩
শিক্ষা	-	-	-	-
হস্তশিল্প	-	-	-	-
মোট	২৮	২৮	২৮	২৮

টেবিল ৪-১ বিষয়সমূহ এবং বিষয়ভিত্তি সাপ্তাহিক সময় সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯১৯)[৪৩৩]

বিষয় / গ্রেড	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	৫ম বর্ষ	৬ষ্ঠ বর্ষ
নৈতিকতা	২	২	২	২	২	২
জাপানি ভাষা	১০	১২	১২	১২	৯	৯
গণিত	৫	৫	৬	৬	৪	৪
জাপানি ইতিহাস	-	-	-	-	২	২
ভূগোল	-	-	-	-	২	২
বিজ্ঞান	-	-	-	২	২	২
অঙ্কন	-	-	১	১	বালক-২ বালিকা-১	বালক-২ বালিকা-১
গান	৪	৪	১	১	২	২
শারীরিক শিক্ষা	৪	৪	৩	৩	৩	৩
সেলাই (বালিকাদের)	-	-	-	বালিকা-২	বালিকা-৩	বালিকা-৩
হস্তশিল্প	-	-	-	-	-	-
মোট	২১	২৩	২৫	বালক-২৭ বালিকা-২৯	বালক-২৮ বালিকা-৩০	বালক-২৮ বালিকা-৩০

টেবিল ৪-২ বিষয় এবং বিষয়ভিত্তিক সময় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (১৯২৬)[৪৩৪]

বিষয় / গ্রেড	১ম বর্ষ	২য় বর্ষ
নৈতিক শিক্ষা	২	২
জাপানি ভাষা	৬	৬
গণিত	৪	৪
জাপানের জাতীয় ইতিহাস	২	২
ভূগোল	২	২
বিজ্ঞান	২	২
অঙ্কন	১	১
হস্তশিল্প	১	১
সঙ্গীত	১	১
শারীরিক শিক্ষা	৩	৩
ব্যবসা	বালক-৫	বালক-৫

433 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
434 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

	বালিকা -২	বালিকা-২
গার্হস্থ্য অর্থনীতি (মেয়েদের)	বালিকা-৪	বালিকা-৪
সেলাই (মেয়েদের)	বালক-২৯ বালিকা-৩০	বালক-২৯ বালিকা-৩০

[৪৩৫]

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নৈতিক শিক্ষার অবস্থান

অঙ্গরাজ্য কর্তৃক বাধ্যতামূলক চারিত্রিক শিক্ষা ঃ

চারিত্রিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে আটটি অঙ্গরাজ্য সাম্প্রতিক কালে আইন অথবা নীতিমালা তৈরি করেছে।

'Indiana Section 1.IC20-10.1-4-4.5' সুনাগরিকত্বের নির্দেশনা দিয়ে একটা নতুন ধারা যোগ করেছে যেখানে জোর দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রকৃতি এবং গুরুত্বের উপর- সৎ ও সত্যবাদি হওয়া, কর্তৃপক্ষকে সম্মান করা, অন্যের সম্পদকে সম্মান করা, সর্বদা নিজের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ভালো করা, চুরি না করা, সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয় দক্ষতা হাসিল করা এবং দ্বন্দ্ব মীমাংসায় সহিংসতার আশ্রয় না নেওয়া, পরিবার এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব পালন করা, জীবিকা অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব লওয়া, একজন মানুষ যেরূপ আচরণের প্রত্যাশা করে তার সাথে সেরূপ আচরণ করা, জাতীয় পতাকা ও যুক্তরাষ্ট্র এবং ইন্ডিয়ানার সংবিধানকে সম্মান করা, কারো বাবা-মা এবং বাসাকে সম্মান করা, নিজেকে সম্মান করা এবং অন্যের মতামত ধর্মীয় বিশ্বাসের অধিকারকে সম্মান করা[৪৩৬]

'State of Maine Laws Relating to Public School Title 20.1221 নৈতিক এবং গুণাবলির শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করে। তত্ত্বাবধান এবং নির্দেশনায় ওয়াদাবদ্ধ হয়ে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত শিশু এবং যুবকদের মনে নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া- ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার নীতিমালা এবং সত্যকে পবিত্র হিসেবে বিবেচনা করা; দেশ, মানবতা এবং সর্বজনীন বদান্যতাকে ভালোবাসা; মানবতার মহান নীতিমালা যেমন পাখি-প্রাণী এবং যা মানবকল্যানে জরুরি তার প্রতি দয়া; পরিশ্রম এবং মিতব্যয়িতা; শুদ্ধতা, সংযম এবং মিথ্যাচার; এবং অন্যান্য গুনাবলী যা মানব সমাজকে সুসজ্জিত করে; তাদের বয়স এবং ক্ষমতার ভারসাম্যের উপর ভিত্তি করে সেগুলোকে তাদের যত্নে পরিচালনা করা; এ সমস্ত গুনাবলি প্রবণতার এক বিশেষ বোধগম্যের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সংবিধানকে সংরক্ষণ এবং পূর্ণতা দান করা, স্বাধীনতার আশীর্বাদকে রক্ষা করা এবং ভবিষ্যৎ শান্তিকে ত্বরান্বিত করা।[৩]

The state of Washington Legislative Rule RCW 28 A. 150.210, Basic Education Act Goal সম্পর্কে বলেছে।

Basic Education Act এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়াশিংটন রাজ্যের স্কুলের ছাত্রদের এমন সুযোগ দেয়া যাতে তারা দায়িত্বশীল নাগরিক হতে পারে, তাদের পরিবার সমাজ নিজের অর্থনৈতিক সচ্ছলতায় অবদান রাখতে পারে এবং উৎপাদনমুখী তৃপ্ত জীবন ভোগ করতে পারে।[৪৩৭]

The state of Washington Legislative rule RCW 28A.150.210. State of Maine laws Relating to Public Schools Title 20.1221 RCW 28A.150.211 মূল্যবোধ এবং বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এও স্বীকার করে যে, কতিপয় মৌলিক মূল্যবোধ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, চাহিদাপূরণ এবং সুখের জন্য জরুরি, স্থানীয় পর্যায়ের সর্বসম্মতিতে নির্ধারিত এ সকল মূল্যবোধ এবং চারিত্রিক

[435] http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198103/hpbz198103-2_023.html
[436] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
[437] http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

গুণাবলি কীভাবে শেখা যাবে সে ব্যাপারে স্থানীয় সমাজগুলোর দায়িত্ব রয়েছে।[৫] এ সকল মূল্যবোধ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে :

১. সততা, ঐকান্তিকতা এবং বিশ্বাস।
২. নিজেকে এবং অন্যকে সম্মান করা।
৩. ব্যক্তিগত কার্যাবলী এবং প্রতিশ্রুতিতে দায়িত্বশীল ।
৪. আত্মশৃঙ্খলা এবং সংযম।
৫. অধ্যবসায় এবং কর্মমূখী জীবন-বিধান।
৬. আইন এবং কর্তৃপক্ষকে সম্মান করা।
৭. স্বাস্থ্যবান এবং ইতিবাচক আচরণ।
৮. সমাজের ভিত্তি হিসেবে আচরণ[৪৩৮]।

১১৯২৯ সাল থেকে ওরিজনে (Oregon) চারিত্রিক শিক্ষা আইন ছিল। ORS 336.067 - এ বলা হয়েছে,

১) পাবলিক স্কুলে নিম্নোক্ত নির্দেশনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে;

ক) সততা, নৈতিকতা, শিষ্টাচার, আইনের প্রতি আনুগত্য, জাতীয় পতাকাকে সম্মান, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওরিজন অঙ্গরাজ্যের, সংবিধানকে সম্মান, পিতা-মাতা এবং বাড়িকে ভালবাসা, সৎ পরিশ্রমের সম্মান এবং প্রয়োজনীয়তা এবং অন্যান্য শিক্ষা যা উন্নত এবং কাঙ্খিত নাগরিকত্বকে এগিয়ে নিতে এবং উন্নত করতে সাহায্য করে।

খ) প্রতিবন্ধী, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম, জাতীয়তা, মতবাদ, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভালবাসা। সমাজে ব্যক্তি বা দলের অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা এবং তাদের মর্যাদা ও মূল্যকে স্বীকৃতিদান।

গ) প্রাণীর প্রতি মানবিক আচরণ।

ঘ) মানুষের উপর টোব্যাকো, অ্যালকোহল, ড্রাগ এবং নিয়ন্ত্রিত উপাদানের প্রভাবসমূহ।[৪৩৯]

২) এই ধারার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করার জন্য The state superintendent of public Instruction পরামর্শ সম্বলিত একটা রূপরেখা তৈরি করবে এবং সেই রূপরেখা প্রত্যেক সরকারি বিদ্যালয়ের 'কোর্স অব স্টাডি'তে অন্তর্ভুক্ত করবে।

ওরিজনের সরকারি স্কুলগুলোতে চারিত্রিক শিক্ষার ব্যাপারে ওরিজনের State Board of Education, ১৯৯১ সালের নভেম্বরে অঙ্গরাজ্যভিত্তিক নিম্নোক্ত নীতিগ্রহণ করেঃ

"যুবক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ইতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়নে বিদ্যালয়গুলো বাসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং গোত্রীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে দায়িত্ব বিনিময় করবে"।[৪৪০]

শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবদ্ধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত কার্যক্রমে বিদ্যালয়কে এ পরিষদ সমর্থন করে যেখানে ছাত্রদের মধ্যে ইতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। সামাজিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলো এ সমস্ত কার্যক্রম উন্নত করবে।

ওরিজনের সরকারি বিদ্যালয়ের মানসম্মত শিক্ষার একটি উপাদান হিসেবে চারিত্রিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৯৯৩ সালের জুলাইতে The state Board of Education একটি প্রশাসনিক বিধিমালা গ্রহণ করে।[৪৪১]

(৩) চারিত্রিক শিক্ষা

চারিত্রিক শিক্ষা এমন একটা পদ্ধতি যেখানে ছাত্রদের মূল নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা এবং উন্নততর করণে সাহায্য করা হয় যেটাকে আমাদের বহুরূপী সমাজ গুরুত্বপূর্ন হিসেবে বিনিময় করে এবং ধারণ করে। এ সকল গুণাবলি অন্তর্ভুক্ত করে

438 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
439 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
440 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
441 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় যাতে তা হলো, সম্মান, দায়িত্ববোধ, সতর্কতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায় বিচার এবং পক্ষপাতহীনতা এবং নাগরিক বিষয়ক গুণাবলি এবং নাগরিকত্ব।[৪৪২]

১৯৯৪ সালে পাঠ্যসূচিতে চারিত্রিক শিক্ষা যোগ হয়:
(২৬) মূল নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষা যাতে আমাদের সমাজ অংশ নেয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধারণ করে, এগুলো সীমিত না তবে অন্তর্ভূক্ত করে সম্মান, ব্যক্তিত্ব, বিশ্বস্ততা, যত্ন, সততা, ন্যায়বিচার এবং নিরপেক্ষতা, এবং নাগরিকত্ব এবং নাগরিক অন্তর্ভুক্তিকরণ।

চারিত্রিক শিক্ষা সম্পর্কে ৯টি নির্দেশনামূলক ধারণার তালিকা ওরিজন প্রকাশ করেছিল।
নিউ হ্যামেস্কায়ারের চারিত্রিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি আছে। প্রয়োগের জন্য নীতিটি তিন শাখায় বিভক্ত:
তৃতীয় নীতি হচ্ছে সরকারি বিদ্যালয় অনুমোদনের ন্যূনতম মানদন্ড যেখানে বলা হয়েছে- প্রত্যেক স্থানীয় বিদ্যালয় পরিষদ পবিত্র এবং নাগরিকত্ব সম্পর্কিত লিখিত নীতিমালা গ্রহণ করবে এবং কার্যকরী করবে। চারিত্রিক এবং নাগরিকত্বের উন্নয়ন সম্পর্কিত পদ্ধতিতে ঐ সকল চারিত্রিক এবং নাগরিক উপাদান থাকবে যেগুলো কোর্স অব স্টাডি অন্তর্ভূক্ত করা হবে অথবা সতর্কতামূলক শিক্ষার পরিবেশে উদাহরণের দ্বারা সঞ্চারিত করা। এ নীতিমালাকে পরিমার্জন করা হবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন, অভিভাবক এবং সমাজের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে। চরিত্র এবং নাগরিকত্বের মৌলিক উপাদানগুলো অন্তর্ভূক্ত করবে আত্মশৃঙ্খলা, আত্মসম্মান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ; NH সংবিধানের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮৩তম অনুচ্ছেদ অনুসারে মানবতা, বদান্যতা, সত্য এবং সততা, নিজের ও অন্যের সাথে; নিরপেক্ষতা, সততা, ন্যায়বিচার, সম্মান, সৌজন্যতা এবং মানব মূল্যবোধ, নিজের ও অন্যের প্রতি দায়িত্বশীলতা, সমাজসেবা এবং নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্বসমূহ।[৪৪৩]

▪ Code of Virginia তে বলা আছে, "সরকারি বিদ্যালয়ের নির্দেশনার সম্পূর্ণ বিন্যাসটা জোর দেবে নৈতিক শিক্ষাকে- শিক্ষকের পাঠদানের মাধ্যমে এবং সঠিক পাঠ নির্বাচনের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে।[৪৪৪]
▪ The California Education code section 44806- এ বলা আছে: প্রত্যেকটা শিক্ষক ছাত্রদের মনে নিম্নোক্ত বিষয়ের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করবে নৈতিকতার মূল্যবোধ, সৎ, ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম এবং আমেরিকার নাগরিকের মর্যাদা, দায়িত্ব ও অধিকারের সত্যিকার অনুধাবন, গৃহপালিত পোষা প্রাণীদের প্রতি দয়া এবং প্রাণীকূলের উপর মানবিক আচরণ সহ, যার দ্বারা তারা কর্মবিমুখতা, ধর্মনিন্দা এবং মিথ্যাবাদিতা দূর করতে পারবে এবং আচরণ নৈতিকতা এবং একটা মুক্ত সরকারের নীতিমালার নির্দেশনা পাবে।[৪৪৫]

▪ ১৯৯৩ সালে গৃহীত Educational Responsibilities of School Personnel- এ বলা আছে; বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের বোধগম্যতা সৃষ্টি করবে যেগুলো আমেরিকার সমাজের ভিত্তি তৈরি করে। আমেরিকার ঐতিহ্য আইন ব্যক্তিগত এবং সামাজিক নৈতিকতার একটা সাধারণ সমবস্তু প্রকাশ করে, অভ্যাস যেটা নৈতিক মূল্যবোধে প্রতিশ্রুতিকে প্রকাশ করে যাতে থাকে অন্যের মতামতকে সম্মানের পাশাপাশি বিশ্বস্ততা ও সত্য বলা। নীতিবান লোক তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যকলাপের মধ্যে অন্যের মূল্য ও সম্মানের নিশ্চয়তা দেয়। তারা দায়িত্ব নেয়, তাদের সিদ্ধান্তের এবং সিদ্ধান্তের ফলাফলের। নীতিবান লোকেরা বিবেকের স্বাধীনতাকে মূল্য দেয় এবং অন্যের বিবেকের স্বাধীনতাকে সম্মান জানায়। তাদের আত্ম-মূল্যায়নের যোগ্যতা আছে এবং নিজের ভুল স্বীকারে ও অন্যের মতামতকে গ্রহণে ইচ্ছুক। নৈতিকতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষেরা নিজেদের নৈতিক প্রত্যয় এবং বিশ্বাস ধারন করে এবং প্রকাশ করে এবং অন্য ব্যক্তি বা দলের ভিন্ন মতামতকে সম্মান করে।[৪৪৬]

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের প্রত্যেক শিক্ষককে একটা করে সারগ্রন্থ দেওয়া হয়। ঐ সারগ্রন্থে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করা। প্রত্যেকটি সংজ্ঞায়িত এবং বৈশিষ্ট্যগুলোর উন্নয়নে বিদ্যালয়ের রীতিসমূহের অন্তর্গত: সত্যতা, ন্যায়বিচার, দেশপ্রেম, আত্ম-সম্মান, সততা, অন্যের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা, দৃষ্টান্তমূলক আচরণ,

---

442 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
443 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
444 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
445 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
446 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক মিথষ্ক্রিয়া এবং নীতির প্রতিবিম্ব পরিবার অন্যান্য গোত্রকে সম্মান, সম্পদের সংরক্ষণ, নির্ভরযোগ্যতা এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ।[৪৪৭]

পাঠ্যসূচিতে উপাদানের বিস্তৃতি ঃ

কিছু অঙ্গরাজ্য চারিত্রিক অথবা নৈতিক শিক্ষাকে একটা নির্দিষ্ট উপাদানের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম ভার্জিনিয়া সামাজিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ইংরেজি কলা এবং বিজ্ঞানে নৈতিক শিক্ষার উল্লেখ করেছে। লুউসিনিয়া সামাজিকি বিজ্ঞানের পাঠসূচির লক্ষ্যবস্তু এটা অন্তর্ভূক্ত করেছে," মানুষ এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এ সমস্ত সম্পর্কের ফলাফলের সম্পর্কে অনুধাবন, এ সম্পর্কের পরিনতি সম্পর্ক মূল্যবোধের বিচার করা," সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, "ব্যক্তি এবং দলীয় সম্পর্কের প্রভাব ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন, এ সম্পর্কের মূল্যবোধের মূল্যায়ন," 'বিচার এবং মূল্যবোধ নির্ধারণ,' "কারো নিজস্ব বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ ও আচরণে তাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা"। মেইন এবং ভারমন্ট প্রত্যেকেই শিক্ষার সাধারন মর্মবস্তুকে নির্ধারন করেছেন, ভারমন্ট যেখানে চারিত্রিক শিক্ষাকে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেন:
"ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নৈতিক সিদ্ধান্ত সমাজের অন্যান্য দায়িত্বের সাথে ফলপ্রসূ এবং সন্তোষজনক সম্পর্ককে উন্নত করে নিজ এবং অন্যকে সম্মান করা সংঘর্ষমূলক আচরণের বিকল্প খোঁজা চ্যালেঞ্জকে সাহস, ঐকান্তিকতা এবং সততার দ্বারা মোকাবেলা করা, দায়িত্ব গ্রহণ করা , সম্মানের সাথে মিথষ্ক্রিয়া, নির্ভরযোগ্যতা, উৎপাদনমুখিতা, নেতৃত্ব, পদক্ষেপ এবং সততা প্রদর্শন।

সহিংস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন School Health Program-এ পিয়ার্তো রিকো নৈতিক শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। ভার্জিনিয়ায় আছে দায়িত্বশীল ছাত্র কার্যক্রম।

ধর্মের ব্যাপারে সরকারি স্কুলের যদি নিরপেক্ষ হতে হয়, ধর্মকে যদি নিরপেক্ষ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনা করা হয় এবং ছাত্রদের যদি উদারমনা শিক্ষিত করতে হয়, তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ধর্মকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে নিবে। সেই লক্ষ্যে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পেশ করছি:

১. কারিকুলামে নৈতিকশিক্ষা ও ধর্মকে গুরুত্বের সাথে নিতে স্কুলের সংস্কৃতিতে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গুরুত্বেও সাথে নিতে হবে। প্রত্যেক জেলা স্কুলের একটি সামগ্রিক নীতিমালা থাকবে যেখানে প্রত্যেক ছাত্রের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার থাকবে- চাই সে কোন বিশ্বাসের হোক বা না হোক এবং এটাই পরিষ্কার করা যে ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কারিকুলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথম সংশোধনী প্রদত্ত নাগরিক কাঠামো সহ বিস্তৃত সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ নীতিমালা উন্নততর করা হবে। কেবলমাত্র তার পরেই প্রশাসক এবং শিক্ষকদের ক্লাসে ধর্মীয় বিষয় তোলার আইনসিদ্ধ ও শিক্ষাগত "নিরাপদ আশ্রয়" থাকবে।
২. পাবলিক শিক্ষায় নাগরিক ও শিক্ষাগত মিশনে চারিত্রিক শিক্ষা জরুরি। চারিত্রিক শিক্ষার সমন্বিত কার্যক্রম উন্নত করতে সমাজগুলোর একত্রে কাজ করা উচিত। যে কার্যক্রম মূল নৈতিক মূল্যবোধ এবং সমাজে বিস্তৃতভাবে পারস্পারিক নাগরিক গুণাবলির প্রকাশ করবে। এসকল কার্যক্রম অবশ্যই ধর্মকে গুরুত্বের সাথে নিবে।[৪৪৮]

যুক্তরাষ্ট্রের পাঠ্যসূচিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সংযোজন সম্পর্কিত ধর্মীয় নেতা ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের মতামত নিচে প্রদত্ত হলো:

Our educational framework is grounded in what we have called the *New Consensus*.(9) There is now widespread agreement among the leaders of religious and educational organizations about the role of religion in the curriculum. For example, in 1988, seventeen major religious and educational organizations (including the American Jewish Congress and the Islamic Society of North America, the National Association of Evangelicals and the National Council of Churches, the American Association of School Administrators and

---

447 http://www.charactered.org/artusuk.htm Visited: 20/02/2007
448 http://www.gwu.edu/%7ECCPS/pop_moral.html

Dhaka University Institutional Repository

the National School Boards Association, the AFT, NEA, and the ASCD among them) endorsed a document entitled: *Religion and the Public School Curriculum: Questions and Answers*, that describes the importance of religion in the public school curriculum in this way:

Because religion plays significant roles in history and society, study about religion is essential to understanding both the nation and the world. Omission of facts about religion can give students the false impression that the religious life of humankind is insignificant or unimportant. Failure to understand even the basic symbols, practices, and concepts of the various religions makes much of history, literature, art, and contemporary life unintelligible.(10)

From this and other statements of the New Consensus a number of conclusions follow. First, because of the powerful influence of religion on our history and culture it is essential and not optional to include religion in the curriculum. Second, the influence of religion is not limited to history; students must understand the relevance of religion to contemporary life. Third, religion is relevant to virtually all subjects of the curriculum. Finally, it is important to understand a variety of religions, not just our own.

We suggest that we think about the relevance of religion to the curriculum in three ways.[449]

Courses in Morality and Religion. A modest commitment to *natural inclusion* and *minimal fairness* can do a great deal to alert students to the fact that there are religious ways of thinking about sexuality and economics that have moral implications. But it is unlikely that any such limited exposure will enable students to come to any deep understanding of religion or of religious ways of being moral. Moralities are grounded in worldviews that make sense of them, that render them rational, that give them cultural and intellectual force. Religion is too complex, teachers aren't prepared, the number of textbook pages is limited, and the authorities who define the disciplines will be resistant. Courses in economics and sex education will never be *robustly fair*. But there is some possibility that the curriculum as whole might be, if it includes courses that do enable students to study religion in some depth.[450]

তারা সরকারি স্কুলগুলোর জন্য নিম্নোক্ত পাঠ্যসূচির সুপারিশ করে, যাতে ধর্ম ও নৈতিকতা সংযোজিত হবে।

If public schools are to neutral in matters of religion, if religion is to be treated with fairness and respect, and if students are to be liberally educated, then public education must take religion seriously. To that end, we offer the following recommendations:

1. Taking religion seriously in the curriculum, including in moral education, requires taking religious liberty seriously throughout the school culture. Every school district must have a comprehensive policy that articulates the religious liberty rights of students of all faiths or none, and makes clear that the academic study of religion is an important part of the curriculum. The policy should be developed with broad community participation within the civic framework provided by the First Amendment. Only then will administrators and teachers have the legal and educational "safe harbor" needed to address religious issues in the classroom.

---

[449] http://www.gwu.edu/%7Eccps/pop_moral.html.
[450] http://www.gwu.edu/%7Eccps/pop_moral.html.

Dhaka University Institutional Repository

2. Character education is essential to the civic and educational mission of public education. Communities should work together to develop comprehensive character education programs that reflect the core moral values and civic virtues widely shared in the community. Such programs must take religion seriously by making sure that students are exposed to religious perspectives, where appropriate, in the curriculum. Character education cannot ignore religion; it cannot convey to students the idea that religion is irrelevant to moral virtue and judgment.

3. When we disagree about moral issues of importance (including the nature of morality itself) students must be educated about our differences. Liberal education is a form of moral education in which we teach students about the major ways, secular *and religious*, that humankind has developed for making sense of our lives and the world. Most courses deal with matters related to morality; those courses should be at least minimally fair to religious points of view.

4. But if religion and religious accounts of morality are to be taken seriously, we must not settle for natural inclusion and minimal fairness; schools must offer courses in religious studies that give the curriculum a robust fairness by enabling students to study religion in some depth. We also recommend interdisciplinary moral capstone courses for high school seniors that use secular and religious texts for framing the exploration of those inescapable moral and existential issues that are central to students' lives.

5. If any of this is to be done well then major reforms in teacher education are necessary. All teachers must be taught the civic and educational frameworks for dealing with religion in their Foundations and Teaching Methods courses. Unhappily, most teacher-educators have little understanding of them; religion simply isn't taken seriously in most schools of education.

6. All teachers who deal with morally and religiously contested matters should know something about the relationship of religion to their particular subjects and disciplines. Ideally, they should be required, as part of their certification, to take at least one course in relating religion to their subject ("Religion and American History," "Religion and Economics," "Religion and Sexuality," etc). Whether required or not, departments of religious studies should make such courses available as electives.

7. Universities and school systems should address these topics in a variety of summer seminars and in-service workshops.

8. If there are to be *courses in religious studies* there must be teachers competent to teach them. Religious studies must become a certifiable field, requiring at least an undergraduate minor. Such courses must not be phased in until there are competent teachers.

9. If teachers are to do the job well they must have adequate textbooks and resource materials. A good deal of material already exists in some areas of the curriculum (in history and literature, for example) while there is very little material elsewhere (in economics and sex education, for example). For publishers to address this need they must be convinced that is a market for such material; states need to create such markets.[451]

---

[451] http://www.gwu.edu/%7Eccps/pop_moral.html.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা কমিশন

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করলেই বৃটিশ আমলের শিক্ষা কমিশন নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। কারণ, বৃটিশ আমল থেকেই শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। নিম্নে বৃটিশ পরবর্তী সময়ের শিক্ষা কমিশন সম্পর্কে সাল অনুযায়ী আলোচনা করা হলো।

হান্টার কমিশন রিপোর্ট (১৮৮২)

এ দেশের শিক্ষার অগ্রগতি ও শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য লর্ড রিপন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি করে এ কমিশন গঠন করেন। কমিশনের সভাপতি হান্টারের নামানুসারে এ কমিশনকে হান্টার কমিশন বলা হয়ে থাকে।

এ কমিশনের উল্লখযোগ্য সদস্য ছিলেন:

- স্যার সৈয়দ আহমেদ
- ভুদেব মুখার্জী
- এ.এম. বেসে
- যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর
- আনন্দ মোহন বসু
- জাস্টিস তেলাং

১৮৮৩ সালে ২২২টি প্রস্তাবনা সম্বলিত মূল রিপোর্ট ৬০০ পৃষ্ঠায় এবং প্রাদেশিক কমিটিগুলোর রিপোর্টসহ প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

কমিশনের রিপোর্টে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার পেছনে নিম্নলিখিত তিনটি মৌলিক কারণ চিহিত করেন।

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান শিক্ষকের অভাব
২. শিক্ষাক্রমে মুসলমানদের প্রিয়ভাষার অনুপস্থিতি
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।

ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সুপারিশ
ধর্মীয় মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে এমন একখানি নৈতিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, যা সরকারী ও বেসরকারী কলেজে শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।[৪৫২]

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯০২ খৃ.

(Indian University Commission, 1902)
শিক্ষার প্রতি লর্ড কার্জনের অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তিনি বৃটিশ ভারতের শিক্ষার সমস্যাবলী অত্যন্ত যত্নসহকারে অনুধাবন করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, ভারতের তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিক অবস্থা ছিল আরও হতাশাব্যঞ্জক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান আশানুরূপ না থাকাতে তার জের মহাবিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদানের মানেও আঘাত হেনেছিল। মহাবিদ্যালয়ে সুষ্ঠ প্রশাসনের অভাব, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব

[৪৫২] শিক্ষা কমিশন সমূহের সমন্বিত ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (১৮১৩-২০০৩) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), পৃষ্ঠা- ০৩

Dhaka University Institutional Repository

ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা মানুষের কাছে কোন আবেদন জানাতে পারতনা। প্রয়োজনীয় যোগাযোগ সংরক্ষণের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতোনা। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের আকৃতি আশাতীতভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে সিন্ডিকেটের আইনানুগ ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। তাছাড়া বৃটিশ প্রদত্ত শিক্ষার ভেতর থেকে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ ও সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এমনি এক পটভূমিতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে বড়লাট হয়ে আসে কার্জন। বৃটিশ শাসকদের নিকট কার্জন ছিলেন উপযুক্ত ব্যক্তি, যিনি ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশকে অবদমিত করতে সক্ষম হবেন। লর্ড কার্জন এখানে এসেই সকল স্তরের সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষামূলক কর্মসূচি সামগ্রিক কার্যক্রমের একটি অংশ মাত্র।

কমিশন গঠন ঃ

১.	মিঃ টি. র‍্যালে	সভাপতি
২.	মিঃ গুরুদাস ব্যানার্জী	সদস্য
৩.	সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী	সদস্য
৪.	মিঃ জে. পি. হিউলেট	সদস্য
৫.	মিঃ আলেকজাণ্ডার পেডলার	সদস্য
৬.	মি ডি. ম্যাচক্যান	সদস্য
৭.	মি এ. জি. বাউর্নে	সদস্য

মিঃ আর. নাথন এ কমিশনে সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ কমিশনের প্রথম দিকে কোন ভারতীয় সদস্য ছিল না। পরে পরিস্থিতি বিবেচনায় স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ও সৈয়দ হাসান বিলগ্রামীকে সদস্যভূক্ত করা হয়।[৪৫৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, ১৯১২

(Dacca University Committee, 1912)

বঙ্গভঙ্গ রদ হবার ফলে সৃষ্ট মুসলিম সমাজের নৈরাজ্য ও ক্ষোভ প্রকাশের লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গ রদ হবার অব্যবহিত পরই মুসলমানদের সান্তনা দেবার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ ৩১শে জানুয়ারি, ১৯১২ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন। তিনি কলকাতায় ফিরে গেলে ১৯১২ খৃস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি স্যার রাশবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে একটি দল তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সামনে তিনি ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সরকারিভাবে ঘোষণা করেন যে, "যখন আমি ঢাকা পরিদর্শন করি তখন এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা মুসলমানদের মাঝে একটা প্রকট উৎকণ্ঠাবোধ উপলব্ধি করি। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলশ্রুতিতে যাতে শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা এর চলমান গতিকে শ্লথ না করে দেয়, সে ব্যাপারেই তারা বেশী উদ্বিগ্ন। আমি সেখানে মুসলমানদের একটি সাক্ষাৎ প্রার্থী দলের সামনে বলেছি সরকার চিন্তাভাবনা করছে, যে প্রদেশে কিছুদিন পূর্বে শিক্ষার এত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে, সেখানে শিক্ষার এ বেগবান ধারাকে অব্যাহত রাখা ও পূর্ববাংলার শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ কর্মকর্তা নিয়োগসহ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেক্রেটারি অব স্টেটস-এর নিকট সুপারিশ পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গের এ সীমিত সময়ে নবসৃষ্টি (১৯০৫-১৯১২ খৃ.) পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের সরকার শিক্ষার উন্নয়নে কতকগুলো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে ফলে এ সময়ে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়।" এর অল্প কিছুদিন পর ভারত সরকার ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন। ঘোষণার সাথে সাথে আরো পরামর্শ দেন যে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা নামে একটি অনুষদও খোলা হবে। সরকার ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কীম তৈরির জন্য স্যার রবার্ট নাথনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন।

---

[৪৫৩] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি গঠন ও সদস্যবৃন্দের পরিচিতি ঃ

ভারত সরকার তার চিঠির (স্মারক নং ৮১১, তারিখ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯১২ খৃ.) মাধ্যমে সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রাণের দাবী পূরণার্থে ও এ এলাকার বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকায় একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। সেমতে সরকারি সিদ্ধান্ত স্মারক নং-৫৬৭, তারিখ ২৭শে মে, ১৯১২ খৃস্টাব্দে মোতাবেক একটি কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কমিটির সদস্যবৃন্দের পরিচিতি ঃ

১.	স্যার রবার্ট নাথন, স্কয়ার, সি.এস.আই, সি.আই.ই, বি.এ., আই.সি.এস, বার-এট-ল	সভাপতি
২.	জি.ডব্লিউ. কুচলার, স্কয়ার, সি.আই.ই., এম.এ, ডি.পি.আই, বেঙ্গল	সদস্য
৩.	ডঃ রাশ বিহারী ঘোষ, সি.এস.আই, সি.আই.ই, ডি.টি উকিল, কলকাতা হাইকোর্ট	সদস্য
৪.	নওয়াব সাইয়েদ নওয়াব আলী চৌধুরী, জমিদার, খান বাহাদুর অব ধনবাড়ী, ময়মনসিংহ	সদস্য
৫.	বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়, উকিল, জমিদার, ঢাকা	সদস্য
৬.	নওয়াব সিরাজ-উল ইসলাম খান বাহাদুর উকিল, কলকাতা হাইকোর্ট	সদস্য
৭.	মোহাম্মদ আলী, স্কয়ার, বি.এ, সিপডিক এণ্ড ট্রাস্টি অব এংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ, আলীগড়	সদস্য
৮.	এ.ই.আর.মেস, স্কয়ার, এম.এ অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা	সদস্য
৯.	ডব্লিউ. এ.জে. আর্চবোল্ড, স্কয়ার, এম.এ, এল.এল.বি, অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা	সদস্য
১০.	মাহামাহপাধ্যায় সতীশচন্দ্র আচার্য্য, বিদ্যাভূষণ, এম.এ, পি-এইচ.ডি, এম.আর.এ.এস অধ্যক্ষ, কলকাতা সংস্কৃত কলেজ	সদস্য
১১.	বাবু ললিতমোহন চ্যাটার্জি, এম. এ, অধ্যক্ষ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা	সদস্য
১২.	সি.ডব্লিউ.পি.কে, স্কয়ার, এম.এ. প্রফেসর, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা	সদস্য
১৩.	শামস্-উল উলামা আবু নসর মোহাম্মদ ওয়াহিদ সুপারিন্টেনডেন্ট, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা	সদস্য
১৪.	ডি.এস. ফ্র্যাসার, স্কয়ার, বি.এ, আই.সি.এস.	সচিব

৪ জন যশস্বী সমাজের উঁচুস্তরে প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ যারা বিভিন্নভাবে সুযোগ্য জনবল ও নিজস্ব প্রতিভা দিয়ে এ কমিটিকে সহযোগিতা করেন। তাঁরা এ কমিটিতে প্রকৃত প্রস্তাবে সদস্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা ছিলেন প্রাচ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ও আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃত সুপণ্ডিত। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা শিবলী নোমানী, কুলাওয়ারীর মাওলানা শাহ সুলায়মান, ডঃ হরোউইচ, নওয়াব ইমাদুল মুলক, সৈয়দ হোসাইন বিলগ্রামী প্রমুখ।[৪০৪] কমিটি তার সুপারিশমালায় বর্ণনা করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নের ৭টি বিভাগে পাঠদান কর্মসূচী খোলা হয়।

১) কলা
২) বিজ্ঞান
৩) ইসলামী শিক্ষা
৪) আইন

[৪০৪] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ১৪০-১৪১

Dhaka University Institutional Repository

৫) প্রকৌশল
৬) চিকিৎসা
৭) শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

ইসলামী শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়, এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ ধরণের স্বতন্ত্র বিভাগ হবে, যে বিষয়ে ভারত সরকারও তার চিঠিতে আলোকপাত করেছে, তা সংশিলষ্ট সাব কমিটিতেও সুবিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়।সাব কমিটির সদস্যবৃন্দ আশা পোষণ করেন যে, শিক্ষার্থীরা উক্তকোর্স সম্পাদন করবে সে যেন একজন সুযোগ্য পন্ডিত ও আদর্শ সংস্কৃতির ধারক হয়ে বিজ্ঞ পেশার একজন সরকারী কর্মকর্তার যোগ্যতা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেন।

হার্লে কমিটি ১৯১৫ খৃঃ

ইসলামী শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়গুলোর কাম্যমান সম্পন্ন শিক্ষাদান নিশ্চিত করণার্থে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তদানীন্তন সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। মিঃ এ. এচ. হার্লে ছিলেন এ কমিটি প্রধান। বিধায় কমিটি "হার্লে কমিটি নামেই সুপরিচিত।[৪৫৫]

কমিটির সুপারিশঃ

কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত কওে যে সুপারিশমালা সরকারের কাছে পেশ করেন। তার প্রেক্ষিতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি ও সংস্কৃতির লক্ষ্যে দীর্ঘদিনের মুসলমানদেও দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা করেন। তার সাথে ঘোষণা করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে পাঠদানকারী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত ইসলামী শিক্ষার চাহিদা পুরণ হবে। এ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পর্যায়ে একটি একটি ইসলামী শিক্ষা অনুষদ থাকবে। কিন্তু পরবর্তীতে মিঃ নাথনের হস্তক্ষেপে অনুষদটি একটি বিভাগে রূপান্তরিত হয়।[৪৫৬]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (স্যাডলা) কমিশন, ১৯১৯ খৃ.
(Calcutta University Commission, 1919)

লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার দশ বছর পার না হতেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পরিচালনার দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনেক উন্নতি হলেও শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সাফলজনক প্রচেষ্টা তখনও হয়নি। এছাড়া নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও তীব্রভাবে অনুভূত হতে শুরু করেছে।

যে সকল ব্যক্তিত্ব এ কমিশনের সম্মানিত সদস্য হিসেবে কাজ করেন তাদের না ও পদবী নিম্নে দেয়া হলঃ

১.	ডঃ এম,ই স্যাডলার, সিবি, এম.এ.ডি-লিট, এল.এল.ডি ভাইস চ্যান্সেলর, লীডস্ ইউনিভার্সিটি, লণ্ডন	সভাপতি
২.	ডঃ জে, ডব্লিউ গ্রেগরী, এফ.আর.এস, ডি.এস.সি এম.আই.এম.এম প্রফেসর জিওলোজী ডিপার্টমেন্ট, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	মিঃ পি, জে হার্টোগ, সি.আই.ই, এম.এ, বি.এস-সি. একাডেমিক রেজিস্ট্রার, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	প্রফেসর রাম স্যুর, এম.এ অধ্যাপক, আধুনিক ইতিহাস ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	সম্মানিত স্যার আশুতোষ মুখার্জী, কে.টি.সি, এস.আই ডি.এল বিচারক, বেঙ্গল ফোর্ট ইউলিয়াম হাই কোর্ট	সদস্য
৬.	সম্মানিত জনাব ডব্লিউ. হর্নেল এম.আর.এ.এস.এম এর	সদস্য

[৪৫৫] History of Traditional Islamic Education in Bangladesh, Dr. A. K. M. Ayub Ali, P-93
[৪৫৬] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ-১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

জনশিক্ষা পরিচালক, বেঙ্গল

৭. ডঃ জিয়া উদ্দিন আহমেদ সি.আই.ই., এম.এ., ডি.এস-সি.	সদস্য
পি-এইচ.ডি. সিনিয়র টিউটর ও প্রফেসর গণিত বিভাগ	সদস্য
মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ, আলীগড়	

মিঃ জি এন্ডার্সন, সহকারী সচিব, শিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার এ কমিশনের সচিব হিসেবে কাজ করেন।[৪৫৭]

শামসুল হুদা কমিটি, ১৯২১ খৃ.

(The Shamsul Huda Committee, 1921)

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা স্থাপনের পর থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই একের পর এক কমিটি নিয়োগ করে কলকাতা মাদরাসার সার্বিক সমস্যা সমাধান করার প্রয়াস চালিয়েছেন। সরকার হুদা কমিটির পেশকৃত সুপারিশ মালার সাথে একমত হতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে সরকার ১৯২১ খৃস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারির ৫০৯নং স্মারক-এর মাধ্যমে নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদাকে প্রেসিডেন্ট করে একটি কমিটি নিয়োগ করেন।[৪৫৮]

কমিটি গঠন ঃ

১. নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, কে.সি.আই.এ	সভাপতি
২. নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর, সি.আই.এ	সরকারী সদস্য
৩. খান বাহাদুর মৌলভী আমীনুল ইসলাম ইন্সপেক্টর জেনারেল, রেজিস্ট্রেশন	সরকারী সদস্য
৪. মিঃ এ.এইচ.হার্লে, অধ্যক্ষ, কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়া	সরকারী সদস্য
৫. মাওলানা মোহাম্মদ মাজেদ আলী হেড মৌলভী, কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়া	সরকারী সদস্য
৬. মাওলানা শফিউল্লাহ, কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়া	সরকারী সদস্য
৭. শামসুল উলামা মাওলানা মীর মোহাম্মদ, হুগলী মাদ্রাসা	সরকারী সদস্য
৮. শামসুল উলামা মাওলানা হেদায়েত হোসেন কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ	সরকারী সদস্য
৯. শামসুল উলামা মাওলানা হাফিয উল্লাহ, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা	সরকারী সদস্য
১০. মৌলভী মোঃ মুসা, সুপারিনটেনডেন্ট, হুগলি মাদ্রাসা	সরকারী সদস্য
১১. মৌলভী মোহাম্মদ ইসহাক, হেড মৌলভী, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা	সরকারী সদস্য
১২. মির্জা আবু জাফর, সহকারি স্কুল পরিদর্শক, মুসলিম শিক্ষা, কলকাতা	সরকারী সদস্য
১৩. মৌলভী মোহাম্মদ, ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা	সরকারী সদস্য
১৪. মৌলভী এ.কে. ফজলুল হক, কলকাতা	বেসরকারী সদস্য
১৫. খান বাহাদুর মৌলভী সুজায়াত আলী বেগ (শিয়া প্রতিনিধি)	বেসরকারী সদস্য
১৬. শামসুল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসেন, কলকাতা মাদ্রাসা	বেসরকারী সদস্য
১৭. মুতাওয়াল্লী ইমামবাড়া, হুগলী	বেসরকারী সদস্য
১৮. মৌলভী আবদুল হাদী, প্রফেসর, কলকাতা সিটি কলেজ	বেসরকারী সদস্য
১৯. মৌলভী সৈয়দ আঃ বারী, প্রভাষক, মেদিনীপুর কলেজ	বেসরকারী সদস্য
২০. মৌলভী হাফেজ নাযির আহমদ	বেসরকারী সদস্য
২১. মৌলভী হাফেজ আঃ রায্যাক, হাম্মাদিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা	বেসরকারী সদস্য
২২. মৌলভী আবু তাহের, প্রফেসর, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা	বেসরকারী সদস্য
২৩. মিঃ জি.এ. টেলর, সহকারি পরিচালক, মুসলিম শিক্ষা	সচিব

[৪৫৭] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ১৬৭-১৬৯

[৪৫৮] Dr. Sekander Ali Ibrahimi, Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, Resolution No.500 Edn, 28-2-1921 (Dhaka Islamic Foundation Bangladesh 1987) Part-iv, P-143

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি সংযোজন ঃ
শামসুল উলামা হাফিয উল্লাহ, মুতাওয়াল্লী হুগলী ইমামপাড়া এবং মৌলভী আবু তাহের এ তিনজন কমিটিতে কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করায় নিম্নোক্ত তিনজনকে কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয় ঃ

১. স্যার আঃ রহীম কে.টি. বেঙ্গল, নির্বাহী সদস্য	সরকারি সদস্য
২. মৌলভী মোহাম্মদ মোবারক করীম, মাদ্রাসা আলিয়া, কলকাতা	সরকারি সদস্য
৩. মৌলভী সৈয়দ মোহাম্মদ হায়দার প্রভাষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়[৪৫৯]	সেকরকারি সদস্য

শামসুল হুদা কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের ১৫ই এপ্রিল এবং ২য় বৈঠক হয় ১৯২১ সালের ৬ই জুলাই। শেষোক্ত বৈঠকে দুটি সাব-কমিটি গঠিত হয়, একটি প্রমাসনিক ও অপরটি কারিকুলাম বিষয়ক। উভয় কমিটি নিজ নিজ বিষয়ের রিপোর্ট মূল কমিটির নিকট পেশ করেন। মূল কমিটি ১৯২৫ সালের ২৩শে নভেম্বর জন শিক্ষা বিভাগে রিপোর্ট পেশ করেন।

রিপোর্টের প্রথমেই মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী মনোভাব তুলে ধরা হয়। বলা হয়, একটি জাতি হিসেবে মুসলমানরা এমন সব শিক্ষাবিদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যারা সত্যিকারভাবে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। মুসলমানদের প্রাণের দাবির প্রেক্ষিতে গভর্নর ইন কাউন্সিল এমন একটি সরকারি মাদরাসা থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যেখানে বিশেষভাবে ইসলামী শিক্ষা দেওয়া হবে। এখানে ইংরেজি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে বা থাকবে না, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মতামত আহ্বান করা হলে আলিয়া মাদরাসা কলিকাতার নামই সবাই উল্লেখ করেন। অতএব এজন্য একটি আলাদা স্থায়ী স্কীম তৈরি করা হলো। যাতে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আলিয়া মাদরাসার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।[৪৬০]

হার্টোগ কমিটি রিপোর্ট, ১৯২৯ খৃ.
(The Hartog Committee Report, 1929)

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিতেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সংস্কার আন্দোলনের যুগে পদার্পণ করে। মহাযুদ্ধের সময় ভারত তার ধন ও জনবল দিয়ে সাহায্য করার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসন দাবী করেছিল, এরই ফলশ্রুতিতে হল ১৯১৯ খৃস্টাব্দের মন্টেগুফোর্ড শাসন সংস্কার। এ শাসন সংস্কারের ফল ভারতে প্রাদেশিক সরকারের উত্থান। তখন থেকে ভারতে প্রাদেশিক সরকারের দ্বৈতশাসন প্রবর্তিত হল। সংরক্ষিত বিষয়গুলো রইল গভর্নরের শাসন-পরিষদের হাতে। আর হস্তান্তরিত বিষয়গুলো গেল ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে। শিক্ষা হল হস্তান্তরিত বিষয়গুলোর অন্যতম। প্রাদেশিক দ্বৈত-শাসন জনগণকে বিক্ষুব্ধ করল। এ সময় দমনমূলক রাউলার্ট আইন (১৯১৯), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯২১), প্রভৃতি রাজনৈতিক ঝঞ্ঝার মধ্যে সরকার ১৯১৯ খৃস্টাব্দের ভারত-শাসন আইনের ফলাফল পরীক্ষা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাই ১৯২৭ খৃস্টাব্দে নিয়োজিত হল সাইমন কমিশন। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে পরীক্ষা করাই ছিল কমিশনের উদ্দেশ্য। আবার স্বীয় দায়িত্বকে সহজ করার জন্য ১৯২৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে 'সাইমুন কমিশন' শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শের জন্য নিয়োগ করেন 'হার্টোগ কমিটি'। স্যার ফিলিপ হার্টোগ ছিলেন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী আইন সংস্কারের জন্য ১৯২৭ খৃস্টাব্দে একটি 'রয়েল কমিশন' গঠিত হয়। কিন্তু ১৯১৯ খৃস্টাব্দের সংস্কারগুলো অসন্তোষজনক বলে চিহ্নিত করে ক্রমাগত আন্দোলন চলার ফলে ভারতের শিক্ষার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য ১৯২৭ খৃস্টাব্দে 'স্যার জন সাইমনের' সভাপতিত্বে 'রয়েল কমিশন' গঠিত হয়।[৪৬১] কমিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে বিভিন্ন সুপারিশ করেন। তাছাড়া চাকরির শর্তাবলীর উন্নতির ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করেন।

---

৪৫৯ মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ১৮৩-১৮৪
460 Dr. AKM Ayub Ali, History of Traditional Islami Education in Bangladesh, P-94.
৪৬১ মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং-১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সাইমন রয়েল কমিশন ঃ

কমিশনকে তার কাজের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যকারি কমিটি নিযুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। প্রদত্ত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে 'রয়েল কমিশন' স্যার ফিলিপ হার্টোগের সভাপতিত্বে একটি উপ-কমিটি বা উপ-কমিশন গঠন করেন। 'স্যাল ফিলিপ হার্টোগ' বেশ কয়েক বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রয়েল কমিশনকে সাহায্য করার জন্য ১৯২৮ খৃস্টাব্দে এ কমিটি Auxillary Commitee of the Indian Statutory Commision ভারতের শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তদন্ত করে ১৯২৯ খৃস্টাব্দে এক তথ্য বহুল রিপোর্ট প্রণয়ন করে, যা হার্টোগের নামানুসারে জনসাধারণের কাছে 'হার্টোগ কমিটি' বা 'হার্টোগ রিপোর্ট' নামে সুপরিচিত। হার্টোগ কমিটির মতে, তদনীন্তন ভারতে একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব দেশীয় মন্ত্রী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওপর ছেড়ে দেয়ার ফলে জনসাধারণের দাবীর প্রেক্ষিতে উপমহাদেশে শিক্ষার যথেষ্ট সম্প্রসারণ সাধিত হয়। এর ফলে শিক্ষা শুধু একচেটিয়া ধনী, বিত্তবান ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনুন্নত সম্প্রদায় ও শিক্ষার দিকে এগিয়ে আসার সুযোগ লাভ করে। এ সময় মুসলমানদের মধ্যেও শিক্ষার চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।[৪৬২]

মুসলিম এডুকেশন এডভাইজরি (মোমিন) কমিটি, ১৯৩১-৩৪ খৃ.

(The Muslim Education Advisory (Momin) Committee, 1931-34)

বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (Bengal Legislative Council) ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ৩০শে আগস্ট তারিখের সিদ্ধান্তের আলোকে ভারত সরকার ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারির স্মারক নং-৩৯৮ শিক্ষা, বরাবরে বাংলার জনগণের শিক্ষা উন্নতিসাধনে কি নীতি অবলম্বন করা যায়, সে সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার জন্য খান বাহাদুর মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল মোমিনের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন।

কমিটি গঠন ঃ[৪৬৩]

১. খানবাহাদুর মৌলভী আব্দুল মোমিন, এম.এ, এম.এল.সি	সভাপতি
২. জনাব এ,কে ফযলুল হক, এম.এ, বি.এল, এম.এলসি.	সদস্য
৩. মৌলভী সৈয়দ নওশের আলী, এম.এ., বি.এল., এম.এল.সি	সদস্য
৪. মৌলভী আবুল কাসেম, বি.এ., এম.এল.সি.	সদস্য
৫. খান বাহাদুর মৌলভী আযীযুল হক, বি.এল., এম.এল.সি	সদস্য
৬. মৌলভী তামীয উদ্দিন খান, এম.এ., বি.এল., এম.এল.সি.	সদস্য
৭. জনাব এ, এফ, রহমান, এম.এল.সি	সদস্য
৮. জনাব আব্দুল করিম, বি.এ, এল.এম.সি	সদস্য
৯. মৌলভী নুর আহম্মদ, বি.এ., চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম পৌরসভা	সদস্য
১০. লে. কর্ণেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী বি.ই ভাইস-চ্যান্সেলর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১১. জনাব মাহমুদুল হাসান, এম.এ., এম.এল., বার.এট-ল প্রভোস্ট, মুসলিম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২. মিঃ জে. এম.বটমলী, এম.ই.এস, সহকারি জনশিক্ষা পরিচালক, মুসলিম শিক্ষা	সদস্য
১৩. খান বাহাদুর মুহাম্মদ মাওলা বখ্শ, বি.এ স্কুল পরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ	সদস্য
১৪. খান বাহাদুর মৌলভী মুহাম্মদ মুসা, এম.এ অধ্যক্ষ, ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা	সদস্য
১৫. খান সাহেব মৌলভী আঃ খালেক, বি.এ., প্রধান শিক্ষক	সদস্য

---

[৪৬২] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ১৯৩-১৯৪

[463] Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bangladesh, Dr. Sekander Ali, P-25

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি মুসলিম হাইস্কুল (বর্তমানে সেকেণ্ডারি বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট
এণ্ড সেকেণ্ডারি এডুকেশন, ঢাকা)

খান বাহাদুর মৌলভী তাসাদ্দুক আহমদ এ কমিটির সচিব হিসেবে কাজ করেন। তবে তিনি সদস্য নন। তার বদলীজনিত কারণে তারস্থলে পরবর্তীতে সচিব হিসেবে কাজ করেন খান বাহাদুর আলফাজ উদ্দিন আহম্মদ, এম.এ., সহকারি জনশিক্ষা পরিচালক, মুসলিম শিক্ষা, বঙ্গদেশ (সরকারি নোটিফিকেশন নং-৫৪৫ টি শিক্ষা, তারিখ ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ২৩শে জুন)।

পরবর্তীতে কমিটিতে আরো তিনজনকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় ঃ

১. মাওলানা সূফী হাজী মুহাম্মদ আবু বকর ফুরফুরা
২. প্রিন্স গোলাম হোসেন শাহ (মহিসুর পরিবারের শিয়া প্রতিনিধি হিসেবে)
৩. শামসুল উলামা মাওলানা আবু নসর মোহাম্মদ ওয়াহীদ,
   প্রাক্তন সদস্য, শিক্ষা সার্ভিস

কমিটির উদ্দেশ্য

বাংলার মানুষের বিশেষকরে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠিত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি শিক্ষার সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। ফলে ১৯৩১ খৃস্টাব্দে তদানীন্তন সরকার একই উদ্দেশ্যে "The Muslim Education Advisory Committee" নামে আরেকটি কমিটি নিয়োগ করেন। এ কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে ছিল, বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কি নীতি অবলম্বন করা যায়, সে বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় সদুপদেশ বা পরামর্শ দান করা।

উড-এ্যাবোর্ট রিপোর্ট, ১৯৩৭ খৃ.
(Wood-Abbot Report, 1937)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। এর প্রবাব জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯২১ খৃস্টাব্দের পর হতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩২-১৯৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে এ সংখ্যা আরো অধিকহারে বৃদ্ধি গেলেও সেই অনুপাতে শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটেনি। এটা ছিল নিতান্তই সংখ্যাগত উন্নয়ন। গুণগত উন্নয়নের অভাবের মূলে 'অনুন্নয়ন' ও 'অপচয়ের' প্রভাব ছিল অসামান্য। বেসরকারি জনসাধারণের মতে এটা ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি অসহযোগিতা ও অবহেলার ফল। জনগণ চেয়েছিলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরো অধিকহারে উন্নয়ন। শিক্ষার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা' (Central Advisory Board for Education, CABE) সরকারকে সুদক্ষ উপদেশ (Expert advice) গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। তাই ভারত সরকার শিক্ষা সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণের জন্য মিঃ এ. এ্যাবোর্ট (Mr. A Abbot) ও মিঃ এস.এইচ. উডকে (Mr. S.H. Wood) আমন্ত্রণ জানান। মিঃ এ্যাবোর্ট ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশনের অধীনে টেকনিক্যাল স্কুলের মুখ্য পরিদর্শক এবং মিঃ উড ছিলেন বোর্ড অব এডুকেশনের অধীন ডাইরেক্টর অব ইন্টেলিজেন্স।[৪৬৪] আমন্ত্রিত অতিথিদ্বয় ভারতে আগমনকরত: এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনাপূর্বক তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। পেশকৃত রিপোর্টকে মোটামুটি দু;'ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) মিঃ উড প্রণীত সাধারণ শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা এবং (খ) মিঃ এ্যাকোট প্রণীত বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

[৪৬৪] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ২১০

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা (জাকির হোসেন) কমিটি, ১৯৩৭ খৃ.
(Wardha Scheme, 1937)

ভারতের জাতীয় শিক্ষা এবং বিবর্তনের ইতিহাসে গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রকল্প একটি বিশেষ ও অতি মূল্যবান অবদান। ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার জনক ছিলেন মোহন লাল করমচাঁদ গান্ধী। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাটি ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে তদানীন্তন 'হরিজন পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের সাথে যদি শিক্ষার্থীদের কোন উৎপাদনমুখী হস্তশিল্পের কাজ শেখানো যায় আর ঐ কাজ সম্পাদনের ফাঁকে ফাঁকে কাজটির আগ্রহ শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করলে এবং সেই হস্তশিল্পের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়া হলে শিশুরা একদিকে যেমন অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করবেতেমনি শিক্ষাও পূর্ণতর ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হবে এবং সাথে সাথে শিক্ষাকালেই শিশুরা নিজ নিজ উপার্জনের দ্বারা শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। এরূপ শিক্ষাকে যদি স্বাবলম্বী করা যায়, তাহলে তার ফল নানা দিক হতে মঙ্গলজনক হবে। তাছাড়া গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, দেশকে জাগাতে হলে এ দেশবাসীকে ইংরেজ প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাগানো যাবে না, তাদের বিদেশী শিক্ষার পরিবর্তে দেশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে যে ব্যবস্থা গণশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে গণসংযোগের পথকে উন্মুক্ত করবে। কারণ বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় এদেশবাসীকে দুটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেছে। দেশে রয়েছে অল্প কিছু শিক্ষিত আর চারপাশে ঘিরে আছে অসংখ্য বিপুল নিরক্ষর জনগোষ্ঠী। তাই এ বিপুল জনগোষ্ঠীর কথাই বিশেষভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। তাদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত করে জীবিকার্জনের হাতিয়ারে পরিণত করতে হবে। গান্ধীজীর এ প্রস্তাবটি 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর শিক্ষার্থীরা ও জনসাধারণ স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন।

শিশুরা এ বয়সে উৎপাদনমুখী কাজ করবে এমন কথা অনেকেই সমর্থন করলেন না। পক্ষান্তরে বেশ কিছু সমর্থক এর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। এমন বক্তব্য সরাসরি একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে ভালভাবে সুবিবেচনায় আনার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের আহবান জানান। এতে গান্ধীজী অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন (All India National Education Conference at Wardha) আহবান করা হয়। এ সম্মেলনে গান্ধীজীর শিক্ষাসূত্র খোলামেলাভাবে আলোচিত হয়। প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষাদর্শের মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উপলক্ষে শিক্ষা পরিকল্পনার নানাদিক বিচার বিবেচনা করে শিক্ষাসূচি সংকলনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সভাপতি মনোনীত হন তদানীন্তন বিখ্যাত জ্ঞানতাপস ডঃ জাতির হোসেন। তাঁর নামানুসারে এ কমিটিকে জাকির হোসেন কমিটি নামেও অভিহিত করা হয়।[৪৬৫]

মাদ্রাসা শিক্ষা (মওলা বখ্‌শ) কমিটি, ১৯৪১ খৃ.
(The Madrasha Educaiton (Mawla Baksha) Committe, 1941)

১৯৩৮ খৃস্টাব্দের ২৭শে জুলাই সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য হল, এ প্রদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে উদ্ভূত সমস্যাদি চিহ্নিত করা এবং এতদসংক্রান্ত সুপারিশমালা যথাসময়ে পেশ করা।

কমিটি গঠন

সদস্যগণের নাম	পদবী
১. খান বাহাদুর জনাব মোহাম্মদ মওলা বখশ, এ.ডি.পি.আই, মোহামেডান এডুকেশন, বেঙ্গল	চেয়ারম্যান
২. মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান, এম.এল.সি.	সদস্য
৩. খান বাহাদুর মাওলানা আহমাদ আলী এনায়েতপুরী, এম.এল.সি.	সদস্য
৪. মৌলভী আব্দুর রাযযাক, এম.এল.এ.	সদস্য
৫. মাওলানা শামসুল হুদা, এম.এল.এ.	সদস্য
৬. মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল আযীয, এম.এল.এ.	সদস্য
৭. খান সাহেব মৌলভী আমীনুল্লাহ, এম.এল.এ.	সদস্য
৮. জনাব শাহ্ সৈয়দ গোলাম সারওয়ার, এম.এল.এ.	সদস্য
৯. মৌলভী মোহাম্মদ ইবরাহিম, এম.এল.এ.	সদস্য

[৪৬৫] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

১০. খান বাহাদুর মৌলভী আলফাজ উদ্দিন আহমদ, এম.এল.এ.	সদস্য
১১. খান বাহাদুর মৌলভী মাহতাবউদ্দিন আহমদ, এম.এল.এ.	সদস্য
১২. জনাব মুহাম্মদ বরাত আলী, এম.এল.এ.	সদস্য
১৩. মৌলভী মুহাম্মদ মুসা, অধ্যক্ষ, কলকাতা মাদ্রাসা (কমিটিতে পরবর্তীতে নেয়া হয়)	সদস্য-সচিব
১৪. মৌলভী মোহাম্মদ মোযাম্মেল হক, এম.এল.এ.	সদস্য
১৫. মৌলভী দেওয়ান মুস্তফা আলী	সদস্য
১৬. আলহাজ্ব মাওলানা ডঃ সানাউল্লাহ, এম.এল.এ.	সদস্য
১৭. মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুযযামান ইসলামাবাদী, এম.এল.এ.	সদস্য
১৮. ডঃ মোহাম্মদ যোবায়ের সিদ্দিকী, বিভাগীয় প্রধান, আরবি, ফার্সি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৯. মৌলভী ফজলুর রহমান বাকী, প্রভাষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২০. ডঃ এস. এম হোসাইন, বিভাগীয় প্রধান, আরবি, ফার্সি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২১. ডঃ সিরাজুল হক, প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২২. খান সাহেব মৌলভী জিয়াউল হক, অধ্যক্ষ রাজশাহী মাদ্রাসা	সদস্য
২৩. শামস-উল-উলামা মাওলানা মোহাম্মদ মাযহার প্রভাষক, কলকাতা মাদ্রাসা	সদস্য
২৪. শামস-উল-উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসেন অধ্যাপক, কলকাতা মাদ্রাসা	সদস্য
২৫. মাওলানা আব্দুর রহমান আল-কাশগরী প্রভাষক, কলকাতা মাদ্রাসা।[৪৬৬]	সদস্য

সুপারিশমালা

কমিটি পুরাতন স্কীম মাদরাসার পাঠ্যবিষয়ের সংস্কারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কতকগুলো সুপারিশ পেশ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

১. কলকাতায় একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, যার আওতায় থাকবে ওল্ড-স্কীম ও নিউ-স্কীমভুক্ত সকল প্রকার মাদরাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব। কমিটি অনুধাবন করেন যে, একটি এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ছাড়াও ইসলামি শিক্ষার উন্নয়ন, প্রসার ও গবেষণাসহ সমকালীন সাধারণ শিক্ষার আধুনিক বিষয়েও জ্ঞানার্জন প্রয়োজন।

৫. যখন প্রস্তাবিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে, তখন প্রাথমিকভাবে তা একটি এফিলিয়েটিং ইউনিভার্সিটি হবে। পরবর্তীতে এটাকে এমনভাবে উন্নীত করতে হবে, যাতে পর্যায়ক্রমে এটি একটি শিক্ষাদানকারী ও গবেষণা পরিচালনাকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. কমিটি জোর সুপারিশ করেন যেন সরকার এ ধরনের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় "এ্যাক্ট" দ্বারা এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যে, কমিটির সুপারিশের ব্যাপারে সরকার কোন বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এখানে উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে তদানীন্তনকালের বাংলার বাঘ বিখ্যাত জাতীয় নেতা জনাব এ.কে. ফজলুল হক ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে সম্মিলিত বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন, যার প্রত্যক্ষ উদ্যোগে ও সহযোগিতায় মাওলা বখ্‌শ কমিটি গঠিত হয়। কলকাতা মাদরাসার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন যে,

"My earnest desire to develop Madrasah Education may I intend to bring into existence an Arabic University. I am waiting for the report of the committee

৪৬৬ মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ২১৯-২২০

Dhaka University Institutional Repository

which has been set up for the purpose and I shall do whatever is possible for the implemention of the recommendations of the Committee."

যুদ্ধোত্তর ভারতে শিক্ষা উন্নয়ন (সার্জেন্ট প্রকল্প), ১৯৪৪ খৃ.
(Post-War Education Development in India Sargent Scheme), 1944)

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education, CABE) ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে স্যার জন সার্জেন্টকে চেয়ারম্যান করে যুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় শিক্ষার অবস্থা পর্যালোচনা এবং ঐ সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। জন সার্জেন্ট ছিলেন তখন ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা। কমিটি তার রিপোর্ট দাখিল করেন ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে। এ রিপোর্টটিই 'সার্জেন্ট রিপোর্ট' নামে পরিচিত। ভারতের শিক্ষাসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড (CABE) এযাবৎ যেসব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন বস্তুত সার্জেন্ট রিপোর্ট হল সেইগুলোরই সর্বসম্মত, সংহত ও পূর্ণাঙ্গরূপ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ কমিটির লক্ষ্য ছিল অন্তত ৪০ বছরের চেষ্টায় ভারতীয় শিক্ষার মানকে সমসাময়িক ইংল্যান্ডের শিক্ষা মানের পর্যায়ভুক্ত করা।

প্রাক-স্বাধীনতা শিক্ষা সংস্কার (১৯৪৭-১৯৭১)

পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রচলন না করে প্রকা-স্বাধীনতা আমলের বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করে এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেগ গ্রহণ করে। এ সকল কমিশন ও কমিটির সুপারিশ যদিও কখনো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি তথাপিপ তাদের সুপারিশসমূহ শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে এবং শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো তৈরী, সিলেবাস-কারিকুলাম প্রস্তুত, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শ্রেণীবিন্যাসে সাহায্য করে। এ সমস্ত কমিটি ও কমিশনগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ শাসনোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা
(১৯৪৭-১৯৭১খৃ.)

পাক-ভারত উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তারে বৃটিশ সরকার খুব বেশী উৎসাহী ছিল না। কেবল তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য তারা কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। খুব সুকৌশলে তারা কিছু সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর লোককে শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। তাদের মাধ্যমেই তাঁরা অন্যের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেবার নীতি গ্রহণ করে। ইউরোপিয়রা এদেশে আগমনের প্রথম হতেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহী না হয়ে রাজ্য-বাণিজ্য ও খৃস্টান ধর্ম প্রচারে তারা অধিক আগ্রহী ছিল।

মাদ্রাসা সিলেবাস (সৈয়দ মুয়াযযামুদ্দীন হোসেন) কমিটি, ১৯৪৭খৃ.
(Sayed Muazzamuddin Hossain) Committee, 1947)

মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য যে সব কমিটি এতদিন হয়েছিল তার মধ্যে মুয়াযযামুদ্দীন কমিটি বাস্তবিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এই কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই।[৪৬৭]

কমিটি গঠন ঃ

১.	মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, বঙ্গদেশ	চেয়ারম্যান
২.	খান বাহাদুর, এম.এ. মোঃ আসাদ, জনশিক্ষা পরিচালক, বঙ্গদেশ	সদস্য
৩.	এ.ডি.পি.আই., মুসলিম শিক্ষা, বেঙ্গল	সদস্য
৪.	অধ্যক্ষ, আলিয়া মাদরাসা, কলকাতা	সদস্য
৫.	শামস-উল উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসেন, হেডমৌলভী আরবি বিভাগ, আলিয়া মাদ্রাসা, কলকাতা।	সদস্য
৬.	মৌলভী এ.এইচ.এম. মহিউদ্দিন, প্রভাষক	সদস্য

[467] Histroy of Traditional Islamic Education in Bangladesh, Dr. AKM Ayub Ali, P-121

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

৭. এম. মুয়াযযাম হোসেন, প্রভাষক, — সদস্য
আরবি ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৮. খান সাহেব এ.এফ.এম. আবদুল হক — সদস্য
বিশেষ কর্মকর্তা, ডি.পি.আই. অফিস, বেঙ্গল

৯. মাওলানা মোঃ রুকন উদ্দিন, এম.এল.এ — সদস্য

১০. খান বাহাদুর মোঃ ওয়াহিদুল্লাহ, এম.এ., অধ্যক্ষ — সদস্য
ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, সিরাজগঞ্জ

১১. আই.এইচ.পি-এইচ.ডি.অধ্যক্ষ,ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা — সদস্য

১২. মাওলানা ওবায়দুল হক, সুপার, ফেনী সিনিয়র মাদ্‌রাসা, নোয়াখালী — সদস্য

১৩. সুপার, দারুল ইলুম মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম — সদস্য

১৪. খান সাহেব, সৈয়দ মুজাফ্ফর উদ্দিন — সদস্য
প্রফেসর, আরবি ও ফার্সি বিভাগ, ইসলামিয়া কলেজ, কলকাতা

১৫. শামস-উল উলামা মাওলানা আবু নসর ওয়াহেদ, এম.এ.,আই.ই.এস. — সদস্য

১৬. শামসুল ওলামা খান বাহাদুর মোঃ মুসা, এম.এ. — সদস্য

১৭. এম. হাসান, এম.এ., ডি.ফিল. (অক্সন) — সদস্য
ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. মাননীয় এফ রহমান, এম.এল.এ. মন্ত্রী, বিডি,নিউ ডিপার্টমেন্ট — সদস্য

১৯. মাওলানা তাফাজ্জল হোসেইন খান — সদস্য
অধ্যক্ষ, সারসিনা সিনিয়র মাদ্‌রাসা, বাকেরগঞ্জ[৪৬৮]

সুপারিশমালা

১. বাংলার মুসলমানদের যথাযথ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে একটি "মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপন করা অপরিহার্য, যাতে মুসলমানরা তাদের লালিত ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় বিষয়ক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং সর্বোপরি মাদরাসা শিক্ষা একটি সুষ্ঠুভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

ক. মুসলমান ছেলে-মেয়ের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয়গুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। আর তা হবে ইসলাম ধর্মের আদর্শের আলোকে। মুসলমান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য মক্তবগুলোকে পুনর্গঠন করতে হবে।

খ. মুসলিম ছেলে-মেয়েদের জন্য চিহ্নিত স্কুলগুলোতে তৃতীয় শ্রেণী হতেই বাধ্যতামূলকভাবে আরবি বিষয় পড়াতে হবে।

গ. সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা ইসলামি নীতিশিক্ষাসহ পবিত্র কুরআন পাঠের জন্য সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে।

পর্যালোচনা ও সমালোচনা

ইংরেজ শাসনের অবসান হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য যুগে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এদেশের শিক্ষার উন্নতিতে যে আশা পোষণ করতেন তাতো পূরণ হয়নি বরং তাদেরকে নানান সময়ে নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। ফলে তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিতই রয়ে যায়। তারা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সৃজনশীলতা ও উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ করে যেতে সক্ষম হয়নি। তাই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিতদের অধিকাংশরই কাম্য ছিল শুধু সরকারি চাকরি। তাই আলোচ্য যুগে উচ্চশিক্ষার ব্যাপক বিস্তারলাভ হলেও তা জীবনের চাহিদার জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ এদেশের মানুষ বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হলেও কারো কারো স্বেচ্ছাচারিতা, সুযোগপ্রিয়তা এবং আঞ্চলিকতা প্রভৃতি কলুষতা সাধারণ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে ঈপ্সিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্তুষ্টি সাধন সম্ভব হয়নি। তাই এ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার দরুন একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা, উদ্যম ও উদ্যোগের

---

[৪৬৮] Report on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal, Dr. Sekander Ali Ibrahimi, P-586-588

Dhaka University Institutional Repository

অভাব দেখা দেয়, অন্যদিকে তেমনই দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও শঠতার প্রসার লাভ করে। ফলশ্রুতিতে এর প্রতিকারকল্পে নিপীড়িত বাঙ্গালীদের পক্ষে সক্রিয় আন্দোলন করা ছাড়া বিকল্প কিছুই ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এহেন জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আশু সমাধান না করে সংখ্যাগুরু জনমতকে দমিয়ে রাখার প্রয়াস ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। অবশ্য পাকিস্তান সরকার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনও গঠন করে এর সমাধানের উপায় খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু সুপারিশগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হবার ফলে সমস্যা সমস্যাবর্তে রয়ে গেছে, কোন সুরাহা হয়নি।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষা কমিশন ও কমিটি পূর্ববঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন (মাওলানা আকরাম খান) কমিটি, ১৯৪৯-৫১

(East Bengal Education System Reconstruction Committee, 1949-51)

শিক্ষা জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির চাবিকাঠি এবং দেশের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখে এ উপমহাদেশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এ সদ্যজাত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারায় এক ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পরিবর্তন অবস্থার চাহিদা পূরণার্থে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার বহু কমিশন ও কমিটি গঠন করে দেশে প্রচলিত বৃটিশ প্রবর্তিত ত্রুটিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য প্রয়াস চালান। কারণ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই একটি স্বাধনি মুসলিম দেশে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় ভেবে ইসলামি ভাবধারায় নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জনগণও সোচ্চার দাবী তোলেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ে সারা দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে করাচিতে একটি শিক্ষা অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনের সুপারিশমালার আলোকে দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সময়োপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে সরকার প্রয়াসী হন। জনগণের অনুভূতির প্রতি অনুকূল সাড়া দিতে গিয়ে সরকার ১৯৪৯ খৃস্টাব্দের ১৬ই মার্চ শিক্ষাসমস্যাকে ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খানের সভাপতিত্বে ১৭ সদস্যের একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। কমিটির সভাপতির নামানুসারে এটি **'আকরাম খান শিক্ষা কমিটি'** নামে পরিচিত।

কমিটি গঠন ঃ

	কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম	পদবী
১.	মাওলানা মোঃ আকরাম খান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক	সভাপতি
২.	ডঃ মোয়াজ্জাম হোসেন, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	মৌলভী মোঃ ইব্রাহিম খান প্রেসিডেন্ট, ইস্টবেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড	সদস্য
৪.	মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী, হেড মৌলভী, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা	সদস্য
৫.	মাওলানা রোকন উদ্দিন, এম.এল.এ.	সদস্য
৬.	মৌলভী আব্দুল হাকীম বিক্রমপুরী, এম.এল.এ.	সদস্য
৭.	খান বাহাদুর আব্দুল হাকীম সহকারি জনশিক্ষা পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা	সদস্য
৮.	জনাব এ.এফ.এম. আব্দুল হক সহকারি জনশিক্ষা পরিচালক, মুসলিম শিক্ষা	সদস্য
৯.	মৌলভী আলী নূর, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা

১০. জনাব এস.এম.কিউ. জুলফিকার আলী — সদস্য
বিদ্যালয় পরিদর্শক, বাকেরগঞ্জ রেঞ্জ

১১. জনাব মোঃ শামসুল হক — সদস্য
অধ্যক্ষ, প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ

১২. মিস রাবেয়া খাতুন, প্রধান শিক্ষিকা, সরকারি গার্লস স্কুল, সিলেট — সদস্য

১৩. মৌলভী মোঃ সোলায়মান চৌধুরী, প্রফেসর, এন.সি কলেজ, সিলেট — সদস্য

১৪. জনাব এল. আসাদ — সদস্য
ডাইরেক্টর অব ইসলামিক রিকনস্ট্রাকশন, পশ্চিম পাঞ্জব

১৫. বাবু এস.এন. সেন গুপ্ত, অধ্যক্ষ, বি.এম. কলেজ, বরিশাল — সদস্য

১৬. বাবু রাজ কুমার দাস, বিশেষ কর্মকর্তা, সিডিউলড কাস্ট এডুকেশন, গভর্ণমেন্ট অব ইস্ট বেঙ্গল — সদস্য

১৭. রেভারেন্ড ব্রাদার জুড, প্রধান শিক্ষক, সেন্ট গ্রেগরীজ উঃ বিঃ, ঢাকা — সদস্য

ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষা

৯. ধর্মকে মুসলমান শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় করতে জবে। অমুসলমানদের ক্ষেত্রে ন্যায় ও নৈতিক শাস্ত্রকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেয়া যেতে পারে যদি তারা স্বীয় ধর্মে অধ্যয়ন করতে না চায়।[৪৬৯]

পর্যালোচনাঃ

কমিটি সকল মুসলমান শিক্ষার্থীর জন্য ধর্মকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করার পাশাপাশি অমুসলমানদের ক্ষেত্রে ন্যায় ও নৈতিক শাস্ত্রকে সাধারণ বিষয় হিসেবে দেয়ার সুপারিশ করেে ছ যদি তারা স্বীয় ধর্ম অধ্যয়ন করতে না চায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিকতা ও নৈতিকতা মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় মাওলানা আকরাম খানের এ সুপারিশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

পূর্ববঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা উপদেষ্টা (আশরাফুদ্দিন চৌধুরী) কমিটি রিপোর্ট-১৯৫৬ খৃ.

(The Advisory Committee for Madrasah Education, East Bengal, 1956) (Ashraf Uddin Chowdhury Committee Report)

পূর্ব বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৫ খৃ. এর সিদ্ধান্তের আলোকে তদানীন্তন সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির নাম ছিল পূর্ববঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি। (The Advisory Committee for Madrasah Education)। জনাব আশরাফুদ্দিন চৌধুরী এ কমিটির চেয়ারম্যান মনোনিত হন। তার নামানুসারে এ কমিটি আশরাফুদ্দিন চৌধুরী কমিটি নামে খ্যাত।এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ২০ ডিসেম্বর ১৯৫৫।

ক. কমিটি গঠন ঃ

জনাব আশরাফুদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে একুশ সদস্য-বিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়। পূর্ণ কমিটির সদস্যরা ছিলেন নিম্নরূপ ঃ

সদস্যগণের নাম	পদবী
১. জনাব আশরাফুদ্দিন চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী, পূর্ববঙ্গ	চেয়ারম্যান
২. মৌলভী সৈয়দ মুবারক উদ্দিন হোসেন পরিচালক জনশিক্ষা, পূর্ববঙ্গ	ভাইস চেয়ারম্যান
৩. মাওলানা উবায়দুল হক, জামিয়াতুল মুদাররেসীন	সেক্রেটারী
৪. জনাব এ.এক.এম. আব্দুল হক ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা	সদস্য

[৪৬৯] যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ২৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী	সদস্য
৬. মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, এম.এল.এ.	সদস্য
৭. মৌলভী মকবুল আহমেদ অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা	সদস্য
৮. প্রফেসর এ.এম. আহমেদ আহসানুউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকা	সদস্য
৯. জনাব এম.এ. আযম, অধ্যক্ষ, তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা	সদস্য
১০. ডঃ এ.কে.এম. আইউব আলী, এম.এ, পি-এইচ.ডি.	সদস্য
১১. মাওলানা মুফতি আমীমুল ইহসান হেডমৌলভী, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা	সদস্য
১২. ডঃ সেরাজুল হক, এম.এ.পি.-এইচ.ডি. বিভাগীয় প্রধান, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩. মাওলানা আশরাফ আলী	সদস্য
১৪. মাওলানা যিয়াউল হক প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা	সদস্য
১৫. মাওলানা বেলায়েত হোসেন প্রাক্তন হেডমৌলভী, কলকাতা মাদ্রাসা	সদস্য
১৬. মাওলানা এস.শরফুদ্দিন, এম.এ., বি.এল	সদস্য
১৭. মাওলানা এ.এইচ.মুহসেনউদ্দিন, এম.এল.এ.	সদস্য
১৮. মাওলানা আবু নসর মোহাম্মদ নজীবুল্লাহ অধ্যক্ষ, মুস্তাফারিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া	সদস্য
১৯. মাওলানা মিয়া মোহাম্মদ কাসেমী অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, সিরাজগঞ্জ	সদস্য
২০. মৌলভী এ.এস.মাহমুদ	সেক্রেটারী[৪৭০]

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার কি কি ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা চিহ্নিত করা এবং প্রচলিত উভয় ধারার শিক্ষা সমন্বিত করার লক্ষ্যে কমিটি সুপারিশ পেশ করেন।

পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সংস্কার (আতাউর রহমান খান) কমিশন, ১৯৫৭
(The Education Reforms Commission, East Pakistan, 1957)

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও বাস্তবিকভাবে শিক্ষার কোন উন্নয়ন হয়নি। এমনকি ১৯৫২ খৃস্টাব্দেই মাওলানা আকরাম খান কমিশনে বহু মূল্যবান সুপারিশ করা হলেও সুপারিশসমূহের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলত পুঁথিকেন্দ্রিক ও সেকেলে প্রকৃতির। জীবন ও যুগের চাহিদার নিরিখে পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পূর্ণ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রদেশের সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান।

চেয়ারম্যানের নামানুসারে এ কমিশন রিপোর্ট "আতাউর রহমান খান কমিশন রিপোর্ট" নামে পরিচিত। এ কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার, মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ওপর কতিপয় গুরুত্ব সুপারিশ পেশ করেন।

কমিশনের দায়িত্ব ঃ

১. পর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সকলস্তরের সংস্কার ও পুনর্গঠনের সুপারিশ করতে বলা হয়।

২. কমিশনকে ৩রা মার্চ ১৯৫৭ খৃ.-এর মধ্যে প্রদত্ব দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়।

[৪৭০] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

কমিশন গঠন ঃ

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের চীফ মিনিস্টার জনাব আতাউর রহমানকে চেয়ারম্যান করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে ১৯৫৭ খৃস্টাব্দে ৩রা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান সরকার "শিক্ষা সংস্কার কমিশন" নামে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করেন ঃ

কমিশনের সদস্যরা হলেন–

১.	জনাব আতাউর রহমান খান, চীফ মিনিস্টার, পূর্ব পাকিস্তান	চেয়ারম্যান
২.	ডঃ মাহমুদ হাসান চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পূর্ব পাকিস্তান	সদস্য
৩.	ডঃ মোঃ কুদরাত-ই-খুদা, রেজিওনাল লাবরেটরীজ, তেজগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৪.	জনাব আখতার হামিদ খান, অধ্যক্ষ, ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা	সদস্য
৫.	জনাব আবু লাইস, প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক (ডি পি আই), আসাম ও হুগলী	সদস্য
৬.	ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দে, প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭.	জনশিক্ষা পরিচালক (ডি পি আই), পূর্ব পাকিস্তান	সদস্য-সচিব[৪৭১]

ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সুপারিশ

মাধ্যমিক শিক্ষা

সিনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষাক্রমে ভাষা, সমাজপাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র ধর্মশিক্ষা অথবা নীতিশিক্ষা, চিত্রকলা এবং সঙ্গীত, হস্তশিল্প, শরীর চর্চা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি থাকবে। এগুলোর মধ্যে ভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সমাজ পাঠ ও একটি হস্তশিল্প আবশ্যিক বিষয়রূপে গৃহীত হবে।

সিনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষাক্রম বহুমুখী হবে। যেমন- মানবতামূলক তত্ত্বশিক্ষা, বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলামিক শাস্ত্র প্রভৃতি।[৪৭২]

পর্যালোচনাঃ

তদান্তীন পূর্ব পাকিস্তানের চীফ মিনিস্টার জনাব আতাউর রহমান খানকে চেয়ারম্যান করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন করার লক্ষ্যে ১৯৫৭ সালের ৩রা জানুয়ারী সরকার 'শিক্ষা সংস্কার কমিশন' নামে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতানিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দেয়া হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করার সুপারিশ করা হয়। সুপারিশের ভিত্তি ১৯৫৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড বিলুপ্ত করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ন্যস্ত করা হয়। কমিশন সকল স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করার প্রস্তাব করে। মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তে তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়। কমিশনের এ প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করার পূর্বেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটে। কমিটি ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নীতি শিক্ষার কথা বলেছে এবং মানবতামূলক তত্ত্বশিক্ষার কথা বলেছে। পাশাপাশি অন্যান্য সব বিষয়ের সাথে ইসলামিক শাস্ত্রকে আলাদাভাবে উল্লেখ করে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

জাতীয় শিক্ষা (এস.এম. শরীফ) কমিশন রিপোর্ট, ১৯৫৯ খৃ.

(The Commission on National Education, 1959)

১৯৫৮ খৃস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান কমিশনের উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ও

[৪৭১] Report of the Sub-Committee of the Advisory Committee for Madrasha Education, East Bengal, 1966, Page No.1.

[৪৭২] Report of the Educational Reforms Commission East Pakistan, 1957 (Ataur Rahman Khan Commission), Page No.1.

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দেন এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যমানসমূহ আরো সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হতে পারে এমন একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ জানান।

কমিটি গঠন[৪৭৩]

১.	জনাব এস.এম. শরীফ সেক্রেটারী, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিম পাকিস্তান	চেয়ারম্যান
২.	ডঃ রাজিউদ্দিন সিদ্দীকী, সদস্য, আনবিক শক্তি কমিশন	সদস্য
৩.	কর্ণেল এম.কে. আফ্রিদী ভাইস চ্যান্সেলর, পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	জনাব বি.এ. হাশমী, ভাইস-চ্যান্সেলর, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	ডঃ মোমতাজুদ্দিদন আহমদ, ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	জনাব এ.এফ.এম. আবদুল হক প্রেসিডেন্ট সেকেন্ডারি, এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা।	সদস্য
৭.	প্রফেসর আতোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮.	ডঃ রশীদ, অধ্যক্ষ, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	সদস্য
৯.	ডঃ আর, এম. আইইং, ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, লাহোর	সদস্য
১০.	কর্ণেল মোহাম্মদ খান, পরিচালক, সামরিক শিক্ষা (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিনিধি)	সদস্য
১১.	ব্রিগেডিয়ার এস. হামিদ শাহ, ডাইরেক্টর অব অর্গানাইজেশন, জেনারেল হেড কোয়ার্টার[৪৭৪]	সদস্য

ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়

১. মানব জাতির ইতিহাসে ধর্মই সভ্যতার প্রধান জীবনীশক্তিরূপে কাজ করিয়া আসিয়াছে। ধর্মবিশ্বাসই মানুষকে সততা ও পূণ্যে পথের দিকে পরিচালিত করিয়াছে। সর্বশক্তিমানের উপর ভক্তি মানুষের অহমিকা ও দাম্ভিকতাকে খর্ব করিয়া তাহাকে সংযমী ও বিনয়নম্র করিয়া তোলে। যে কৌতুহলে ও বিস্ময়বোধ অজানাকে জানার আগ্রহে মানুষকে উদ্দীপিত করিয়াছে এবং সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূলে কাজ করিয়াছি, ধর্মই তাহার একমাত্র উৎস। ধর্মীয় নির্দেশাবলীর মানুষের জীবনকে আদর্শের অনুসারী করিয়া গড়িয়া দিয়েছে এবং তাহাকে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার ও অসম-সাহসিকতার কাজে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। লোকাতীত সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের ভালবাসা তাহার বৃত্তিনিচয়কে মহানরূপে দান করিয়াছে, তাহার সৌন্দর্যবোধ গড়িয়া তুলিয়াছে এবং আপন রুচিবোধ অনুযায়ী শিল্পকলা সৃষ্টিতে তাহাকে প্রেরণা যোগাইয়াছে। ধর্মীয় সম্পর্ক ব্যাক্তিকে সুসংহত দলে এবং সেই দলকে ভ্রাতৃত্ববোধের একটি ক্রম সম্প্রসারণশীল বন্ধনে বাধিয়া দিয়াছে এবং মানুষকে সর্বাপেক্ষা মহান আদর্শ ও আশাআকাঙ্খা পথে চলার অনুপ্রেরণা দিয়াছে। ইহা মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদিকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ধর্মই একমাত্র শক্তি যাহা সমাজকে একটা সুসংহত সমষ্টিরূপে গড়িয়া তুলিতে পারে।

২. মানুষের অর্থাৎ তাহার দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণাঙ্গ ও সুষম উন্নয়নই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কাজেই মৌলিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মানব-সভ্যতার ভিত্তি, শিক্ষার মধ্য দিয়াই তাহার বিকাশ হওয়া প্রয়োজন এবং এই দিকেই মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিবদ্ধ থাকা উচিত। এই কার্য সম্পাদন করিতে হইলে মানবিক ক্ষেত্রে ধর্মের যে প্রভাব সহানুভূতি, সহনশীলতা, আত্মত্যাগ ও সমাজ সেবার মনোভাবের বিকাশ ও তার প্রসার সাধন করে এবং মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ দূর করে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাহার দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে হইবে। আল্লাহতায়ালা এবং নবীদের উপর ভক্তির একটি সুফল হইল এ যে, উহা আত্মাকে উন্নত মর্যাদার অধিকারী করে এবং মনকে মানব জাতির ঐক্যের উপলব্দির দিকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়।[৪৭৫]

---

[৪৭৩] এফ ১৬-৯-৫৮ ই-৩ দাপ্তরিক আদেশ।

[৪৭৪] Report of the Commission on National Educaiton, 1959 (SM Sharif Commission Report), Page No.1.

[৪৭৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ধর্ম ও উহার মহান নৈতিক সুফল হইতে যে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশ পাওয়া যায়, পাকিস্তানে তাহার একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। আমাদের দেশে কয়েক প্রকারের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণ প্রচলিত। এইসব ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই মুসলমান। এই কারণে ইসলাম ধর্মশিক্ষা এদেশে একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকে তার বিবেক ও আত্মার কাছে পরিচ্ছন্ন থাকতে হইলে তাহাকে ইসলাম এবং উহার নীতি ও আদর্শ হইতে প্রেরণা গ্রহন করিতেই হইবে।[৪৭৬]

৪. ধর্মীয় শিক্ষা এমন কিছু করিবে না যাহার ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে দেশের ঐক্যের ক্ষতি হইবে। পক্ষান্তরে, উহা সহনশীলতার মনোভাব গড়িয়া তুলিয়া এবং পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়া এই ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করিবে। ধর্মকে গোঁড়ামি, কুসংস্কার অথবা কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠানরূপে পেশ করা চলিবে না। যে শ্রেণীগত বা সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের ফলে জাতীয় ঐক্যের ক্ষতি হইতে পারে, স্কুলের ধর্ম শিক্ষায় তাহার কোন স্থান থাকা উচিত নয়।

৫. ইসলাম মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায়বিচার, সাম্য এবং মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা শিক্ষা দেয় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে সাধুতা, ধর্মপরায়ণতা ও পূণ্যের উপর গুরুত্ব দিয়া থাকে। কাজেই ধর্মকে এইভাকে পেশ করিলেই তবে উহা ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

বিভিন্ন স্তরে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশ

প্রথম শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণী ঃ

১. সকল ছাত্র পবিত্র কোরাণশরীফ (নাজিরা) পাঠ করিতে শিখিবে।
২. কলেমা, নামাজে ব্যবহৃত সূরা শিক্ষা সকল মুসলিম ছেলেমেয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে। পবিত্র কোরআনশরীফ হইতে আরও কয়েকটি সুরা মুখস্থ করিতে হইবে।
৩. পবিত্র কোরআনশরীফ, হজরতের জীবনী, মুসলিম ইতিহাস, শিক্ষা ও সাহিত্য হইতে গৃহীত উপাখ্যান ও উপদেশপূর্ণ গল্প ইসলামিয়াৎ সম্পর্কিত পুস্তকে সন্নিবেশ করিতে হইবে। উহা সহজ সরল ও আকর্ষণীয় ভাষায় পরিবেশন করিতে হইবে এবং উহাতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ব্যাখ্যা করিতে হইবে।[৪৭৭]
৪. পবিত্র কোরাণশরীফ হইতে সামাজিক সৎকার্য বাস্তবক্ষেত্রে সাধূতা শিক্ষামূলক আয়াতের সংগ্রহ সিলেবাসের অর্ন্তভূক্ত করা যাইতে পারে এবং তরজমা সহ উহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ছাত্রদিগকে এইরূপ আয়াত আবৃত্তিতে সক্ষম হইতে হইবে।[৪৭৮]

৯ম হইতে ১২শ শ্রেণী ঃ

৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে ধর্মশিক্ষাকে ইচ্ছাধীন বিষয় হিসাবে প্রবর্তন করিতে হইবে
১১শ ও ১২শ শ্রেণীতে ধর্মশিক্ষা ইসলামিক স্টাডিজ-এর অঙ্গীভূত হইবে এবং উহা ইচ্ছাধীন বিষয় হিসেবে শিক্ষা দিতে হইবে।

ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার দায়িত্ব গ্রহন এবং উহাকে উহার সত্যিকাররূপে ছাত্রদের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হইলে তুলনীয় অন্যান্য ধর্ম এবং বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পুরোপুরি জ্ঞান থাকিতে হইবে। তাহা হইলেই মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা তাহারা পরিচ্ছন্ন ও শক্তিশালীভাবে পেশ করিতে সক্ষম হইবেন। তাহাদিগকে ইসলামের ব্যাখ্যাদানে এবং আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা ও আধূনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাজের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী চিন্তাধারা হিসাবে উহাকে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, পবিত্র কোরাণশরীফ এবং হজরতের জীবনের আলোকে বাস্তব জীবন বিধি হিসাবে ক্রমবর্ধমা ন

---

[৪৭৬] এস. এম. শরীফ কমিশন, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ২৫৩।
[৪৭৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২৫৪।
[৪৭৮] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

বিচার বিবেচনার দ্বারা ইসলামের মূল্যবান করতে হইবে। ইসলামের সেই সাবেক উদার ও যুক্তিবাদীরূপকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং আধুনিক জীবনের সমস্যার ক্ষেত্র উহাকে প্রয়োগ করিতে হইবে।[৪৭৯]

ইসলামিয়াতে অভিজ্ঞ ব্যাক্তি ও উহার শিক্ষকগণকে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হইতে হইবে। তাহাদিগকে বর্তমান যুগের প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের মর্ম ও প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে হইবে এবং ইসলামের ব্যাখ্যায় অবাধে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে। স্ব স্ব বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা ছাড়াও ইসলামিক স্টাডিজ এর শিক্ষকদের সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের একটিতে অর্থ্যাৎ অর্থনীতি, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, মানস্তত্ত্ব, অথবা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের মধ্যে অন্তত একটি বিষয়ে যুগোপযোগী জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। তাহাদিগকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মর্ম প্রকৃতির অন্তর্নির্হিত তাৎপর্য ও নীতি অনুধাবনেও সক্ষম হইতে হইবে।[৪৮০]

গবেষণা ঃ

ইসলামী শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আনার উপর আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। প্রকৃতির ধর্ম হিসেবে ইসলামের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন হইতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতি প্রকৃতির গূঢ় নিয়মের উদ্ঘাটন ব্যাতীত আর কিছুই নয়। ইহার ফলে মানুষ প্রকৃতির এই সব শক্তিকে নিয়ন্ত্রন করিতে ও উহাকে আপন উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োগ করিতে পারিবে। ইহা এমন একটি দায়িত্ব যাহা ইসলাম সকল মুসলিমকেই সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনশরীফে প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত চিন্তাশীলতার উপর গুরুত্বআরোপ করা হইয়াছে। ইহা মানুষের জ্ঞানের পরিধির ক্রম-বিস্তৃতির স্বীকৃতি এবং বিভিন্ন পরিবেশ পরিবর্তিত আকারে ইসলামের মৌলিক নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ইশারা। ইসলামের তাৎপর্য শাশ্বত এবং অবিনশ্বর। যুগে যুগে স্বাভাবিক প্রয়োজনে ইহার নতুন রূপ ও নতুন উপলব্ধির সন্ধান করিতেই হইবে।[৪৮১]

ইসলামী চিন্তাধারা, ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি আধ্যায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতে যথেষ্ট সচেতন মনোভাব বিরাজ করিতেছে। এই সব বিষয়ে অধ্যয়নের ব্যাপারে পাকিস্তান নিজেকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত দেশরূপে তাহাদের সামনে পেশ করিতে পারে। সুতরাং অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী বিদেশীদের আকর্ষণের জন্য আমাদের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাফল্যের উচ্চমানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন।[৪৮২]

পর্যালোচনাঃ

কমিশন গঠনের এফ: ১৬-৯-৫৮ইং ৩নং দাপ্তরিক আদেশ বলে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী জনাব এস.এম. শরীফকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্যের 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৯ সালের ৫ই জানুয়ারী পাকিস্তানের তদান্তীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইউব খান কমিশনের উদ্বোধন করেন।

কমিশন দেশের স্বাধীনতা ও সংহতির সাথে সম্পৃক্ত জাতীয় আদর্শ ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা এবং কর্মভিত্তিক ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তন করাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করে। শিক্ষাকে সার্বজনীন জাতীয় আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে অষ্টম শ্রেণী পর্যনন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ করে। প্রথম শ্রেণী হতে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিয়াত একটি বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় হিসবে রাখার সুপারিশ রাখা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব করে নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ ও আধুনিক শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় সাধনের সুপারিশ, জাতীয় ভাষা উর্দু ও বাংলার দুর্বলতা দূর করা এবং ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে চালুর সুপারিশ করে। কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হলেও পরবর্তীতে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের মুখে রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায়।

কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধর্ম শিক্ষার আবশ্যকতা জাতির সামনে তুলে ধরেছে। বিশেষত ইসলাম ধর্মের মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধ ন্যায় বিচার সাম্য এবং মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা পতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে।

[৪৭৯] প্রাগুক্ত, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ২৫৫।
[৪৮০] প্রাগুক্ত, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ২৫৬।
[৪৮১] এস. এম. শরীফ কমিশন, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ২৫৬।
[৪৮২] এস. এম. শরীফ কমিশন, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

ছেলেমেয়েদের বয়সের সাথে সাথে নৈতিক ও বুদ্ধিগত বিকাশের ও পরিবর্তন হয় তাই প্রত্যেক স্তরে এমনভাবে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে যা ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মিটানোর উপযোগী হয়। এ বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়েছে কমিটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরে ধর্ম শিক্ষাকে আবশ্যক হিসেবে রাখতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে পাশাপাশি প্রত্যেক প্রদেশে ইসলামিক স্টাডিজের ইনষ্টিটিউট থাকার কথা বলা হযেছে।

ইসলামের উপর ব্যাপক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদেরকে চিন্তাধারার চলতি গতি প্রকৃতি সম্পর্কে সুপারিশ করেছে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কমিটি মেডিকেল শিক্ষায় নৈতিকতা কোর্স অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছে। এক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের অবদানের কথা ও বিশ্লেষন উল্লেখ করার সুপারিশ করেছে। এ রিপোর্ট ও নৈতিক শিক্ষার কথা বলা হলেও ৯ম ও ১০ম শ্রেণী ইসলামিক স্টাডিজকে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে যা বক্তব্যের সাথে সামঞ্জ্যপূর্ণ নয়। নৈতিকতার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বক্তব্যের যথার্থতার জন্য ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ থাকলে ভারো হতো।

ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, ১৯৬৩-৬৪ খৃ

(Islami-Arabic University Committee, 1963-64)

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ পাদপীঠ হিসেবে দেশে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে দেশের মাদ্রাসা ছাত্র ও ইসলামদরদী জনতার আন্দোলন দিনদিন তীব্রতর হতে থাকে। এ আন্দোলনের চাপের মুখে বাধ্য হলে তদানীন্তন সরকার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস প্রদান করেন। সরকার তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ খৃস্টাব্দের ৩১শে মে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর এবং আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করেন।
এ কমিটি পূর্ণ এক বছর কঠোর পরিশ্রম করে কর্ম পরিধি মোতাবেক কার্য সম্পাদন করতঃ ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রিপোর্ট জমা দেন।

ক. কমিটির উদ্দেশ্য ঃ

মাদ্রাসা শিক্ষার পুনর্গঠনের প্রশ্নটির ব্যাপারে সরকার পূর্ব থেকেই চিন্তা ভাবনা করে আসছিল। এ ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং একটি কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা পূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করতঃ সরকারের নিকট পেশ করেন।

খ. কমিটি গঠন ঃ

এ উদ্দেশ্যে সরকার ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ দান করেন। এ কমিশনের সভাপটতি করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের প্রধান ডঃ এস. এম. হোসেনকে। তার নামানুসারে এ কমিশন "মুয়াযযাম হোসাইন কমিটি" নামেও খ্যাত।
কমিটির গঠন নিম্বরূপ ঃ

১.	ডক্টর এস.এম. হোসাইন, ডি.ফিল. (অক্সন) বিভাগীয় প্রধান, আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	চেয়ারম্যান
২.	ডঃ এম.ও.গণী. পি-এইচ.ডি (লণ্ডন) ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	ডঃ মমতাজ উদ্দিন আহমদ, ডি.লিট. (প্যারিস) ভাইস-চ্যান্সেলর, লাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪.	ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ডি.লিট. (প্যারিস) প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা ও রেজিস্ট্রার পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

৬. আলহাজ্ব সুফী জনাব আবু জাফর মুহাম্মদ সালেহ পীর সাহেব, শর্ষিনা — সদস্য

৭. জনাব মোঃ সাইফুদ্দিন ইয়াহ্ইয়া, এম.এ — সদস্য

৮. মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা — সদস্য[৪৮৩]

ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সুপারিশ

ইসালামি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিতে হবে এবং ইসলামি বিষয়ে গবেষণার উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।"২৩

ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা, বাংলা, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ, অনুষদের উচ্চ স্তরে শিক্ষার মাধ্যম আরবি কিংবা বাংলা ও হতে পারে।[৪৮৪]

এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মূল লক্ষ্য হল যে, এ বিশ্ববিদ্যালয় এমন হবে যেখান থেকে আধুনিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ইসলামিক স্কালার্স ও অত্যন্ত বিজ্ঞজন পন্ডিত ব্যক্তিত্ব বের হয়ে আসবে যারা ইসলামকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্বের অধুনা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে চিত্রিত করে ব্যাখ্যাদানে সক্ষম এবং একই সাথে মর্যাদাপূর্ণ সুন্দর জীবন যাপনের উপকরণ অর্জনে পারঙ্গম হবেন।

এর অন্যান্য লক্ষ্য হবে এদেশের যুবক ও তরুণদের সমকালীন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বাস্তব শিক্ষাসহ ইসলামি বিষয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ উন্নত চরিত্রের অধিকারী নাগরিক সৃষ্টি করা। যাতে তারা নিজেদেরকে সুযোগ্য ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।[৪৮৫]

পর্যালোচনাঃ

আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন ইসলামী পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞ তৈরী করে মুসরিম বিশ্বের উপযোগী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই প্রস্তাবিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। কমিটির সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা পেশ করেছেন যা পরবর্তী কালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

ছাত্র-সমস্যা ও কলাণ সম্পর্কীয় (হামুদুর রহমান) কমিশন রিপোর্ট, ১৯৬৬ খৃ.

(Report of the Commission Hamoodur Rahman on Students Problem and Welfare, 1966)

যে সব অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকার ও কমিশন গঠন করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা হওয়া দরকার। তা জানা থাকলে, এর সুপারিশমালার গুরুত্ব অনুধাবন করার সহায়তা হবে এ প্রত্যাশায় এ অবতারণা। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৫৯ খৃস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট তার রিপোর্ট জমা দেন।

এ কমিশন কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টের সুপারিশমালা ১৯৬০ খৃস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল পাকিস্তান সরকার অনুমোদন করে ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে সুপারিশমালার আলোকে প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন শুরু করেন। এদিকে কমিশন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ খৃস্টাব্দের জুন মাসে সুপারিশকৃত পূর্ব পাকিস্তানে এবং সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে অধ্যাদেশ আকারে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। সরকারিভাবে ঘোষণার পরই এক বছরের মধ্যে ১৯৬২ খৃস্টাব্দের প্রথম ভাগেই প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে এবং কিছু পরে পশ্চিম পাকিস্তানে আগুনঝরা ছাত্র আন্দোলন খুব জোরেশোরে শুরু হয়ে যায়। তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যে সংস্কার সাধন শুরু করা হয়, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এক দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। দেশের বিভিন্নস্থানে আন্দোলনমুখী ছাত্ররা আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকজনদের বিরুদ্ধে, এবং বিশেষভাবে, তিন বছর মেয়াদি স্নাতক পাস কোর্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তান ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে এক হরতাল আহবান করা হয়। একইভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অনুসরণে পশ্চিম পাকিস্তানে ও ছাত্র-আন্দোলন জোরদার হতে থাকে এবং হরতাল ও অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন দুর্বার গতিতে চলতে তাকলে দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি ও অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যা ক্রমেই সরকার বিরোধী রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে। ফলে সরকার

---

[৪৮৩] Dr. A.K.M. Ayub Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh (Dhaka, IFB, 1982), Page-176.

[৪৮৪] যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৩০৯।

[৪৮৫] প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে তিন বছর মেয়াদী প্রস্তাবিত ডিগ্রি পাস কোর্স পরিহার করতে বাধ্য হয়। এভাবে ছাত্রদের মাঝে আন্দোলনের যে জোয়ার আসে তা ক্রমেই বেগবান হতে থাকে। দেশের সর্বত্রই ছাত্র অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এ জোয়ারের স্রোতে ছাত্রদের মাঝে বিভিন্ন দাবী উত্থাপনের প্রবল প্রবণতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছাত্রদের মনে যখন জ্বলছে, ঠিক এমনি মুহূর্তেই সুখের আগুনে ঘৃত সংযোগের মতই সংযুক্ত হয় এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এসে হাজির হয় ছাত্র অসন্তোষের মাঝে। দেশের অধিকাংশ ছাত্র সংগঠনগুলো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মিসেস ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করে তারপক্ষে আন্দোলনে এগিয়ে যায়। এসব ছাত্র আন্দোলনের পলে ঢাকা, করাচী, লাহোর ও পেশোয়ারের মত শহরে এ আন্দোলনের ঢেউ আঘাত হানে প্রবল গতিতে। ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে সর্ব প্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ঘটনা ঘটে যায় পেশোয়ার ক্যাম্পাসে যখন ছাত্র-পুলিশ বাহিনী পরস্পরের বিরুদ্ধে মুখোমুখি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হল। এমনি এক দুর্যোগমুহূর্তেও দেশের সংকটাপন্ন ক্রান্তিলগ্নে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুলতানে ঘোষণা করেন যে, ছাত্রদের সমস্যা নিরসনের জন্য সরকার একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করবেন। এ পরিস্থিতিতে সরকার এ কমিশন গঠন করেন এবং তাদের কর্ম পরিধি নির্ধারণ করে দেন।

কমিটি গঠন ঃ

১৯৬৪ সালে ছাত্রদের সমস্যা ও তাদের কল্যাণ তথ্যানুসন্ধান ও সুপারিশের জন্য পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিশন গঠন করেন।

কমিশনের সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ

১.	বিচারপতি হামিদুর রহমান, বিচারপতি পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট	চেয়ারম্যান
২.	বিচারপতি এস.এ. মাহমুদ, বিচারক, হাই কোর্ট, পশ্চিম পাকিস্তান	সদস্য
৩.	কাজী আনওয়ারুল হক, চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন	সদস্য
৪.	ডঃ মুমতাজুদ্দিন আহমেদ, ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	মিঃ নাসির আহমদ, চেয়ারম্যান, পশ্চিম পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন	সদস্য[৪৮৬]

পর্যালোচনাঃ

তীব্র ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শরীফ কমিশনের রিপোর্ট পূর্ণ বাস্তবায়ন না করেই তদান্তীন সরকার চিারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে আরো একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এ কমিশন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিস্তারিত সুপারিশ পেশ করে।

পাকিস্তানের নতুন (এয়ার মার্শাল এম.নূর খান) শিক্ষানীতি, ১৯৬৯ খৃ.

(The Proposals for a New Education M. Nur Khan Commission, 1969)

বৃটিশ শাসকরা কর্তৃক প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘদিন যাবত এ দেশে চলে আসছে। অবশ্য দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণার্থে ও বিভিন্ন আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে নানান প্রচেষ্টা গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ দেশের শিক্ষিতের হার খুবই নীচুমানের। অবৈজ্ঞানিকভাবে সাধারণ শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কলা বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ তেমন নাই বললেই চলে। তাছাড়া যথাযথ শিক্ষা পরিকল্পনার অভাব ও প্রচলিত শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব খুবই প্রকট। এমনি এক পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী জাতীয়ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও সংস্কার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, যাতে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা যায় এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেশের উভয় অংশে সমভাবে বন্টিত হয়। সাথে সাথে বিভিন্ন শিক্ষার মধ্যে, ক্রমবর্ধমান অসমতা দূরীভূত করা সহজতর হয়।

---

[৪৮৬] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ৩১১-৩১২

Dhaka University Institutional Repository

এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দেশে প্রচলিত দুটি শিক্ষা-ধারার কোনটিই পুরোপুরিভাবে সার্থক ও সন্তোষজনক নয়। অতএব দেশের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্মেষ ঘটাতে হবে, যা পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন অধিকতর কার্যকরভাবে পূরণে সক্ষম হয়। উক্ত নতুন শিক্ষানীতি প্রস্তাবনা করার পূর্বেই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোথায় গলদ আছে, তা চিহ্নিত করা অত্যাবশ্যক।

অসন্তোষের কারণগুলো নিম্নরূপ–

১. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা জাতয়ি ঐক্য উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে।
২. জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ও গুরুত্ব শিক্ষার অগ্রগামিতা, জাতীয় পরিকল্পনা ডকুমেন্ট যথাযথভাবে প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।
৩. শিক্ষিত যুবকদের মাঝে ব্যাপক বেকারত্বের হার।
৪. শিক্ষার গুণগতমান আশাতীতভাবে নিম্নগামী এবং
৫. অন্যান্য বিয়াদি যা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের অশান্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. ইসলামের ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকলের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন নিশ্চিত করা।
২. একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলা।
৩. বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব-প্রদান করা।
৪. দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীদেরকে শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫. শিক্ষাকে জাতীয় ঐক্যের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিত করা।

কমিটি গঠন ঃ

পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইউব খানের নির্দেশনায় কেন্দ্র এবং উত্তর প্রদেশের কয়েক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত 'স্টাডি গ্রুপ' নিয়োগ করা হয়।

এ প্রসঙ্গে গঠিত কয়েকটি স্টাডি গ্রুপের রিপোর্টের ভিত্তিতে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এয়ার মার্শাল এম. নুর খানের নেতৃত্বে ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে "নিউ এডুকেশন পলিসি" বা "নতুন শিক্ষানীতি" প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।[৪৮৭]

ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সুপারিশ

প্রচলিত বাধাসমূহ

ধর্মীয় বাধা ঃ দেশের দুটি সুস্পষ্ট ভিন্নধর্মী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে যথা- সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা আর অপরটি মাদ্রাসা শিক্ষা। পাশাপাশি দুটি ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় পরস্পরের মাঝে একটা অনাকাঙ্খিত শূন্যতা বিরাজ করছে, যা দেশের ঐক্য সংহতি ও সার্বিক উন্নয়নে প্রতিকুল পরিবেশের সৃষ্টি করছে। এ অবস্থা দেশের জন্য আদৌ কাম্য নয়, তাই এর নিরসন অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষায় দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামি স্টাডিজ বাধ্যতামূলক বিষয় এবং এর ওপরের শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সিলেবাসে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে উভয় ধারার সমন্বয় সাধনের সুপারিশ করা হয়।[৪৮৮]

"নিউ এডুকেশন পলিসি" বা নতুন শিক্ষা নীতি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষন করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং পরবর্তীতে এ গবেষণা লব্ধ জ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ আইন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা নিশ্চিত করতে হবে।[৪৮৯]

---

[৪৮৭] Dr. A.K.M. Ayub Ali, History of Traditional Islamic Education in Bangladesh (Dhaka, IFB, 1982), Page-176.
[৪৮৮] প্রাগুক্ত।
[৪৮৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হবে জাতীয় ঐক্যের উন্নয়নসাধন। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামি স্টাডিজ থাকবে বাধ্যতামূলক, আর পরে থাকবে ঐচ্ছিক। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামি গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।[৪৯০]

পর্যালোচনাঃ

পাকিস্তানের তদান্তীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল জেনারেল মোহাম্মদ আইউব খানের নির্দেশনায় কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশের কয়েক ব্যক্তির সম্বয়ে গঠিত 'স্টাডি গ্রুপ' নিয়োগ করা হয়। এ প্রসঙ্গে গঠিত কয়েকটি স্টাডি গ্রুপের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এয়ার মার্শাল এম.নূর খানের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে 'নতুন শিক্ষানীতি' প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

এ কমিটি তৎকালীন সময়ে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে জাতীয় সংহতি ও জাতীয় ঐক্যের তাগিদে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় আধুনিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করার এবং ইসলামিয়াত বিষয় দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করে। এই কমিটির বিশেষ সুপারিশ ছিল: শিক্ষকদের বেতন উন্নীত করতে হবে যাতে সমযোগ্যতা নিয়ে অন্যান্য পেশায় নিয়োজিতদের সাথে তারা সমকক্ষ হন।

প্রাক-স্বাধীনতা আমলে অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে দেশের শাসকবৃন্দ চাইলে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নতির পথে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারতেন। পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু এর নেতৃবৃন্দ ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।

কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থার চলমান দুধারাকে একীভূত করার সুপারিশ করেছে। দু ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা থাকার কারণে পরস্পরের মাঝে অনাকাঙ্খিত শূন্যতা বিরাজ করছে যা দেশের ঐক্য সংহতি ও সার্বিক উন্নয়নে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যা আদৌ কাম্য নয় সুতরাং এর অবসান জরুরী। দু ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছে যে, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বাধ্যতামূলক হিসাবে থাকবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে উভয়ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে সমম্বয় সাধন করা যেতে পারে।

কমিটি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামী বিষয়ের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং গবেষণা লব্দ জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ আইন, অর্থনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সিলেবাস অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এ কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আধুনিক শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার সমম্বয়ের কথা বলা হয়েছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক।

পাকিস্তান সরকারের নতুন (শামসুল হক কমিটি) শিক্ষানীতি, ১৯৭০ খৃ.

কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট: ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ২৬শে মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট তাঁর জাতীয় বেতার ভাষণে এবং পরবর্তিতে এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকার সমস্যা নিরসনে, শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণে ও চাহিদা পূরণে সম্ভাব্য সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রচেষ্টা চালাবে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি নিবিড় পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করার লক্ষ্যে কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে কয়েকটি অনুধ্যান কমিটি (Study group) গঠন করেন। এ পর্যালোচনার আলোকেই দেশের নতুন শিক্ষানীতির রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় ১৫ হাজার প্রশ্নমালা প্রেরণ করে জনগণের পাঠানো মন্তব্য, মতামত, সুপারিশ, সমালোচনা লিখিতভাবে গ্রহণ করেন। এ সকল মূল্যবান মন্তব্যের আলোকে পূর্বের মূল প্রস্তাবনাগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার জন্য ও পুনর্বিবেচনার জন্য বিভিন্ন পেশার দক্ষ আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের ও সরকারি সংস্থার সমম্বয়ে গঠিত বিভিন্ন অনুধ্যান দল ও গঠন করা হয়। তারা মিটিং এর পর মিটিং করে এর প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করেন, যাতে রিপোর্টে অধিকাংশ সদস্যের ঐকমত্য প্রতিফলিত হয়। ১৯৭০ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সরকার সংশোধিত প্রস্তাবাবলীর পুনর্বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন, যাতে তাঁরা বিস্তারিতভাবে এর পর্যালোচনা পূর্বক পরীক্ষা করে দেখে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করতে পারেন।

---

[৪৯০] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৩২৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর তারিখে জাতির উদ্দেশ্য প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের ভাষণের ঘোষণায় যা বলা হয় তার আলোকে সংশোধিত প্রস্তাবাবলীর পর্যালোচনা করে দেখার পর কেবিনেট কমিটির রিপোর্টটি পরবর্তী মন্ত্রী পরিষদ সভায় পেশ করা হয়। উক্ত রিপোর্টটি ১৯৭০ খৃস্টাব্দের ১৩ ও ২৬ তারিখে মন্ত্রী পরিষদ সভায় গৃহীত হয় এবং তা ২৬শে মার্চ, ১৯৭০ খৃস্টাব্দে চূড়ান্তভাবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে।[৪৯১]

ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত সুপারিশ

যখন মাদ্রাসা শিক্ষাকে পুনর্গঠিত ও উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে তখন সাধারণ শিক্ষাধারায় ধর্মীয় শিক্ষায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকা বাঞ্চনীয় হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশেই ধর্মীয় শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু আছে। এ ব্যাপারে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ[৪৯২]

ক. ধর্মীয় শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুসারে পুনর্বিন্যাস করা দরকার, যাতে ইসলামের শিক্ষাকে এমনভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিফলিত করতে হবে, যাতে তা অনুপ্রেরণার উৎস ও চালিকাশক্তি হিসেবে দেশের একতা, সংহতি ও উন্নতিসাধনে এবং গণতন্ত্র ও পরমতসহিষ্ণুতা চর্চায় তথা আদর্শ সমাজগঠনে উদ্বুদ্ধ করে যা পাকিস্তান স্বাধীনতার জন্মমূলে নিহিত ছিল। এতোদ্দেশ্য সাধনে যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্বকারী একটি কারিকুলাম কমিটি গঠন করা দরকার যার সক্রিয় তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষাক্রম তৈরী করা যায়। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরা ও যাতে স্ব স্ব ধর্মশিক্ষা পেতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।[৪৯৩]

খ. উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে এমনভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করবে না, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ সহজে ও পুরোপুরিভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।[৪৯৪]

গ. আরো প্রস্তাব করা হয় যে, নির্বাচিত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে পাঠদান কার্যক্রমসহ গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ সৃষ্টি করবে।[৪৯৫]

পর্যালোচনাঃ

ধর্মীয় শিক্ষাকে যুগের চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করার কথা বলা হয়েছে যাতে ইসলামী শিক্ষা এমনভাবে প্রতিফলিত হয় যা অনুপ্রেরণার উৎস ও চালিকা শক্তি হিসেবে দেশের একতা সংহতি ও উন্নতি সাধনে এবং গণতন্ত্র ও পরমত সহিষ্ণুতা চর্চা তথা আদর্শ সমাজ গঠনের সহায়ক হয়। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষা দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। নির্বাচিত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইনষ্টিটিউট ফর ইসলামিক ষ্টাডিজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বারোপ করা হয়। যেখানে পাঠদান কার্যক্রমসহ গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ থাকবে। সর্বোপরি রিপোর্টে ইসলামী ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হলেও বাস্তবায়নের কর্মকৌশল সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন (১৯৭১-২০০০)

কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট, মে, ১৯৭৪ খৃ.

কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট: ১৯৭২ খৃস্টাব্দের ২৫শে জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খৃস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশন উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী তার উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী ভাষণে কমিশনের সদস্যদেরকে বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির জন্য পুনর্গঠিত নূতন শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শ দানের আহবান জানান। তিনি আরো বলেন যে, আমাদের সীমিত সম্পদের কথা স্মরণ রেখে কমিশন

---

[৪৯১] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ৩৩২

[৪৯২] প্রাগুক্ত।

[৪৯৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪১।

[৪৯৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩৪১, ৩৪২।

[৪৯৫] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৩৪২।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার এমন এক দীর্ঘমেয়াদী রূপছায়া প্রণয়ন করবেন, যা শিক্ষা ক্ষেত্রে সঠিক ও সুদূর প্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘকাল পরাধীনতার অভিশাপে জর্জরিত হবার পর কঠোর ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে জনগণের জীবনে অর্থবহ করতে হলে শিক্ষার সংস্কার ও পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। বাঞ্ছিত এ পরিবর্তন বা সংস্কার কেবলমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের মাধ্যমে আসতে পারে।

বর্তমান শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণ, সেকেলে ও অনুন্নত শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আত্মমর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম এমন একটি বিজ্ঞান সম্মত, উন্নত ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ভাল দিকগুলো রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার নূতন গতির সঞ্চার করতে হবে, যাতে জাতীয় জীবনে প্রাণপ্রাচুর্যের ও জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রয়োগমুখী প্রযুক্তির মাধ্যমে কর্মশক্তিতে বলিয়ান করার পথনির্দেশের উদ্দেশ্যে এ সরকার এ জাতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন।

পূর্ণকালীন সদস্য

১. সভাপতি, ডক্টর মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদা
২. সহ-সভাপতি, ডক্টর সুরত আলী খান
৩. সদস্য-সম্পাদক, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
৪. জনাব এম.ইউ. আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশন।
৫. জনাব মাহমুদ মোকাররম হোসেন, অধ্যক্ষ, দিনাজপুর, কে, বি, মহাবিদ্যালয়।

খণ্ডকালীন সদস্য

৬. অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭. ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী, ফলিত রসায়ন শাস্ত্র বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৮. ডঃ আব্দুল হক, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. ডঃ আনিসুজ্জামান, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
১০. ডঃ স্বদেশ রঞ্জন বসু, গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন-অর্থনীতি ইনস্টিটিউট।
১১. ডঃ নুরুল ইসলাম, পরিচালক, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১২. ডঃ এম, শামসুল ইসলাম, কৃষি অর্থনীতি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩. ডঃ আ. মু. জহুরুল হক, তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪. ডঃ সিরাজুল হক, অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, আরবী ও ইসলামী চর্চা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫. শ্রীমতি বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬. অধ্যক্ষ আবু সুফিয়ান, চট্টগ্রাম সরকারী মহাবিদ্যালয়।
১৭. ডঃ এ, এম, শরফুদ্দিন, পরিচালক, শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ঢাকা।
১৮. ডঃ মাযহারুল ইসলাম, মহা-পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯. ডঃ মোঃ হাবিবুল্লাহ, বাণিজ্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০. শ্রীমতি হেনা দাস, প্রধান শিক্ষয়িত্রী, নারায়ণগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়।
২১. জনাব আশরাফ উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রথমিক শিক্ষক সমিতি।[৪৯৬]

পর্যালোচনাঃ

[৪৯৬] বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, (অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট), পরিশিষ্ট 'ক'

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতিকে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার ১৯৭২ সালে এক আদেশে ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের সদস্যগণ ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারত সফর করেন। এক মাস ব্যাপী এ সফরে কমিশনের সদস্যগণ সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালে কমিশন সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে যত শিক্ষা-সংস্কার ও পুর্নগঠন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার মূল ভিত্তিই হচ্ছে এই কমিশন। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন দীর্ঘ সময় ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে তাদের রিপোর্ট প্রস্তুত করে। কিন্তু রিপোর্টটি প্রকাশিত হবার পর পরই এটি বিতর্কিত হয়ে পড়ে। কমিশনের সুপারিশমালায় বেশ কিছু সুপারিশ ছিল যা প্রকৃতপক্ষে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও যুগোপযোগী এবং শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও সংস্কার বলা যায়। আবার সুপারিশমালার মধ্যে এমন কিছু মৌলিক দিক ও বিষয় ছিল যা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খার বিপরীত এবং জনগণের চিন্তা-চেতনা, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক জীবনবোধের পরিপন্থী।

প্রকৃতপক্ষে কুদরত-ই-খুদা কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির উপযোগী ধর্মবোধ বিবর্জিত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। কমিশন নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছে। কমিশন শিক্ষার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে। তাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

কমিশনের ভাষায় 'বাঞ্চিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য' (অধ্যায়-১.১)।
'সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে' (অধ্যায়-১.৫)।
'নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে' (অধ্যায়-১.৯)।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের মূল আদর্শিক ভিত্তি ছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র। এসব মূলনীতির ভিত্তিতেই শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছিল যাতে শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও তার ব্যবহারিক জীবন ঐসব আদর্শের আলোকে গড়ে ওঠে। কমিশনের ভাষায় 'আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে' (অধ্যায়- ১.২)। চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য' (অধ্যায়-২.৪)।

দেশপ্রেম সৃষ্টির জন্য কমিশন 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জনকে' সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে (অধ্যায়-২.১৩)। এভাবে তদানীন্তন চার রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল। ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে ধর্মীয় মূল্যবোধকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেনি তার কয়েকটি দিক হচ্ছে-

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন

চার মূলনীতি তথা বাঙ্গালী জাতীয়বাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উপর কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। কমিশনের ভাষায় পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করার সময় দেখতে হবে তাতে যেন আমাদের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঠিক প্রতিফলন হয়' (অধ্যায়-২৮.৭)। বিশেষ করে সাহিত্য, ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতির পাঠ্যসূচীতে এ ধরনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করতে হবে' (অধ্যায়-২.৪)।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ধর্মের অবস্থান

কমিশন প্রাক-প্রাথমিক স্তরকে মানব জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করে সে সময়কালীন শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবিত শিক্ষার ধারণায় ও ব্যবস্থাপনায় ধর্মবোধের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত (অধ্যায়-৬.৪)। প্রাক-

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে গানবাজনা ইত্যাদি থাকলেও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রয়োজন বোধ করা হয়নি (অধ্যায়-৬.৬)।

কমিশন শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন করার জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচীভিত্তিক এক ও অভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার কথা বলেছে (অধ্যায়-৭.৯)। এই অভিন্ন ধরনের শিক্ষার রূপ হচ্ছে- প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হবে (অধ্যায়-৭.১০)। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে মাত্র দুটো পিরিয়ড ধর্ম শিক্ষার/নীতি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ থাকবে (অধ্যায়-৭.১০)।

মাধ্যমিক শিক্ষা (নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)

- মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কোন ধর্ম শিক্ষা থাকবে না (অধ্যায়-৮.১১)।
- নবম ও দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেও ধর্ম শিক্ষা থাকবে না, যদিও ঐ দু'বিভাগের সাথে সম্পর্কহীন ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞানের মত বিষয়কেও ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (অধ্যায়-৮.১১)।
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে কোন বিভাগেই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে 'ধর্ম শিক্ষা' নেয়া যাবে না (অধ্যায়-৮.১১)।
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদির মত একটি ধর্ম শিক্ষা বিভাগ রাখা হয়েছে কিন্তু সে বিভাগের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়নি বরং কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।
- বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, কাঠের কাজ, কেশ-বিন্যাস, নৃত্য ইত্যাদি ৪১টি কোর্সের মধ্যে 'ধর্ম শিক্ষা' হবে একটি।

মাদ্রাসা শিক্ষা

- সাধারণ শিক্ষার মত মাদ্রাসার প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত কোন ইসলামী শিক্ষা থাকবে না।
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে ইসলামী শিক্ষার জন্য দুটো পিরিয়ড থাকবে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র ও ঐতিহ্যের আলোকে এবং ইসলামী জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষার্থী তৈরীর উপযোগী সুপারিশ করা হয়নি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট, ১৯৭৬ খৃ.

কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট: জাতীয় আদর্শ সমকালীন জীবনের চাহিদা এবং ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের আলোকে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি সংস্কার ও ক্রমপরিবর্তন যে কোন শিক্ষাব্যবস্থায় তার গতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশে বর্তমানে যে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রচলিত আছে তা স্বাধীনতা পূর্বকালে প্রায় ষোল বছর আগে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশে ১৯৭৩-৭৪ খৃস্টাব্দে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল এবং এ সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। শিক্ষার বিষয়বস্তুর উন্নতি ও আধুনিকীকরণ যদি কোন কারণে বিঘ্নিত বা বিলম্বিত হয়, শিক্ষার্থীদের জন্য এবং দেশের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এ পটভূমিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রেজুলিউশন নং শা — ১/৫৬০ শিক্ষা তারিখ ১১-১১-৭৫ এর মাধ্যমে কমিশনের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবাবলী ও সুপারিশসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচির উপযুক্ত পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বাস্তব পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি" গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

কমিটির নাম ও পদবী নিম্নরূপ:

১.	প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক	চেয়ারম্যান
২.	ডঃ আবদুল করিম, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	সদস্য
৩.	ডঃ মফিজউল্লাহ কবীর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৪.	ডঃ এ.এম. শরফুদ্দিন, যুগ্ম-সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

৫. ডঃ মোহাম্মদ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা — সদস্য
৬. জনাব মোহাম্মদ নূরুস-সাফা, জনশিক্ষা পরিচালক, বাংলাদেশ,ঢাকা — সদস্য
৭. জনাব এম.এ. সাত্তার — সদস্য
পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা, ঢাকা
৮. প্রফেসর এ.কে. রফিকউল্লাহ — সদস্য
ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৯. প্রফেসর স. হ. খ. ইউসুফ জাই, পুরকৌশল বিভাগ, — সদস্য
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১০. প্রফেসর শ. ম. আজিজুল হক, গণিত বিভাগ, — সদস্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১১. প্রফেসর হারুণ-অর-রশীদ — সদস্য
পদার্থ বিজ্ঞান (তাত্ত্বিক) বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১২. প্রফেসর শেখ গোলাম মাহবুব — সদস্য
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
১৩. প্রফেসর এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম — সদস্য
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৪. প্রফেসর মুহাম্মদ মুহীয়্যূদ্দীন — সদস্য
পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৫. প্রফেসর মোহাম্মদ মাহবুবুল হক — সদস্য
রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৬. প্রফেসর আবদুল লতিফ মিয়া — সদস্য
প্রধান, এগ্রোনমী বিভাগ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
১৭. প্রফেসর এম. এ. রকিব — সদস্য
ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৮. প্রফেসর মোহাম্মদ শামসুল হক — সদস্য
পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১৯. প্রফেসর আমানুল্লা আহমদ — সদস্য
প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
২০. জনাব সৈয়দ আহমদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেকস্ট বুক বোর্ড, ঢাকা — সদস্য
২১. ডঃ শামসুদ্দিন মিয়া — সদস্য
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
২২. ডঃ খলিলুর রহমান — সদস্য
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, রাজশাহী
২৩. ডঃ মুহম্মদ সিরাজুদ্দিন — সদস্য
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা
২৪. ডঃ মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ — সদস্য
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
২৫. জনাব আবদুর রশীদ — সদস্য
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেকনিকেল এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা
২৬. মাওলানা আবদুল রশীদ তর্কবাগিশ — সদস্য
চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা
২৭. ডঃ আবু হামিদ লতিফ, নির্বাহী পরিচালক, — সদস্য
জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২৮. ডঃ মুহম্মদ নুরুল হক, — সদস্য
পরিচালক, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

২৯. জনাব মীর এনায়েত হুসাইন, উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা — সদস্য
৩০. ডঃ এ. এইচ. এম. করিম — সদস্য
ডীন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৩১. ডঃ এ.কে.এম. আইয়ুব আলী, অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা — সদস্য
৩২. জনাব হামিদ আলী শাহ — সদস্য
অধ্যক্ষ, কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা
৩৩. জনাব খোদা বক্স, অধ্যক্ষ, ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ, ঢাকা — সদস্য
৩৪. ডঃ আলিমউল্লাহ খাঁন, প্রকৌশলী সংসদ, ঢাকা — সদস্য
৩৫. জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম — সদস্য
সহ-অধ্যক্ষ, মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল
৩৬. মিসেস হোসনে আরা শাহেদ — সদস্য
অধ্যক্ষা, শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা
৩৭. মৌলানা মোহাম্মদ সালেহ, অধ্যক্ষ, আলীয়া মাদ্রাসা, খুলনা — সদস্য
৩৮. জনাব খলিলুর রহমান, সভাপতি, বেসরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি — সদস্য
৩৯. খোন্দকার আলী আজম, চীফ ইনস্ট্রাক্টর, ফাউন্ড্রী এন্ড মেটালার্জী, — সদস্য
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম
৪০. জনাব রজব আলী, সুপারিনটেনডেন্ট, পি.টি.আই., খুলনা — সদস্য
৪১. জনাব হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ — সদস্য
প্রধান শিক্ষক, সরকারি লাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা
৪২. মিসেস শামসুন্নাহার, প্রধান শিক্ষয়িত্রী — সদস্য
সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
৪৩. মিসেস আনোয়ারা মনসুর, — সদস্য
প্রধান শিক্ষয়িত্রী, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা
৪৪. জনাব আবদুর রশীদ সরকার — সদস্য
প্রধান শিক্ষক, ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল, ঢাকা
৪৫. জনাব জসীম উদ্দিন আহমদ — সদস্য
প্রধান শিক্ষক, ঝিগাতলা প্রাইমারি স্কুল, ঢাকা
৪৬. জনাব মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার, পরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি — সদস্য-সচিব
প্রণয়ন কমিটি, বাংলাদেশ, ঢাকা[৪৯৭]

'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি' ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষা, সাহিত্য ও পরিবেশ পরিচিতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করে এবং প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যভূক্ত করার সুপারিশ করে। বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্বর সাথে পাঠ্যসূচীতে স্থান দেয়া হয়। মাদ্রাসা শিক্ষায় সাধারণ ও বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে শিক্ষার সকল দিক ও বিভাগে যথাযথ গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়নি।

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্কীম
(ডঃ এম. এ. বারী) কমিটি, ১৯৭৭ খৃ.

কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট:
আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের অধিকাংশই অর্থকরি কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত হলেও ইসলামি ভাবধারায় ও ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাদের প্রায়শই উদাসীন বলে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার অনুপ্রবেশ না থাকাই হয়ত এর মূল কারণ। তাই এ অসঙ্গতি দূরীকরণার্থে মুসলমানদের জন্য এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চিহ্নিত করতে হবে, যে শিক্ষায় ইসলামি শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় সাধিত হয়, যা হবে উভয় ধারার

[৪৯৭] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ৪৭১-৪৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বিত এক সুসামঞ্জস্য শিক্ষা। এ পর্যায়ে একদিকে যেমন আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামি ভাবধারায় সমৃদ্ধ করতে হবে, তেমনি ইসলামি শিক্ষাকে করতে হবে আধুনিক জীবন চাহিদার উপযোগী। আর তা বাস্তবায়ন করতে হলে একটি ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম ও সহযোগিতা ছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। এ ধরনের প্রয়োজনীয়তার কথা শুধু আজকের নয়, বরং সুদূর অতীত থেকেই পাক-ভারত উপমহাদেশের সচেতন মুসলমান নেতৃবৃন্দ এর জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তা আজও আকাঙ্ক্ষাই রয়ে গেছে। তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেনি। এদেশে অতীতে যে শিক্ষা কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে তার অধিকাংশ রিপোর্টেই এ ব্যাপারে মূল্যবান সুপারিশ এসেছে। আবার কোন কোন কমিশনে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও রয়েছে। ১৯৩৮-৪১ খৃস্টাব্দের মাওলা বখ্‌শ কমিটিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হিসেবে প্রস্তাব করা হয় যে, কলকাতায় ইসলামি শিক্ষার জন্য এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, যার অধীনে থাকবে বাংলাদেশের যাবতীয় ওল্ড ও নিউ স্কীম মাদ্‌রাসা ও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজসমূহ।

ভারত বিভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৬-৪৭ খৃস্টাব্দের অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ মুয়াযযাম উদ্দিন হোসেনের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি সুপারিশে অবিলম্বে একটি ইসলামি বিশ্ববিধ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়, যা বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করবে এবং ধর্মীয় ও সংস্কৃতিক জ্ঞান দান করবে।

১৯৪৭ খৃস্টাব্দেও মাওলানা আকরাম খান কমিটিতেও অনুরূপ সুর ধ্বনিত হয়েছে। তারপরেও ঢাকায় ও করাচিতে কয়েকটি কমিটি ও কমিশনও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত মূল্যবান সুপারিশ করেন। এতসব সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও সকল সুপারিশই ফাইলবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকে। এমনি করে যুগের পর যুগ অতিবাহিত হল, দেশের পর দেশ পরিবর্তিত হল, দেশের প্রশাসন ও একের পর একের হাত বদল থাকল। ভারত বিভাগের প্রাক্কালেও মুসলমানদের দাবীর মুখে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ভারতের বুক চিরে বেরিয়ে আসে মুসলমানদের জন্য আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান। কিন্তু সেখানেই এতদ্‌সংক্রান্ত দাবী অগ্রাহ্য হল। তারপর ১৯৭১ খৃস্টাব্দে আমরা পাকিস্তানের শাসনের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হই। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলো ও আসামের কয়েকটি থানা সমন্বয়ে যে পূর্ববঙ্গ গঠিত হয় তা কালের পরিক্রমায় ও যুগের দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট পূর্ববঙ্গ নামটি পরিবর্তিত হয়ে পূর্বপাকিস্তান নামধারণ করে। ফলে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে শুরু করে কিন্তু তাদের প্রাণের দাবী ইসলামি শিক্ষার জন্য উন্নতমানের একটি স্বতন্ত্র ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি এখানে গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়নি।

ইসলামি শিক্ষা বাড়লেও গতানুগতিক ধারায় প্রচলিত শিক্ষা মুসলমানদের এতদিনের লালিত আস্থা ও বিশ্বাসে কঠিনভাবে কুঠারাঘাত করে এবং মুসলমানদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ অসন্তোষ ক্রমেই সারা পাকিস্তানকে আন্দোলিত করে নানা ইস্যুতে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশেও এর জন্য বেশ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। তাই দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দাবী উত্থিত হয়েছিল তা স্বাধীনতার বিশ বছর পর ১৯৭৬ খৃস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট (চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর) জিয়াউর রহমান ঘোষণা দেন যে, দেশে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা জাতির লক্ষ্য ও অধুনা যুগের চাহিদার সাথে যুগপৎ ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

কমিটি গঠন ঃ

২৭শে জানুয়ারি ১৯৭৭ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলরর ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডঃ এম.এ. বারীকে চেয়ারম্যান করে সরকার সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেন।

কমিটির সদস্যদের পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ

১. ডঃ এম.এ.বারী, চেয়ারম্যান ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় — চেয়ারম্যান
২. জনাব আহমদ হোসাইন, প্রাক্তন ও.এম.ডি., লাইব্রেরি উন্নয়ন, শিক্ষা পরিদপ্তর ও প্রাক্তন পরিচালক, ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা — সদস্য
৩. জনাব আব্দুল হাদী তালুকদার — সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৪. ডঃ এ. মুক্তাদির, প্রধান, স্থাপত্য বিভাগ — সদস্য
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৫. ডঃ ইখলাস উদ্দিন আহমদ — সদস্য
প্রফেসর, পদার্থ বিদ্যা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৬. ডঃ এ.কে.এম. আইউব আলী, অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা — সদস্য

৭. মাওলানা আঃ সালাম, অধ্যক্ষ, আহমাদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা — সদস্য
মাদারীপুর, ফরিদপুর ।[৪৯৮]

কমিটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে মৌলিক সুপারিশ করে তা নিম্নরূপ

কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে ইসলামি শিক্ষার সমম্বয় সাধন করতে হবে, যাতে এ সমম্বিত কোর্স এক নতুন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এক অনন্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে ।499

পর্যালোচনাঃ

ড.এম.এ. বারীর নেতৃত্বাধীন এ কমিটি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা জোরালো ভাবে উপস্থাপন করে । কমিটি আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামী জ্ঞান এ দু ধারার জ্ঞানের মধ্যে সমম্বয় সাধন করে নৈতিক ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দানের উপযোগী শিক্ষার্থী তৈরীর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব সুস্পষ্ট করেন । কমিটি এ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উল্লেখ করেন যার শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে ২০০০ জন যারা সবাই আবাসিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে । ইসলামী । বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছেন, আজকের নীতি জ্ঞান ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সময় ইসলামের নীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এ বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের মর্যাদা প্রদান ও দিকবিদিগন্তে ছায়া বিনিময়ের সেতু বন্ধনের কাজ করবে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাংলাদেশের মানুষের নেতৃত্ব দিবে তাই নয় বরং সারা বিশ্বের মুসলমানদের দিক নির্দেশনা দেবে ইসলামী শিক্ষা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে । দু:খজনক হলেও সত্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়নি । আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখার সাথে ইসলামী জ্ঞানের সমম্বয় সাধন করা ছিলো এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য । আজো কলা, সমাজ বিজ্ঞান, ও বিজ্ঞান অনুষদ ভূক্ত সকল বিষয়ের সাথে বাধ্যতামূলক ইসলামীক ষ্টাডিজ রাখা হয়নি যা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করেছে । ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হবার কথা থাকলেও তা উপেক্ষা করা হচ্ছে পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার পরিবর্তে দেশের একমাত্র সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দিন দিন আঞ্চলিক বিদ্যাপীঠে পরিণত করার প্রয়াস লক্ষনীয় ।

অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি, ১৯৭৯ (জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সুপারিশ)

কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট: কোন দেশ বা জাতি যে ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় তা রাষ্ট্রীয় মৌলনীতিতে প্রতিফলিত হয় এবং সেই রাষ্ট্রীয় মৌলনীতির ভিত্তিতেই রচিত হয় শিক্ষানীতি । তাই জাতীয় জীবনে শিক্ষা নীতির গুরুত্ব অপরিসীম । তবে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা অতীব দুরূহ কাজ । কিন্তু এ কাজকে কঠিন বলে তো আর ফেলে রাখা যাবে না । করতেই হবে যতই জটিল হোক না কেন, এহেন জাতীয় অপরিহার্য কাজ । যেকোন শিক্ষানীতি সে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে এবং জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে বাঞ্ছিত পরিবর্তন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যখন বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তখনই তারা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন । বর্তমানে রাশিয়া ও আমেরিকা তাদের গৃহীত শিক্ষানীতিকে যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বের দু'টি পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে । দেশের শিক্ষা বিস্তারের ও শিক্ষার সুষম সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে শিক্ষানীতির প্রভাবের কথা ভেবে প্রায় সব দেশেই শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে । পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ভারত, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন ইত্যাদি প্রায় সকল দেশেই আজ শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন চোখে পড়ে ।

---

[৪৯৮] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ৪৮৩-৪৮৪

[৪৯৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমলে আকরাম খান, আতাউর রহমান খান ও শরীফ কমিশন রিপোর্ট শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে মূল্যবান সুপারিশ রাখলেও তা পূর্ণভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এহেন হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন। যথারীতি এ রিপোর্টও প্রকাশ হল ১৯৭৪ খৃস্টাব্দে। কিন্তু শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে এ রিপোর্টটির সুপারিশসমূহের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি আর্থিক অসুবিধা হেতু। এদিকে দেশে সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি না থাকার ফলে, শিক্ষাব্যবস্থায় ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে ক্রমাগতভাবে শিক্ষার মান কমতে থাকে। তাই এসব সমস্যার কথা বিবেচনা করে তদানীন্তন সরকার অন্তর্বর্তীকালীন খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্য প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক প্রতিনিধি ও শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে "শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ" গঠন করেন ১৯৭৮ খৃস্টাব্দে। কাজী জাফর শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রচেষ্টায় তার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুচিন্তিত ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি প্রণয়নে বেশ সময়ের প্রয়োজন হবে বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আশু বিবেচনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়।

প্রথমদিকে শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এবং ১২ অক্টোবর ৭৮ খৃঃ হতে ৩ ফেব্রুয়ারী ৭৯ খৃঃ পর্যন্ত তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

কমিটির অপরাপর সদস্যবৃন্দ ঃ

১. ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন আহমেদ, উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
২. ডঃ মুসলেহ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৩. ডঃ মুহম্মদ আবদুল বারী, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৪. ডঃ ফজলুল হালিম চৌধুরী, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. প্রফেসর এম.আই.চৌধুরী, অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ
ও ডীন, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৬. ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৭. ডঃ মুহম্মদ ইউনুস, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৮. ডঃ সৈয়দ শফিউল্লাহ, ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শিক্ষক ফেডারেশন
৯. জনাব এম. শরীফুল ইসলাম, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি
১০. ডঃ এ.কে.এম. ওবায়েদ উল্লাহ, অধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ,
ঢাকা ও প্রতিনিধি, সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি
১১. জনাব আবদুল খালেক, প্রধান শিক্ষক, বাড্ডা আলফাতুননেছা উচ্চ বিদ্যালয়,
ঢাকা ও প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
১২. জনাব মীর আবদুল বাতেন, সহকারি শিক্ষক, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়,
ঢাকা ও প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি
১৩. জনাব আবদুল কাদের সরকার, ইনস্ট্রাকটর, ঢাকা পলিটেকনিক
ইনস্টিটিউট ও প্রতিনিধি, বাংলাদেশে পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি
১৪. জনাব মাওলানা এম.এ.মান্নান, প্রতিনিধি, জামিয়াতুল মুদাররেসীন
১৫. জনাব আবুল কালাম আযাদ, প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
১৬. জনাব হাজী মোহাম্মদ দানেশ, শিক্ষানুরাগী
১৭. জনাব কামরুল হাসান, শিল্পী
১৮. জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা
১৯. জনাব আতাউস সামাদ, সাংবাদিক, দি বাংলাদেশ টাইমস, ঢাকা
২০. জনাব ফয়েজ আহমদ, শিশু সাহিত্যিক
২১. ডঃ এনামুল হক, পরিচালক, ঢাকা জাদুঘর
২২. জনাব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান, সচিব, কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়
২৩. ডঃ এম.এ. সাত্তার, সচিব, পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

২৪. ডঃ মিজানুর রহমান শেলী, পরিচালক, সমাজকল্যাণ বিভাগ
২৫. কর্ণেল এ.কে.এম শামসুল ইসলাম, সেনা শিক্ষা পরিচালক
২৬. জনাব জাহানারা ইমাম, শিক্ষানুরাগী
২৭. জনাব হোসনে আরা শাহেদ, অধ্যক্ষ, শেরে বাংলা মহিলা কলেজ, ঢাকা
২৮. ডঃ ইকবাল মাহমুদ, অধ্যাপক
কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
২৯. ডঃ আহমদ শামসুল ইসলাম, অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩০. ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
৩১. ডঃ জাফরউল্লাহ চৌধুরী, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা
৩২. জনাব আবদুল মূয়ীদ চৌধুরী, জেলা প্রশাসক, ঢাকা
৩৩. জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, অধ্যক্ষ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা
৩৪. কাজী জাহানারা খান, পরিচালক, একাডেমী ফর ফান্ডামেন্টাল এডুকেশন, ময়মনসিংহ
৩৫. জনাব মোঃ মুজিবুল হক, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রনালয় (২৬শে জানুয়ারি '৭৯পর্যন্ত)
৩৬. কাজী ফজলুর রহমান, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (৫ই ফেব্রুয়ারি, '৭৯ থেকে)
৩৭. ডঃ আ. ম. শরফুদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩৮. ডঃ মোহাম্মদ সেলিম, শিক্ষা উপদেষ্টা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩৯. ডঃ খলিলুর রহমান, জনশিক্ষা পরিচালক
৪০. জনাব আবদুর রাযযাক, ভারপ্রাপ্ত জনশিক্ষা পরিচালক
৪১. জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার, পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা
৪২. কাজী মোহম্মদ মনজুরে মওলা, যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়[৫০০]

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করেন

জনগণকে সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ ও মানব চিত্ত-বিকাশের জন্য জ্ঞান, কর্মকুশলতা সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করার সুযোগ প্রদান করা এবং নীতিজ্ঞান ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সম্পন্ন সুস্থ, চরিত্রবান আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।[৫০১] জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করা।[৫০২]

পর্যালোচনাঃ

কমিটির রিপোর্টে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নীতি জ্ঞান ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সম্পন্ন সুস্থ, চরিত্রবান আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য সংগতির ধারা অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করার কথা বলা হয়। কিন্তু এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়নি। যাতে ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিকতা যথাযথ প্রতিফলিত হয়নি বলে মনে হয়।

ডঃ আব্দুল মাজিদ খান রিপোর্ট (১৯৮৩)

১৯৮৩ সালে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আব্দুল মজিদ খানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা পুর্নগঠন কমিটি গঠিত হয়। 'মজিদ খান কমিটি' শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থাপনার উপর তাদের রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার পুর্নগঠনের জন্য বেশ কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব রাখা হয়। এতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিয়াত বাধ্যতামূলক করা হয়।[৫০৩]

---

[৫০০] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ৪৯০-৪৯২

[৫০১] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৪৯৩।

[৫০২] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৪৯৪।

[৫০৩] বাংলাদেশ স্কুল ও মাদরাসা শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রম, এ কে এম আজহারুল ইসলাম শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, দি ইসলামিক একাডেমি, কেম্ব্রিজ, যুক্তরাজ্য, পৃষ্ঠা-৯।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা (মফিজ উদ্দিন) কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ

দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সকল স্তর ও সকল প্রকার শিক্ষা সম্পর্কে যথোপযুক্ত সুপারিশ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮৭ খৃস্টাব্দ, মোতাবেক ৯ই বৈশাখ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ শাঃ ৮/১০এম-৮/৮৬/২৭৬/(১৫০)-শিক্ষা নম্বর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।

কমিশন গঠন ঃ

অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। সভাপতির নামানুসারে এ কমিশন "মফিজ উদ্দিন কমিশন" নামেও খ্যাত।

কমিশনের সদস্যদের পরিচিতি নিম্নে দেয়া হল ঃ

১. অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর	চেয়ারম্যান
২. জনাব মোমিন উদ্দিন আহম্মদ, জাতীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
৩. প্রিন্সিপাল মোঃ আজহারুল হক, জাতীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
৪. জনাব এ.কে.এম. শামসুল হুদা, জাতীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
৫. জনাব মুহাম্মদ আয়েন উদ্দীন, জাতীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
৬. অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার, জাতীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
৭. কাজী ফজলুল রহমান, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮. ডঃ নুরুল ইসলাম, জাতীয় অধ্যাপক	সদস্য
৯. অধ্যাপক এ.মান্নান, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১০. অধ্যাপক এ. মান্নান, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১১. ডঃ মোমতাজ উদ্দিন, ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২. অধ্যাপক মোশারফ হোসেন খান, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩. অধ্যাপক জেড. এইচ. ভূঞা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪. জনাব আবদুর রশীদ, রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৫. ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ ব্যাংক	সদস্য
১৬. জনাব বোরহান উদ্দিন আহম্মদ, প্রাক্তন সচিব, বাংলাদেশ সরকার	সদস্য
১৭. ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, প্রাক্তন সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১৮. জনাব মোঃ নুরুস সাফা, প্রাক্তন জনশিক্ষা পরিচালক	সদস্য
১৯. ডঃ নুরুল হক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, নিয়েযার	সদস্য
২০. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
২১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
২২. মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
২৩. অধ্যাপক মোঃ আবুল কাসেম, রাজশাহী কলেজ	সদস্য
২৪. জনাব এ.কে.এম. শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ, শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজ	সদস্য
২৫. মিসেস কিউ.এ.মনসুর, প্রধান শিক্ষিকা, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়	সদস্য
২৬. জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক, প্রধান শিক্ষক, গভঃ লাবরেটরি স্কুল, ঢাকা	সদস্য
২৭. জনাব আবুল হোসেন, প্রঃ শিঃ নবাবগঞ্জ সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	সদস্য
২৮. অধ্যাপক শামসুল হক, সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন	সদস্য
২৯. অধ্যাপক ইউনুস সিকদার, অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা	সদস্য
৩০. জনাব নুরুদ্দীন আল মাসুদ, অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা বিভাগ	সদস্য-সচিব[৩০৪]

[৩০৪] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ৫১৫-৫১৬

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়

১. নেতৃত্বের গুনাবলী অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সঞ্চার করে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।
২. আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ করে তোলা।
৩. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ সাধন করা।
৪. মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটান[৫০৫]

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ

১. ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহকে অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত কর প্রয়োজন। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আবশ্যক হবে এবং যাবতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত হবে।
২. ফাযিল মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পুর্নগঠন করে সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মৌল বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে একই ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।[506]

উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়:

উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সময়োপযোগী ও সামাজিক চাহিদানুযায়ী হবে, তাতে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হবে। জ্ঞানের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিকই উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে যথাযথ গুরুত্বলাভ করবে।[৫০৭]

কমিটি তার তার কার্যপরিধি ও শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা পূর্বক রিপোর্ট পেশকালীন ভূমিকায় উল্লেখ করেন:

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজীবন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুনাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরী করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরী করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যাবলীর অর্ন্তভূক্ত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মনে তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারনা সৃষ্টি করা, পরিবেশ নিষ্কলুষ রাখা ও জাতীয় সম্পদ যথাযথ সংরক্ষন সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাকে সমস্যার বাস্তব সমাধান সন্ধানে অনুপ্রাণিত করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। শিক্ষা একটি জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবন নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্চিত নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[৫০৮]

যে সকল আদর্শ বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে সেগুলি সংরক্ষনের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি মৌলিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং দেশবাসীর ভিতর ঐক্যের বোধ শক্তিশালী করতে হবে। দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান,

---

[৫০৫] বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মফিজ উদ্দিন), ফেব্রুয়ারী- ১৯৮৮, পৃষ্ঠা নং- ০৩।
[৫০৬] বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মফিজ উদ্দিন), ফেব্রুয়ারী- ১৯৮৮, পৃষ্ঠা নং- ০৯।
[৫০৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং- ১৫।
[৫০৮] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা নং- ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি সংগ্রামের তাৎপর্য অবহিত করা, সংস্কৃতির চর্চা এবং মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় ও সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতীক বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটাতে হবে। জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে। এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যা জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত করে।[৫০৯] নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ এবং জনসেবার আদর্শ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রদর্শক ও পরিচালক শক্তি হওয়া উচিত। শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে সে যেন সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।[৫১০]

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিটির বক্তব্য

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কল্যাণ ও সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষার প্রধান দায়িত্ব হিসাবে দেশের বিপুল জনশক্তির দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা হবে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার ও বাহন। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে সাহায্য করা। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন শিশুর দৈহিক মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও নৈতিক দিক সমূহের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ধন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়।[৫১১] সকল মানুষেই আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব ভাতৃত্ব ও আর্ন্তজাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি, সকল চিন্তা ও কর্মপ্রেরণার উৎস হিসাবে সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং সৃষ্টিকর্তার উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো।[৫১২]

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সম্পর্কে কমিটি তার সুপারিশে উল্লেখ করেন:

প্রাথমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রম প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের যেন (ক) জীবন ও সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, (খ) চরিত্র ও ব্যাক্তিত্ব গড়ে ওঠে, (গ) নৈতিক মূল্যবোধের ভিত সৃষ্টি হয় এবং (ঘ) কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ হয়।[৫১৩]

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো:

১. ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। এ ব্যবস্থায় নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আবশ্যক হবে। অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীরও বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করবে।
২. ফাযিল (পাস ও অনার্স) এবং কামিল (প্রথম ও শেষ পর্ব) ডিগ্রি কোর্সের বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রণয়ন করবে।
৩. উল্লিখিত কোর্সসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর পুর্ণগঠন করে উভয় স্তরেই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের মৌল বিষয় হিসাবে পদার্থ, রসায়ন, জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য এ স্তরের মাদ্রাসমূহের উন্নতমানের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ও প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

---

[৫০৯] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা নং- ৫০।
[৫১০] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা নং- ৫০।
[৫১১] বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মফিজ উদ্দিন), **ফেব্রুয়ারী- ১৯৮৮**, পৃষ্ঠা নং- ৬০।
[৫১২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং- ৬২।
[৫১৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং- ৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

৪. এ স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে একটি গতিশীল বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। যুগে যুগে দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অগ্রগতির আলোকে ইসালামকে উপস্থাপনে সক্ষম হলেই শিক্ষার্থীরা এর গতিশীল তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম হবে।[৫১৪]

পর্যালোচনাঃ

১৯৮৭ সালে অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। কমিশনের দুটি কমিট জাপান, চীন ও থাইল্যান্ড সফল করে সে সব দেশের শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। কমিশন ১৯৮৮ সালে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে দেশের শিক্ষা সংস্কার, পুনর্বিন্যাস এবং উন্নয়নের অনেকগুলি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। কমিটি শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুন:নির্ধারণ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সংকট চিহ্নিত করে। রিপোর্টে অবৈতানিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। কমিশনের রিপোর্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ধারা সংযুক্ত হয়, তা হলঃ 'শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ সাধন করা'। কমিটি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, মানবিক গুনাবলীর বিকাশ, চরিত্রবান ও আদর্শ মা নুষ তৈরী এ বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে পাশাপাশি বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহতি রাখা ও একে বিকশিত করাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী হিসেবে চিহ্নিত করে মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনাকে সমুন্নত করার প্রয়াস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। কমিটি আরো কয়েকটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিক্ষার লক্ষন হিসেবে স্থির করেছে যেমন যে সকল আদর্শ বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে সেগুলি সংরক্ষনের ব্যাপারে মৌলিক ভূমিকা গ্রহণ, দেশবাসীর ভিতর ঐক্যের বোধ শক্তিশালী করা, জনসেবার আদর্শ, কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করা, চরিত্রবান, নিলোর্ভ ও পরোপকারী হওয়া, সর্বপ্রকার অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সক্রীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা, যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রিপোর্ট সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছে যা খুবই ইতিবাচক।

কমিটি ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা সমূহকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করার কথা বলা হয়।

একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয়ের কথা বলা হয়, যা প্রশংসার যোগ্য। সর্বোপরী এ কমিটি নৈতিক ও ধর্মীয়, চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টের গুরুত্বারোপ করলেও শিক্ষার সকল স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেনি।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা (ডঃ এম.এ.বারী) কমিটি, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ

Madrasah Education (Dr. M.A. Bari) Committee, 1989

দেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৯-৩-৯৬/২৪-৭-৮৯ইং তারিখের স্মারক নং শাঃ ১৪/৩পি-১১/৮৯/১৪৯- শিক্ষা প্রজ্ঞাপন মূলে মাদ্‌রাসা শিক্ষা কমিটি নামে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠন করে।

পরবর্তীতে ১-১১-৮৯ইং তারিখে অন্য একটি প্রজ্ঞাপন বলে তিনজন এবং আরও পরে ৯-৫-৯০ইং তারিখে সংশোধিত প্রজ্ঞাপন মূলে আরো দু'জন সদস্য সহকারে মোট ২০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়।

কমিটির সদস্যদের পরিচিতি ঃ

১. ডঃ এম.এ.বারী, প্রকল্প উপদেষ্টা, অনুমোদন দানকারি বিশ্ববিদ্যালয়	চেয়ারম্যান
২. ডঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩. ডঃ মোঃ সিরাজুল হক, এমিরিটাস প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪. ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য

[৫১৪] বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মফিজ উদ্দিন), ফেব্রুয়ারী- ১৯৮৮, পৃষ্ঠা নং- ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ডঃ আ.হ.ম. করীম, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর সদস্য
৬. ডঃ এম.এ. জাব্বার, অধ্যক্ষ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর সদস্য
৭. জনাব আব্দুল হারুন পাশা, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সদস্য
৮. জনাব নাযির উদ্দিন আহমেদ, উপাধ্যক্ষ, এম.এম. কলেজ যশোর সদস্য
৯. মাওলানা মোফাজ্জল হোসাইন খান, পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা সদস্য
১০. জনাব হাসান আব্দুল কাইউম, সম্পাদক, মাসিক অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা সদস্য
১১. জনাব আ.ম. মুসলেহ উদ্দিন, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
১২. জনাব অধ্যাপক ডঃ মুজীবুর রহমান সদস্য
আরবি ও ইসলামিক শিক্ষাবিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৩. জনাব অধ্যাপক ডঃ সেকান্দার আলী ইবরাহিমী সদস্য
আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৪. জনাব মাওলানা আব্দুস সালাম সদস্য
অধ্যক্ষ, দুর্বাটি আলিয়া মাদ্রাসা, গাজীপুর
১৫. জনাব শরীফ আব্দুল কাদের সদস্য
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, শর্শিনা দাঃসুঃ আলিয়া মাদ্রাসা, পিরোজপুর সদস্য
১৬. মাওলানা মোঃ ইউনুস সিকদার, অধ্যক্ষ, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা সদস্য
১৭. জনাব আব্দুস সালাম খান সদস্য
রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
১৮. মাওলানা ফরিদউদ্দিন আত্তার, খতিব, আমিনবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা সদস্য
১৯. মাওলানা আব্দুল মান্নান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড সদস্য
২০. জনাব হাসানুজ্জামান, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সদস্য
সরকারি বি.এল. কলেজ, খুলনা পরবর্তীতে তদস্থলে
সচিবের দায়িত্ব পালন করেন, জনাব মোঃ ইলিয়াস আলী, চীফ,
পরিসংখ্যান বিভাগ, ব্যানবেইস ।[৫১৫]

পর্যালোচনাঃ কমিটি মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা পেশ করেন ।

শিক্ষা সংস্কার প্রচেষ্টা (১৯৯১-৯৫)

১৯৯৪ সালে শিক্ষা কারিকুলামকে ঢেলে সাজাবার জন্যে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় ।[৫১৬] এই টাস্ক ফোর্সের আওতায় নতুনভাবে যে কারিকুলাম তৈরী করা হয় তা উল্লিখিত মক্কা ঘোষণার[৫১৭] সাথে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হতে পারে । এতে শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়ঃ

- শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ।
- এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে নিম্নের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে হবে;

১. শিক্ষার্থীদের মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে ।
২. সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অন্তরে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা ।
৩. শিক্ষার্থীর মনে ধর্মীয়, আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, অর্থাৎ সৎ, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ মানুষ তৈরী করা ।

---

[৫১৫] মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ, জাগরণী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা নং- ৫৪৯-৫৫০
[৫১৬] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন ১৯৯৪ ।
[517] Declaration of the 3rd Summit Conference of the Muslim Heads of States held in Holy City of Makkah, KSA organized by the organization of Islamic Conference (25-28 January 1961)

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭

কমিটি গঠন ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৪-০১-৯৭ইং তারিখ প্রশাঃ ১/বিবিধঃ৫/৯৬/১৫৫- শিক্ষা সংখ্যক এক অফিস আদেশে সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এম.শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন।

কমিটির সদস্যবৃন্দ ঃ

১.	প্রফেসর এম. শামসুল হক, সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব
৩.	ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, মাননীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
৪.	মিসেস রাজিয়া মতিন চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য	সদস্য
৫.	প্রফেসর এ.কে.আজাদ চৌধুরী, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	প্রফেসর আবদুল খালেক ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭.	প্রফেসর আবদুল মান্নান, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮.	প্রফেসর আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯.	প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন, উপাচার্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১০.	প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ, উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১১.	প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২.	প্রফেসর গোলাম আলী ফকির, উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩.	প্রফেসর সৈয়দ মহিবুদ্দিন আহমদ উপাচার্য, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	প্রফেসর মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৫.	প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৬.	প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৭.	প্রফেসর আবুল কালাম মুহাম্মদ আমীনুল হক প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৮.	ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, প্রাক্তন সচিব	সদস্য
১৯.	ডঃ মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, উপাচার্য, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	সদস্য
২০.	প্রফেসর রশীদ উদ্দিন আহমদ নিউরো সার্জারি বিভাগ, আই পি জি এম আর	সদস্য
২১.	প্রফেসর রশীদুল হক, প্রাক্তন অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২২.	প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২৩.	প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী	সদস্য
২৪.	প্রফেসর এস জেড হায়দার, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২৫.	প্রফেসর আলমগীর মোঃ সিরাজউদ্দিন ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২৬.	প্রফেসর মোশার্রফ হোসেন খান উপাচার্য, আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

২৭. প্রফেসর আনিসুজ্জামান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
২৮. প্রফেসর এম আলী আসগর সদস্য
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
২৯. প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৩০. প্রফেসর মাযহারুল ইসলাম, প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৩১. কাজী ফজলুর রহমান, প্রাক্তন সচিব সদস্য
৩২. জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সাংবাদিক সদস্য
৩৩. প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী সদস্য
সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪. প্রফেসর দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৩৫. জনাব ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, সভাপতি, এফ বি সি সি আই, ঢাকা সদস্য
৩৬. ডঃ কাজী ফারুক আহমেদ সদস্য
নির্বাহী পরিচালক, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
৩৭. প্রফেসর এম এ কাদেরী সদস্য
বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ
৩৮. প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী সদস্য
সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
৩৯. প্রফেসর হামিদা বানু, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সদস্য
৪০. প্রফেসর আবদুর রফিক, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর সদস্য
৪১. প্রফেসর আজিজ আহমদ চৌধুরী সদস্য
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৪২. প্রফেসর মোঃ খুরশীদ আলম সদস্য
মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী
৪৩. প্রফেসর মুহম্মদ সায়ীদুল হক সদস্য
চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৪৪. (ক) প্রফেসর এম. আমান উল্লাহ সদস্য
ভারপ্রাপ্কত চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
ঢাকা (১৯/০৩/৯৭ পর্যন্ত)
৪৪. (খ) প্রফেসর মুঃ তোজাম্মেল হোসেন সদস্য
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৪৫. প্রফেসর শের মোহাম্মদ সদস্য
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী
৪৬. (ক) প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান সদস্য
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
কুমিল্লা (১৯/০৩/৯৭ পর্যন্ত)
৪৬. (খ) প্রফেসর আজিজুর রহমান সদস্য
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা
৪৭. (ক) প্রফেসর মোঃ নাজিম উদ্দিন সদস্য
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
যশোর (১৯/০৩/৯৭ পর্যন্ত)
৪৭. (খ) প্রফেসর মোঃ আফসার উদ্দিন শেখ সদস্য
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৪৮. প্রফেসর এ এম এম আহসান উল্লাহ সদস্য
চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. (ক) প্রফেসর মোঃ সা'দুল্লাহ	সদস্য
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড (১৯/০৩/৯৭ পর্যন্ত)	সদস্য
৫০. জনাব মোঃ শাহ আলম, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড,	সদস্য
৫১. প্রফেসর রফিকুল হক প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৫২. জনাব মুহম্মদ তমীযুদ্দীন, রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড	সদস্য
৫৩. জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, অধ্যক্ষ, জুবিলী স্কুল ও কলেজ, ঢাকা	সদস্য
৫৪. মিসেস হেনা দাস, প্রাক্তন মহাসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি	সদস্য
৫৫. জনাব শুদ্ধানন্দ মহাথের, অধ্যক্ষ, কমলাপুর বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ	সদস্য
৫৬. প্রফেসর আহাম্মদ উল্লাহ সরকার এগ্রোনমী বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়[৫১৮]	সদস্য

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট প্রণয়নের প্রেক্ষিতে তাদের মতামত তুলে ধরতে গিয়ে বলেনঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সতের নম্বর অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের শিক্ষানীতির মর্মকথা বিধৃত রয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করে একটি গণমুখী ও সার্বজনীন যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে তাতে জনগণের আশা-আকাঙ্খা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হবে এটাই প্রত্যাশিত। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন ও জনগনের প্রত্যাশার সঙ্গে সমকালীন বিশ্বের চাহিদার দিকেও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। পৃথিবীতে জ্ঞানের যে বিস্ফোরণ ঘটছে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে ইদানিং শিক্ষার যে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে সেদিকেও আমাদের তাকাতে হবে। তাই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে সমকালীন বিশ্বের জ্ঞানপ্রবাহের তুল্যমানে উন্নীত করতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পুর্নবিন্যাস প্রয়োজন। সেদিকে লক্ষ রেখেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বগ্রহনের অল্পকাল পরেই তাদের প্রতিশ্রুতি শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রির্পোটের আলোকে যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, চিন্তাবিদ, পেশাজীবী ও শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি সমম্বয়ে ৫৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি গঠিত হওয়ার পর সদস্যগণ চব্বিশটি সভায় মিলিত হয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন, মতবিনিময় করেন এবং উনিশটি উপকমিটির প্রতিবেদন বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার পর চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। এছাড়া কমিটি জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত জনগণের মতামত ও মনোভব পর্যালোচনা করে, কমিটির চেয়ারম্যান দেশের পাঁচটি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী ও সংগঠনের প্রতিনিধির সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এতদ্ব্যতীত কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও জাতীয় দৈনিকসমূহের সম্পাদকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে সভায় মিলিত হয়ে মতবিনিময় করেন ও মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।[৫১৯]

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছেঃ

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির ধারা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা।[৫২০]

---

[৫১৮] প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৫৬৫-৫৬৮

[৫১৯] প্রাগুক্ত।

[৫২০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি-সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজী ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় থাকবে।[৫২১]

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতার প্রয়োগের মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।[৫২২]

প্রকৌশল শিক্ষা, সুপারিশ-

প্রকৌশল শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের সময়ে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।[৫২৩]

ললিতকলা শিক্ষা

একটি সংস্কৃতবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্যসচেতন, সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য ললিতকলা শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরী। ললিতকলার অর্ন্তগত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও নানাবিধ হাতের কাজ, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। ললিতকলা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনের সুকুমার বৃত্তিকে জাগ্রত করে, মন ও কর্মে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে, তাই পরিমিতজ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ এবং সুনাগরিক জনগোষ্ঠী সৃষ্টিতেক ললিতকলা শিক্ষা আবশ্যক। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। ললিতকলা শিক্ষার ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ন্যায় বিদ্যালয়ত্যাগী শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানের উদ্বুদ্ধ করা যায়।[৫২৪]

নারী শিক্ষা

প্রথমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যসূচিতে যথার্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ইতিবাচক ও প্রগতিশীল ভাবমূর্তি ও সমান অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে এবং ইতিবাচক দিকগুলো পাঠ্যসূচীতে আনতে হবে, যাতে নারীর প্রতি সামাজিক আচরণের পরিবর্তন হয়।[৫২৫]

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে আরও অধিক সংখ্যক মহীয়সী নারীর জীবনী ও নারীদের রচিত লেখা অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।[৫২৬]

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষার মুল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন পত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহনযোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্খিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনে লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে; তাই, পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমে এগুলো প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ,

---

[৫২১] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ১০।
[৫২২] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ১৪।
[৫২৩] প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ১৬।
[৫২৪] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ২২।
[৫২৫] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ২৪।
[৫২৬] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।[৫২৭]

সুপারিশ

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে ধর্মীয়, সামাজিক, মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে।[৫২৮]

প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে কমিটি উল্লেখ করেন

বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষ আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিদ্যমান। তবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সব ধর্মের শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না বলে প্রয়োশ এক ধর্মাবলম্বী শিক্ষক অন্য ধর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। অনেকে মনে করেন ধর্ম ব্যাক্তিগত ব্যাপার এবং সেজন্য ধর্মশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক অবয়বের প্রয়োজন নেই; কেউ শিশুকে ধর্মশিক্ষা দিতে চাইলে তা ব্যাক্তিগত উদ্যেগে দিতে পারেন। তাঁদের মতে মানবিক মূল্যবিদ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমেই হতে পারে ; তার জন্য আলাদাভাবে ধর্মশিক্ষা বিষয় হিসেবে রাখার প্রয়োজন নেই। আবার অন্য মত হল আমাদের দেশে পারিবারিক পর্যায়ে অনেকক্ষেত্রে ধর্মের নামে কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়া হয়; তাই স্ব-স্ব ধর্মশিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অংশরূপে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত নানামুখী শিক্ষাধারাকে একীভূত করার প্রয়োজনে তৃতীয় শ্রেণী থেকে স্ব-স্ব ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশিক্ষার জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য মিসেস হেনা দাস প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থা রাখা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষন করেন। ধর্মশিক্ষায় নিছক আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে সৎ জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া বাঞ্চনীয়।[৫২৯]

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিটির মতামত

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষসাধন এবং জীবনে ও সমাজে নৈতিকতা প্রয়োগরে মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। শিক্ষার্থী নিজ নিজ ধর্মের এবং অন্য ধর্মেরও মূল বিষয়গুলো জানবে, নিজ ধর্মের আচার অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে এবং পরমসহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জীবসেবা প্রভৃতি বৃত্তি ও গুনাবলিতে বিভুষিত হবে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সেই লক্ষ্যে প্রদান করা হবে।[৫৩০]

এ ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ হচ্ছে:

শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অনুসারে ইসলাম শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক যথার্থভাবে প্রণয়ন করতে হবে। আল্লাহতায়লার সিফাত ও গুণাবলি, রাসূল, কিতাব, আখিরাত, কবর, মীযান, কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়গুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ-এর তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।[৫৩১]

ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী ও বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে। স্তরভিত্তিক প্রান্তি ক যোগ্যতা ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে। এরই আলোকে পাঠ্যসূচী, পাঠ্যসূচির পরিসর ও পরিকল্পিত কাজ নির্ণয় করতে হবে।

পাঠ্যপুস্ত ক প্রণয়নের নির্দেশনা, শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নের নির্দেশনা চিহ্নিত করতে হবে। উদ্দেশ্যের আলোকেই শিখনফল, শিক্ষকের কাজ ও শিক্ষার্থীর কাজ নির্দিষ্ট করতে হবে। এরই ভিত্তিতে শিখন শেখানোর কার্যাবলি, শিক্ষা

---

[৫২৭] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৩১।
[৫২৮] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৩১।
[৫২৯] প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৪৩, ৪৪।
[৫৩০] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৮১।
[৫৩১] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

উপকরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর জন্য শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।[৫৩২]

বিভিন্ন শিক্ষাস্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা কমিটির মতামত

প্রাক-প্রাথমিক স্তর

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মৌলিকভাবে সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান,সততা, গুরুজনকে ভক্তি করা, মানুষকে ভালবাসা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে মুখে মুখে পাঠদান করা হবে। শিক্ষার্থীরা শুধু শুনবেই না নিজেরা বলবেও। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কারণে ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও সৃষ্টিকর্তা একজনই, এ কথা এ স্তরের শিক্ষার্থীা জানবে। বিভিন্ন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কেও একেবারেই প্রাথমিক বা পরিচয়মূলক জ্ঞান তারা অর্জন করবে।

মাধ্যমিক স্তর (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী)

নবম শ্রেণী থেকৈ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্মদর্শন, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাখ্যান মহাপুরুষদের জীবনী, নিজ নিজ ধর্মীয় ভাষা ও সকল ধর্মের নৈতিক উপাখ্যান সংবলিত নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে।[৫৩৩]

ডিগ্রি ও মাস্টার্স

ডিগ্রি ও মাস্টার্স স্তরে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অনুরূপ ব্যবস্থা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মের জন্যও প্রবর্তন করতে হবে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে জবে। নিয়ন্ত্রনকারী বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি ও মাস্টার্স স্তরের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্ম শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

ধর্মশিক্ষার সুযোগ, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক প্রসঙ্গ

ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য সমান সুযোগ ও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াবার ব্যবস্থা বিভাগ বা শিক্ষক না থাকার কারণে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে নির্ধারিত ধর্মশিক্ষার বিকল্প হিসেবে অন্য কোন বিষয় পড়ানোর প্রচলিত রীতির পরিবর্তন করতে হবে। বাধ্যতামূলক বিষয়ের শিক্ষক অবশ্যই রাখতে হবে।[৫৩৪]

চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে দুটি নতুন বিষয় পড়ানো হবে, তবে এই দুটি বিষয়ে আপাতত পরীক্ষা হবে না। এই বিষয় দুটি হবে Behavioural Science and public Relation এবং Bio Statistic.[535]

ললিতকলা শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়ঃ

ললিতকলা শিক্ষা সৌন্দর্যবোধ ও সৃষ্টিশীলতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীকে আপন ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতন করে। আপনি সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আয়ত্ব করার ব্যবস্থা নিশ্চিত হলে বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালি সংস্কৃতির স্থান সম্পর্কে শিক্ষার্থী সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারবে। তাই যথাযথ শিক্ষার ভেতর দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি গৌরববোধ জাগিয়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

ললিতকলার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে কোন শিক্ষার্থী অষ্টম, নবম বা দশম শ্রেণী থেকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিলেও প্রয়োজনে সেই শিক্ষার্থী চারুকলা, কারুশিল্প ও হাতের কাজ, সংগীত, নাটক, নৃত্যকলা ইত্যাদির যে কোনটিকে তার পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

---

[৫৩২] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৮২।
[৫৩৩] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৮৩।
[৫৩৪] প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৮৫।
[৫৩৫] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার প্রাণবিন্দু হচ্ছে শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও বাঞ্ছিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠে তাই পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলোর প্রতিফলন শিক্ষাক্রমে সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।[৫৩৬]

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, জাতীয় দর্শন, আদর্শ ও আশা-আকাঙ্খা শিক্ষাক্রমে প্রতিফলন ঘটানো এবং মানবিকতাবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতাবোধের উজ্জীবন।[৫৩৭]

পর্যালোচনাঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭

১৯৯৭ সালে তৎকালীন নতুন সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজে হাত দেয়। প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হকের নেতৃত্বে সরকার ৫৬ 'সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে'। ১৯৭৪ সালে প্রণীত 'কুদরত-ই-খুদা কমিশন' রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পূর্বশর্ত নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সুপারিশের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। নতুন করে শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করলেও কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার কারণে বিতর্ক দেখা দেয়। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা এবং বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের কাছে বক্তব্য তুলে ধরা হয়। জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের দাবী পেশ করা হয়। জাতীয় আদর্শ ইসলামের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন, সংশোধন ও সংস্কারের দাবীতে কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হকের কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করা হয়।

কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ শামসুল হক শিক্ষানীতির প্রত্যাশা প্রসঙ্গে বলেন, 'জনগণের আশা-আকাঙ্খা, দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হবে এটাই প্রত্যাশিত'। দেশের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর শিক্ষার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের প্রয়োজন নিরক্ষরতামুক্ত একটি শিক্ষিত, প্রগতিশীল, বিজ্ঞান-মনস্ক, দেশপ্রেমিক, নৈতিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ-সম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা, যারা এদেশ গঠনে যথার্থ অবদান রাখতে পারবে'। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষা কমিটির রিপোর্টে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (অধ্যায়-৩) বর্ণনা করতে গিয়ে কমিটি বলেছে যে, 'প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তীকালের জীবনভর শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে। মৌলিক শিক্ষা বা বুনিয়াদী শিক্ষা বলে গণ্য করা হয় তা প্রতিটি শিশুর আনন্দময় বর্তমান ও উৎপাদনশীল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লিখিত বক্তব্যে শিশুদের বস্তুবাদী আদর্শ ও ভোগবাদী চিন্তা-চেতনার অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিটি শিশুমনে নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক আচরণের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও শিশুর মননশীলতার উপযোগী করে চরিত্র গঠনে ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেনি। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার 'স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী' শিরোনামে (অধ্যায়-৫.১) বলা হয়েছে 'প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম হবে দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা, শিশুদের দেহমনের পুষ্টি এবং তাদের সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন।' 'প্রাথমিক স্তরের

[৫৩৬] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ১৫৭।
[৫৩৭] প্রাগুক্ত,, পৃষ্ঠা- ১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়। তৃতীয় শ্রেণী থেকে থাকবে ইংরেজী ভাষা ধর্ম (জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব)'।

কমিটির এ রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ব থেকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় যেখানে শিশু-কিশোরদের জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে ইসলামী শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত রাখার সুপারিশ করা হয়নি। অথচ প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত চারটি বিষয় শিশুদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল যথা- বাংলা, অংক, ইংরেজী ও ইসলাম শিক্ষা। মূলতঃ আরবী ও ইসলাম শিক্ষা একেবারে বাদ দিয়ে চারু ও কারুকলা এবং সঙ্গীত শিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে। কমিটি শিশুমনে ধর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতাকে স্বীকার করেনি। ফলে তা শিশুদের অভিভাবকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

কমিটির রিপোর্টে সার-সংক্ষেপ (অধ্যায়-১) 'প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা' শিরোনামের চতুর্থ লাইন থেকে বলা হয়েছে 'প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রমের প্রতি আকর্ষণ এবং শিশুদের মধ্যে দেশপ্রেম, নাগরিকত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, কৌতূহল, সৃজনশীলতা, অধ্যাবসায়, সদাচার, ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি বাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জন করতে সহায়তা করা হয়'। এ ধরনের বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে জানার বিষয়টি কাঙ্খিত গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। কমিটি এন.জি.ও পরিচালিত শিক্ষা পদ্ধতিকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু কমিটির সুপারিশে মসজিদ বা আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তবের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপারিশমালায় 'ইসলামী শিক্ষা' রাখা হয়নি।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে কমিটি উল্লেখ করেছে 'ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বত্র নৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতার প্রয়োগের মানসিকতা চরিত্র গঠন। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ ধর্মের মূল বিষয়গুলো জানবে'। কমিটির উক্ত বক্তব্যের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

ক. প্রাক-প্রাথমিক স্তরে বা প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা রাখা হয়নি।
খ. ইসলাম জানার মূল উৎস কুরআন ও হাদীস। তা শেখার জন্যে আরবী ভাষা জানা অপরিহার্য। অথচ প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে আরবী অক্ষর পর্যন্ত শেখানোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি।
গ. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার আড়ালে ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করা হয়েছে।

ললিতকলা শিক্ষা শিরোনামে বলা হয়েছে 'একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচি-সম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন, সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিক গোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য ললিতকলা শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরী'। 'ললিতকলা বিষয়টি সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে আবশ্যিক ও মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করতে হবে'। 'সরকারী উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে জাতীয় চিত্রশালা, সঙ্গীত ও নৃত্য একাডেমী ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে হবে'। পাশাপাশি জাতীয় চেতনা ও মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষাকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

মূলত মার্জিত ও রুচিসম্মত ললিতকলা শিক্ষা নির্মল চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হতে পারে, কিন্তু এ শিক্ষা কখনও শিক্ষার মূল ঐতিহ্যের ধারক হতে পারে না যদি না সেখানে ধর্মীয় তথা নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকে।

শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শিক্ষকের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত সুপারিশে 'শিক্ষক-প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর আধুনিকরণ প্রয়োজন' বলা হলেও নৈতিক শিক্ষার জন্যে অপরিহার্য উপকরণ ইসলামী শিক্ষার সুপারিশ করা হয়নি। উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কমিটি জাতীয় আশা-আকাঙ্খা ও মূল্যবোধের আলোকে রিপোর্ট তৈরি করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০

কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ভূমিকায় বলা হয়েছেঃ বাংলাদেশে বর্তমানে কোন পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি নাই। শিক্ষাকে জাতীয় কলাণের চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি। সুপরিকল্পিত, সময়োপযোগী, পূর্ণাঙ্গ ও সুষ্ঠু শিক্ষানীতি ছাড়া শিক্ষার অগ্রগতি তথা জাতীয় অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। শিক্ষানীতি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে এবং জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে কাঙ্খিত পরিবর্তন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ক্ষমতা গ্রহণের উষালগ্নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয় এবং একটি সুস্পষ্ট শিক্ষানীতি ব্যতিরেকে জাতি লক্ষ্যহীনভাবে শিক্ষায় বিনিয়োগ করবে যাতে জাতির উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে এবং সম্পদের অপচয় হবে। এর প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। পরবর্তীতে তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এ বিষয়ে আর কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয় নাই। বর্তমান সরকার ১৯৭৪ সালে প্রস্তুতকৃত কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি বাস্তব, গণমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এ উদ্দেশ্যে সরকার নিম্নলিখিতভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করলেন ঃ[৫৩৮]

১. চেয়ারম্যান ঃ অধ্যাপক শামসুল হক,
   সাবেক উপদেষ্টা।
২. সদস্য সচিব ঃ জনাব মুহঃ ফজলুর রহমান
   ভারপ্রাপ্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ ঃ

৩. ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, সংসদ সদস্য।
৪. মিসেস রাজিয়া মতিন চৌধুরী, সংসদ সদস্য।
৫. উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৬. উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৭. উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
৮. উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
৯. উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
১০. উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১১. উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
১২. উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।
১৩. উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
১৪. উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
১৫. উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
১৬. অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৭. অধ্যাপক আমিনুল হক, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮. ডঃ আবদুল্লাহ্ আলমুতি শরফুদ্দিন, ২২/৪, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।
১৯. ডঃ মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন, উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২০. অধ্যাপক ডাঃ রশীদ উদ্দিন আহমদ, নিউরো সার্জারী বিভাগ, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।
২১. অধ্যাপক রশীদুল হক, প্রাক্তন অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
২২. অধ্যাপক ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২৩. অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

---

[৫৩৮] প্রশা:১/বিবিধ-৫/৯৬/১৫৫-শিক্ষা তারিখ: ১৪/১/১৯৯৭ইং

Dhaka University Institutional Repository

২৪. অধ্যাপক এস, জেড, হায়দার, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২৫. অধ্যাপক আলমগীর মোঃ সিরাজউদ্দিন, প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
২৬. অধ্যাপক মোশার্রফ হোসেন খান, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২৭. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২৮. অধ্যাপক ডঃ এম আলী আসগর, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২৯. অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩০. ডঃ মাজহারুল ইসলাম, প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী,
৩১. কাজী ফজলুর রহমান, প্রাক্তন সচিব।
৩২. জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সাংবাদিক।
৩৩. অধ্যাপক ডঃ আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিকী, সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৩৪. অধ্যাপক ডঃ দুর্গাদাশ ভট্টাচার্য, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৫. জনাব ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি, ঢাকা।
৩৬. ডঃ কাজী ফারুক আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা।
৩৭. অধ্যাপক ডাঃ এম এ কাদেরী, প্রাক্তন অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।
৩৮. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতিনিধি।
৩৯. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪০. মহাপরিচালক, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪১. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪২. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী, ঢাকা।
৪৩. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪৪. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।
৪৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা।
৪৬. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
৪৭. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।
৪৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪৯. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৫০. চেয়ারম্যান, কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫১. জনাব মোঃ রফিকুল হক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫২. রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫৩. অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান, ৩৯ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।
৫৪. মিসেস হেনা দাস, ১১৭/৩, খানপুর প্রধান রাস্তা, ডন চেম্বার, নারায়নগঞ্জ।[৫৩৯]

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুনাবলীর (যেমন ঃ ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যাবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
বিশ্বভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।[৫৪০]

---

[৫৩৯] জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা নং- ৫৬-৫৭
[৫৪০] প্রাগুক্ত, ০১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে:

শিশুকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা ।541 "০৩

শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, মানবাধিকার, সহজীবন যাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মীক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা ।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে তারা বলেন:

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিষয়সমূহ হবে মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি- সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারিরীক শিক্ষা, সংগীত ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে তা বাধ্যতামূলক হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম শ্রেণী থেকে সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় থাকতে পারে। প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণীতে অর্থ্যাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হবে, যাতে যারা আর বিদ্যালয় পড়বে না এ শিক্ষার ফলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে ।542

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে কমিটি মনে করেন:

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন আচরণগত উৎকর্ষসাধন এর্ব জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এ সকল ব্যবস্থা সুসংহত ও গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান হল ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌল বিষয় সমূহের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেয়া হয়েছে। কাজেই ধর্ম শিক্ষা যাতে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া আবশ্যক ।543

চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

চিকিৎসা পেশা অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে স্পর্শকাতর, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত বলে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকাসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী যেন সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ হিসাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হন সেই জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা ।[৫৪৪]

ললিতকলা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে:

একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচিসম্পন্ন, ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিকগোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য ললিতকলা শিক্ষাদান অত্যন্ত জরুরি। ললিতকলার অর্ন্তগত সংগীত, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও নানাবিধ হাতের কাজ, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি বিষয় শিক্ষার্থীর মন ও মননকে বিকশিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করে। ললিতকলা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনের সুকুমার বৃত্তিকে জাগ্রত করে, মন ও কর্মে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে তাই পরিমিতিজ্ঞানসম্পন্ন, দক্ষ এবং সুনাগরিক গনগোষ্ঠী সৃষ্টিতে ললিতকলা শিক্ষা আবশ্যক। দেশের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সংগীত, নাটক, যাত্রা ও থিয়েটার ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন এর মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায়, তেমনি বিভিন্ন দেশের শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। ললিতকলা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদেরকে একটি বা একাধিক শাখায় শিক্ষার সুযোগ দিয়ে তাদের ঐসব বিষয়ে দক্ষ পেশাজীবী হয়ে উঠতে সহায়তা করা। ললিতকলা শিক্ষার ফলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ন্যায় বিদ্যালয়ত্যাগী শিক্ষার্থীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে ।[৫৪৫]

---

[৫৪১] প্রাগুক্ত, ০২ ।
[৫৪২] প্রাগুক্ত, ০৩ ।
[৫৪৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩ ।
[৫৪৪] প্রাগুক্ত, ১৮ ।
[৫৪৫] প্রাগুক্ত, ২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

আইন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার আদর্শ স্থাপন করবেন।[৫৪৬]

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কমিটি তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে বলেনঃ

শিক্ষার মূল প্রাণবিন্দু শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এটা যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম প্রণীত হবে এটাও কাঙ্খিত। যেহেতু একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের বিরাজমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘদিনের লালিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা বাঞ্চনীয় তাই পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাক্রমে এগুলোর প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হয়। মূলত শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঙ্খিত আচরণিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দেশপ্রেমিক, আত্মনির্ভরশীল, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শ্রমনিষ্ঠ সুনাগরিক জনগোষ্ঠী গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর সোপান হচ্ছে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর আলোকেই রচিত হয় পাঠ্যপুস্তক। তাই শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।[৫৪৭] তাই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে সামাজিক, মানবীয়, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরসহ শিক্ষার প্রতিটি স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মাতৃভাষা, আপন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটবে।[৫৪৮]

<u>পর্যালোচনাঃ</u>

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। পাশাপাশি বলা হয়েছে জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা নৈতিক মুল্যবোধ বিকশিত করে বংশ পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকশিত করার জন্যে ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাথমিক স্ত র থেকে শিক্ষার সকল শাখায় বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়নি। উপরন্তু সব ১ম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত কোন ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হনি। কোমলমতি শিশু মনে প্রথমেই ধর্ম সম্পর্কে অনীহাভাব তৈরী হবে বলে আশংকা করা যায়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূতি সামাজিক, মানবিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ।

প্রতিফলন ঘটবে বলা হলেও সুস্পষ্ট দিক নিদের্শনা দেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরীর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রয়োজন ছিলো।

- চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হে য়ছে– চিকিৎসা পেশা অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে স্পর্শকাতর, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট/অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে জড়িত বলে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকাসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী যেন সংবেদনশীল। বিবেকবান মানুষ হিসাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত জন সেই জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু বিবেকবান মানুষ তৈরীর প্রধানতম হাতিয়ার যে ধর্মীয় শিক্ষা তা উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে চিকিৎসক, সেবক, সেবিকা বা স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে সংবেদনশীল বিবেকবান মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য চিকিৎসা শিক্ষায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা প্রয়োজন ছিলো।
- আইন শিক্ষাতে ও নৈতিকতার আদর্শ স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ধর্ম শিক্ষা ব্যতিরেকে কিভাবে নৈতিকতার আদর্শ সমুন্নত করা যাবে তা আমাদের বোধগম্য নয়। সামাজিক শৃংখলা সুবিচার ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র আইন শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সঙ্গত কারণেই এক্ষেত্রে নৈতিকতা ভিত্তিক জনবল তৈরীর লক্ষ্যে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য্য ছিলো।

---

[৫৪৬] প্রাগুক্ত, ২৭

[৫৪৭] প্রাগুক্ত, ৩৮

[৫৪৮] প্রাগুক্ত, ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০০২

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৪/১২/২০০১ তারিখের শিমশা ৭/৩ সমন্বয় (মানব সম্পদ-৪)/২০০১/৪০৭ সংখ্যক অফিস আদেশ (পরিশিষ্ট 'ক' তে কপি সংযোজিত) এর মাধ্যমে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এতে কমিটির উপরে একটি মাত্র দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বলা হয়, কমিটি দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবিলম্বে বাস্তবায়নযোগ্য সংস্কার চিহ্নিত করবে।

এ কমিটিকে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান বর্তমান নৈরাজ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কারণসমূহ চিহ্নিত করে এই অস্থির ও অসহনীয় অবস্থা থেকে কিভাবে আশু পরিত্রাণ লাভ করা যায় যে বিষয়ে সুপারিশ পেশ করা।[৫৪৯]

কমিটি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন: শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে এক চরম নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে যার আশু অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এটাও এক কঠিন বাস্তবতা যে শিক্ষাঙ্গনগুলো বৃহত্তর সমাজেরই অংশ বিশেষ। আর এই সমাজে এখন সকল আদর্শবাদ ও মূল্যবোধ চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অবহেলিত। অনভিপ্রেত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, অস্থির ও সংঘাতময় রাজনৈতিক অবস্থা, সকল স্তরে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিস্তার, ব্যাক্তি ও সামাজিক জীবনে সম্প্রীতি, সমঝোতা ও পরম সহিষ্ণুতার একান্ত অভাব এবং ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত তথাকথিত সুশীল সমাজ পরিস্থিতিকে আরও নাজুক ও সংকটময় করে তুলছে। তদুপরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যবহার, ছাত্রদলগুলির জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির অঙ্গ সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি ও শিক্ষাঙ্গনে উপস্থিতি, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষকমন্ডলীর ক্যাম্পাস ও জাতীয় রাজনীতির সাথে সক্রিয় সম্পৃক্তি এবং এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও দলবাজি প্রভৃতি অবাঞ্ছিত কার্যক্রম পরিস্থিতিকে আরও সঙ্গীন করে তুলছে। কমিটি অভিমত পেশ করেন যে, জাতি হিসাবে জগত সভায় মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে এবং আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে অটুট রাখতে হলে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন সময়ের দাবী। আমরা যদি এ সুযোগ হারিয়ে বসি তবে তার খেসারত পুরো জাতিকে শোধ করতে হবে অতি উচ্চ মূল্যে। দেশের সমাজপতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে কারণ সামাজিক পরিবর্তনের নেতৃত্ব তো তাঁদেরকেই দিতে হবে।[৫৫০]

সংস্কার কমিটি আরো অভিমত দেন যে, আমাদের দেশে বর্তমান সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে এবং সংবিধানের মূল সুরের (Sprit) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির ভিতর যেন নৈতিক মূল্যবোধ (moral values) এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটে তার জন্য সর্বশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থা মূল্যবোধশূণ্য (value free) না হয়ে বরং মূল্যবোধ সমৃদ্ধ (value laden) হওয়াই বাঞ্চনীয়।[৫৫১]

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশে উল্লেখ করেন ঃ

> শিক্ষা ব্যবস্থাকে জীবনমুখী ও কর্মসংস্থানের ভিত্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিকুলামে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করে সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা যায়।[৫৫২]

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত সুপারিশমালায় বলেন ঃ

যেভাবে বিশ্বব্যাপী নৈতিক অবক্ষয় নেমে আসছে ও মানবিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, তাতে গোটা মানবজাতির শান্তি হুমকির মুখে পড়েছে। যান্ত্রিকতা মানব সভ্যতাকে গ্রাস করে ফেলেছে। দেশের ভিতরে ও বাইরে বিদ্বেষ, হিংস্রতা ও হানাহানি প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, আইন প্রভৃতি 'লিবারেল আর্টস'- এর একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে মনোবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, কম্পিউটার লিটারেসির মত 'পপুলার সায়েন্সে'র কিছু বিষয় এই কোর্সের অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।[৫৫৩]

---

[৫৪৯] শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি, ঢাকা, জুলাই-২০০২, (প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী), ভুমিকা-ক।
[৫৫০] প্রাগুক্ত, ভুমিকা-খ।
[৫৫১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬।
[৫৫২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮।
[৫৫৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়সমূহে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে এক্ষেত্রে কমিটি তাদের অভিমত প্রদান করেন:

বর্তমানে দেশে ইংরেজীকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে কেজি স্কুল খোলা হচ্ছে। সমাজের বিত্তবান মানুষ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের শিশুদের তাদের ভর্তি না করে এ সব ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে তাদের সন্তানদের ভর্তি করে গৌরব বোধ করে। এ সব বিদ্যালয়ের ভিন্ন পরিবেশে লালিত-পালিত শিশু জীবনের শুরু থেকেই নিজেদেরকে সাধারণ শিশু থেকে স্বতন্ত্র ভাবতে শেখে। ক্রমান্বয়ে এসব বিদ্যালয়ের শিশুরা দেশ, সমাজ এবং এমনকি নিজের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সমাজে শ্রেণীবিভেদের এ বীজ বপন সুস্থ সমাজ গঠনের পরিপন্থী। এ অবস্থার আশূ অবসান প্রয়োজন।[৫৫৪]

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক উপ-কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও জীবনমুখী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে উপ-কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে জীবনমুখী ও কর্মসংস্থানের ভিত্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিকুলামে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ পূর্বক বর্তমান পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনের পদক্ষেপ নিতে হবে বলে সুপারিশ প্রদান করেন।[৫৫৫]

কমিটির সদস্যবৃন্দ

২০/১/২০০২ তারিখের শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটির ২য় সভায় কো-অপ্টেড ৬জন সদস্যসহ সংস্কার কমিটির সংশোধিত পূর্ণাঙ্গ তালিকা ঃ

১.	ড. এম এ বারী, প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২.	প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩.	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৪.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ঢাকা	সদস্য
৫.	ডঃ শেখ মাকসুদ আলী, প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ ইরশাদুল হক, প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সদস্য
৭.	প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ আহমেদ, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন	সদস্য
৮.	প্রফেসর ইউসুফ আলী, প্রাক্তন উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯.	প্রফেসর মোঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১০.	প্রফেসর মোঃ ফাইসুল ইসলাম ফারুকী, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	সদস্য
১১.	প্রফেসর এম শফিকুর রহমান, উপাচার্য, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	সদস্য
১২.	প্রফেসর এম জসিম উদ্দিন আহ্মেদ, উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
১৩.	প্রফেসর মু. আবদুল কাদের ভূঁইয়া, উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	সদস্য
১৪.	প্রফেসর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
১৫.	প্রফেসর নূর উদ্দীন আহমেদ, উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
১৬.	প্রফেসর এ জেড এম নূরুদ্দীন চৌধুরী, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	সদস্য
১৭.	প্রফেসর এম এরশাদুল বারী, উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
১৮.	প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরী, উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
১৯.	প্রফেসর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	সদস্য
২০.	প্রফেসর মোঃ আবদুল হালিম খান, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর	সদস্য

---

[৫৫৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪।
[৫৫৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

২১. প্রফেসর এ এম ফারুক, উপাচার্য, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা সদস্য
২২. প্রফেসর ওয়াকিল আহমেদ, প্রাক্তন উপ-উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল, ঢাকা সদস্য
২৩. প্রফেসর এম. শমসের আলী, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
২৪. প্রফেসর শাহ্ মোঃ ফারুক, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ। সদস্য
২৫. প্রফেসর এম এ হামিদ/প্রফেসর মুহাম্মদ আযহারুদ্-দীন, উপাচার্য, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা সদস্য
২৬. প্রফেসর জেড এন তাহমিদা বেগম, চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ঢাকা সদস্য
২৭. প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা সদস্য
২৮. প্রফেসর মোস্তাহিদুর রহমান, অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা সদস্য
২৯. প্রফেসর রাজিয়া আখতার বানু, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা সদস্য
৩০. জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সদস্য
৩১. অধ্যাপিকা আসমা আব্বাসী, বাংলা বিভাগ, পুরানা পল্টন গার্লস কলেজ, ঢাকা সদস্য
৩২. মিসেস ইয়াসমীন মোরশেদ, অধ্যক্ষ, স্কলাসটিকা সদস্য
৩৩. ডঃ নজরুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান, কাউন্সিল অব বিআইটি সদস্য
৩৪. প্রফেসর আবদুর রশীদ, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা সদস্য
৩৫. প্রফেসর মোঃ হাবিবুর রহমান কাবিলী, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা সদস্য
৩৬. প্রফেসর মোঃ আবুল বাশার, মহাপরিচালক, কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর সদস্য
৩৭. প্রফেসর মোহাম্মদ শরীফ হোসেন, সন্দীপন, যশোর সদস্য
৩৮. প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ সদস্য
৩৯. ডঃ মাহবুবুল হক, শিক্ষক, সানবীম, ঢাকা সদস্য
৪০. সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি সদস্য
৪১. মাওলানা এম এ লতিফ, সভাপতি, বাংলাদেশ মাদ্রসা শিক্ষক সমিতি সদস্য
৪২. জনাব মোহাম্মদ সেলিম ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি সদস্য
৪৩. জনাব সফদার আলী, প্রধান শিক্ষক, মনিপুর হাই স্কুল সদস্য
৪৪. অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান, অধ্যক্ষ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, খুলনা সদস্য
৪৫. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব, উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য সচিব

কো-অস্টেড সদস্যবৃন্দঃ
৪৬. *প্রফেসর মোঃ ইউনুস আলী দেওয়ান, মহাপরিচালক, নায়েম, ঢাকা সদস্য
৪৭. *প্রফেসর এ কে এম আজহারুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী সদস্য
৪৮. *অধ্যক্ষ, হারুনুর রশীদ, কলামিস্ট সদস্য
৪৯. *প্রফেসর আমজাদ আলী খান, সাবেক কোর্স এণ্ড কারিকুলাম স্পেশালিষ্ট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর সদস্য
৫০. *প্রফেসর এম এ হাদী, ভাইস-চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সদস্য
৫১. *চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা সদস্য[৫৫৬]

[৫৫৬] শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি, প্রতিবেদন, ঢাকা জুলাই ২০০২, পৃষ্ঠা নং- ৮৫-৮৬

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩

২১.১০.২০০২ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা পর্যালোচনা করে উপযুক্ত সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত শিক্ষাবিদ/কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করেন ঃ

কমিটির সদস্যবৃন্দঃ

১. প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. প্রফেসর ডঃ এস.এম.এ ফায়েজ, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৫. প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৬. প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
৭. প্রফেসর ডঃ মোঃ আলী মুর্ত্তাজা, ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৮. প্রফেসর এম.এ হাদী, ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯. প্রফেসর ডঃ এম. শমসের আলী, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০. ডঃ হাফিজ জি. এ সিদ্দিকী, ভাইস চ্যান্সেলর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১১. প্রফেসর ডঃ বজলুল মবিন চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
১২. প্রফেসর ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, প্রাক্তন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৩. প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১৪. জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৫. জনাব আবদুর রফিক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৬. প্রফেসর এম. শরিফুল ইসলাম, সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ এবং অধ্যক্ষ মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ।
১৭. প্রফেসর গিয়াসউদ্দিন আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
১৮. অধ্যক্ষ, মাদ্রাসায়ে আলিয়া, ঢাকা।
১৯. অধ্যক্ষ, ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল।
২০. জনাব ইয়াসমিন মোর্শেদ, প্রিন্সিপাল, স্কলাসটিকা।
২১. জনাব সালমা খান, প্রাক্তন যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন।
২২. জনাব সবকার আলী, প্রধান শিক্ষক, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়।
২৩. জনাব মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।
২৪. জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব, যুগ্ম-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।[৫৫৭]

কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেনঃ শিক্ষালাভ একজন মানুষের জন্মগত অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে এদেশের নাগরিকদের মৌলিক শিক্ষার অধিকার সমুন্নত রাখা হয়েছে। একজন মানুষকে তার ব্যাক্তিগত চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানো, পরিবার ও সমাজের সক্রিয় সদস্য হিসেবে কতার যথার্থ ভূমিকা পালন, নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, ধর্মীয় কর্তব্য পালন এবং দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, বিশ্বমানবতা, অসাম্প্রাদায়িকতা, মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ সৃষ্টি এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলার জন্য নূন্যতম মৌলিক শিক্ষা একান্ত আবশ্যক।[৫৫৮-০১]

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

শিশূর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধন করা এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা।

---

[৫৫৭] জাতীয় শিক্ষা কমিশন ২০০৩, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা নং- ৩০৯

[৫৫৮] জাতীয় শিক্ষা কমিশন (২০০৩), প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা- ০২

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার চিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণা যোগায় এবং আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়তা করে।

স্ব স্ব ধর্মের অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুকে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা।

শিশুর মনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগানো এবং তাকে শান্তিময় পরিবেশের প্রতি আগ্রহী করে তোলা।

শিশুর মনে মানবাধিকার, পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোহিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আর্ন্তজাতিকতাবোধ এবং বিশ্বশান্তি ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা।

জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি লাভে সহায়তা করা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।[৫৫৯]

শিক্ষার্থীর মধ্যে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, মিলেমিশে বাস করার মানসিকতা ইত্যাদি বঞ্চিত নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা।[৫৬০]

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হযেছে:

১. শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে, বাইরে যেতে বা পানি পান করতে অনুমতি নিতে পারা;
২. অনুমতি ছাড়া অন্যের জিনিসপত্র না দেওয়া
৩. অন্যের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিতে পারা
৪. অন্যদের অহেতুক বিরক্ত না করা।[৫৬১]

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে:
বুদ্ধিভিত্তিক নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করা।[৫৬২]

---

[৫৫৯] জাতীয় শিক্ষা কমিশন (২০০৩), প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা- ০৯
[৫৬০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১০
[৫৬১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২০
[৫৬২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ৪/শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ তারিখ ২৩-১২-১৪১৫ বঙ্গাঃ/০৬-০৪-২০০৯ খ্রিঃ দ্বারা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। দুই জন কো-অপট করা সদস্যসহ কমিটির চূড়ান্ত গঠন নিম্নরূপঃ

কমিটি

চেয়ারম্যান	**জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী**
কো-চেয়ারম্যান	ড. কাজী খলকুিজ্জমান আহমদ চেয়ানম্যান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
সদস্য সচিব	অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা।
সদস্য	অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশীদ উপাচার্য, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। অধ্যাপক মুহঃ জাফর ইকবাল বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক ড. জরিনা রহমান খান

লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর

মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ

সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, ঢাকা।

জনাব সিরাজ উদ্দীন আহমদ

অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত)

জনাব মোঃ আবু হাফিজ

অতিরিক্ত সচিব (অবসর প্রাপ্ত)

মাওলানা অধ্যাপক এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা ও সিলেট

বেগম নিহাদ কবির

ব্যারিষ্টার, সিনিয়র পার্টনার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এন্ড এসোসিয়েটস

অধ্যক্ষ এম. এ আউয়াল সিদ্দিকী

সভাপতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

অধ্যাপক শাহীন মাহবুবা কবীর

ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।[৫৬৩]

পর্যালোচনা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ সর্বমোট ২৮টি অধ্যায় রয়েছে। এ পুস্তিকায় প্রতিটি অধ্যায়ের উপর নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা করা হয়েছে। যার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ

অধ্যায়- ১. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত ৩০টি তাগিদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ভাল কথা থাকলেও কিছুটা অসামাজিক বিদ্যমান। যেমন-'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের' স্থলে 'অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ' 'মুক্তিবুদ্ধির চর্চা' এবং 'সহ-জীবন যাপনের' নীতি অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

---

৫৬৩ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে এবং মাদকতার ছোবল থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষার কথা বলা হলেও কর্মকৌশলে এর কোন বাস্তব দিকনির্দেশনা নেই।

৩. দেশের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত শিক্ষাধারা হচ্ছে-সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষা (ইংলিশ মিডিয়াম এবং কওমী মাদরাসা)। এ সব শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এক ও অভিন্ন নয়। কাজেই বিভিন্ন শিক্ষাধারার জন্য শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক এক ও অভিন্ন হওয়া অযৌক্তিক।

৪. বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলো সাংবিধানিকভাবে উপজাতি হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং তাদেরকে 'আদিবাসী' বলা অসাংবিধানিক।

৫. "সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তা চেতনা গড়ে তোলার" নীতি যৌক্তিক ও বাস্তবানুগ নয়। কারণ, মানুষের চিন্তা ও চেতনা তার ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এক্ষেত্রে বরং শিক্ষার্থীদেরকে স্ব-স্ব ধারার শিক্ষার ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে মৌলিক বিষয়ের সমমানের জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করাই যুক্তিসংগত।

৬. শুধু নিরক্ষতামুক্ত করার মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান নিহীত নয়, বরং অক্ষর জ্ঞানের সাথে সাথে নৈতিক মানসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

৭. মানুষ শুধু দেহ সর্বস্ব জীব নয় বরং দেহ ও আত্মার সমন্বিত শ্রেষ্ঠজীব। অথচ এ শিক্ষানীতিতে আত্মগঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন বাস্তব কর্মকৌশল অন্তর্ভুক্ত নেই।

অধ্যায়- ২. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

৮. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে কোমলমতি শিশুদেরকে নানা আচার-অনুষ্ঠান, নাচ-গান-কল্পকাহিনীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা একটি আস্তিক ও বিশ্বাসী জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না।

৯. প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্কুল-মাদরাসায় ধর্ম না পড়িয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি উপসানালয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত এর মাধ্যমে ধর্ম শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করা হয়েছে। আমরা মনে করি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যিক করার পাশাপাশি মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি উপসানলয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা

১০. প্রাথমিক স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হলেও তা কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে সম্পর্কে কর্মকৌশলে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। বরং প্রাথমিক স্তরেরর বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে যে কয়টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে 'ধর্মভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা' বলতে কোন বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১১. এবতেদায়ী মাদ্রারাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারায় সাধারণ ধারার মত এক ও অভিন্ন বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক করা হলে মাদারাসা ধারার স্বকীয়তা বজায় থাকবে না। আর কারিগরি শিক্ষা ধারার অনগ্রসর শিক্ষার্থীরাও অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

অধ্যায়- ৩. বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১৫. বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হলে এবং মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা বা অন্যান্য উপসানালয়ের মাধ্যমে তা আরও বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

অধ্যায়- ৪. মাধ্যমিক শিক্ষা

১৬. প্রাথমিক স্তরের ন্যায় মাধ্যমিক স্তরেও সকল ধারায় এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম চালু করার কথা বলা হয়েছে। এতে মাদরাসার ঐতিহ্য বিনষ্ট হবে। পরিণামে মাদরাসাগুলো স্কুলে পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

১৭. মাধ্যমিক স্তরে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে বাধ্যতামূলক হিসেবে যে বিষয়সমূহের কথা বলা হয়েছে, তাতে ধর্মীয় শিক্ষা রাখা হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে পুরো মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে থাকছে না। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি থাকবে কি থাকবে না এ বিষয়টি শিক্ষানীতিতে নিশ্চিত করা হয়নি। এর ফলে বর্তমানে স্কুলে কর্মরত হাজার হাজার ধর্মীয় শিক্ষক এবং কলেজ পর্যায়ের ইসলামী শিক্ষা (Islamic) বিষয়ের শিক্ষকগণ বেকার হওয়ার আশংকা রয়েছে।

১৮. ধনীক শ্রেণীর ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ইংলিশ মিডিয়ামভুক্ত ধারায় অধ্যয়ন করছে। কিন্তু এদেরকে দেশ ও জাতি গঠনে অনুরাগী এবং ধর্মীয় ভাবধারায় গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন কর্মকৌশল শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১৯. ক্যাডেট কলেজ ও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক বৈষম্য দূরীকরণের কোন বাস্তব কর্মকৌশল শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৫. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

২০. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে এক ও অভিন্ন কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা এ ধারার লক্ষ্য অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। কারণ, এ ধারার শিক্ষার্থীদের মেধা ও লক্ষ্য অর্জন সাধারণ ধারা থেকে ভিন্ন।

২১. এ ধারার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রম যথেষ্ট নয়। বরং দেশ-বিদেশের বাজার চাহিদার আলোকে পাঠ্যসূচি, পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং সে লক্ষ্যে শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা অপরিহার্য।

অধ্যায়- ৬. মাদরাসা শিক্ষা

২২. শিক্ষানীতিতে মাদরাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হলেও একে এক ও অভিন্ন শিক্ষা ধারার আওতাভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। স্বকীয়তা বিনষ্ট হতে পারে। তাই মাদরাসার জন্য আলাদা কারিকুলাম থাকরা প্রয়োজন।

২৩. সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসার জন্য অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক, অভিন্ন পরীক্ষা, অভিন্ন প্রশ্ন ও অভিন্ন মূল্যায়নব্যবস্থা চালু করা এবং তা সাধারণ শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পরিচালিত করা হলে মাদরাসা বোর্ড ও শিক্ষকদের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা চরমভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে।

২৪. মাদরাসার শিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো (কুরআন, হাদিস, ফিকহ্, আরবী ইত্যাদি) ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেয়ার ফলে শিক্ষার্থীগণ ইসলামী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার সুযোগ হারাবে। মাদরাসাগুলোতে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ, আরবী সাহিত্যসহ ইসলামী বিষয় ব্যাপকভাবে অধ্যয়নের সুযোগ * রাখা প্রয়োজন।

২৫. মাদ্রারাসার অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি ও শিক্ষার্থদের বৃত্তি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সাধারণ শিক্ষার ন্যায় সমানভাবে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তিসহ চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। এ শিক্ষানীতিতে এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

২৬. ফাযিল ও কামিল স্তরকে অন্যাস ও মাস্টার্স করার প্রস্তাব থাকলেও কৌশলে অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যা লক্ষ্য অর্জনকে চরমভাবে ব্যাহত করবে। প্রস্তাবিত অ্যাফিলিয়েটিং 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা দ্রুত সম্পন্ন করে এর সকল দায়-দায়িত্ব সেখানে ন্যস্ত করতে হবে।

২৭. মাদরাসা শিক্ষার্থীদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা কওমী মাদরাসার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কওমী মাদরাসার ব্যাপারে স্বতন্ত্র 'কমিশন' গঠনের কথা বলা হলেও কর্মকৌশল এর কোন দিক নির্দেশনা নেই। কওমী মাদরাসার শিক্ষকের বেতন-ভাতা, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের কোন সুযোগ-সুবিধার কথা এ শিক্ষানীতিতে কিছুই বলা হয়নি।

অধ্যায়- ৭. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

২৮. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শীর্ষক ৭নং অধ্যায়টি শিক্ষানীতিতে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু এই ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য, কত নম্বরের ও কিভাবে পাঠ দান করা হবে সে সম্পর্কে এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মকৌশলে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

২৯. ধর্মের সংজ্ঞা ও নৈতিকতার পরিচয়ে যে সব কথা বলা হয়েছে ইসলামের ক্ষেত্রে তা অপূর্ণাঙ্গ। অতএব, ধর্ম ও নৈতিকতাকে ভিন্ন অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার সকল স্তর ও ধারায় বাধ্যতামূলকভাবে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অধ্যায়- ৮. উচ্চশিক্ষা

৩০. উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতদের জাতীয় নেতৃত্ব দানের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিকমান সম্পন্ন হয়ে গড়ে উঠার ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি।

৩১. অবাধ বুদ্ধি চর্চা, অসাম্প্রদায়িক হওয়া, বিজ্ঞান মনস্ক হওয়া ও প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক শিক্ষার্থী হওয়ার প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক চেতনা হ্রাস পাবে বলে আশংকা রয়েছে।

৩৪. সমমানের শিক্ষা হলেও এ শিক্ষানীতিতে ফাযিল-কামিলকে উচ্চশিক্ষা স্তরে উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া দাখিল ও আলিম উত্তীর্ণদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ব্যাপারেও কোন কথা বলা হয়নি। যা সুস্পষ্টভাবে শিক্ষানীতিতে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

৩৫. উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি।

অধ্যায়- ৯. প্রকৌশল শিক্ষা

৩৬. তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৌশল শিক্ষায় প্রকৌশলীগণ যাতে ধর্ম ওনতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশবান্ধব কাজ করতে পারেন- এ বিষয়ে কোন কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ১০. চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

৩৯. চিকিৎসা সেবাকে বর্তমানে এক ধরনের সুযোগ সন্ধানী চিকিৎসকগণ যেভাবে চড়ামূল্যের ব্যবসায়ে পরিণত করেছেন তার কবল থেকে এ খাতকে বাঁচানোর জন্য কোন নীতি বা কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়নি। চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষায় ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ছাড়া এর থেকে উদ্ধারের কোন বিকল্প পথ নেই।

অধ্যায়- ১১. বিজ্ঞান শিক্ষা

৪১. শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার অধিকারের কথা যেভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, তাঁতে শিক্ষার্থীদেরকে ধর্মীয় বিশ্বাসমুক্ত করার দিকে ঠেলে দেয়া হবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। মুক্তবুদ্ধির চর্চার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয় বরং এর অর্থ হতে পারে উন্মুক্ত মন নিয়ে সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস চালানো। এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনে প্রচেষ্টা থাকা।

অধ্যায়- ১২. তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা

৪২. বর্তমান শতাব্দীতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বটে। তবে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠ ও মানব কল্যাণমুখী ব্যবহারে সঠিক মান রক্ষা করতে পারছেনা। সে ব্যাপারে শিক্ষানীতিতে কোন দিক নির্দেশনা নেই। অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির দুয়ার খুলে দেয়ার মাধ্যমে জাতিকে অপসংস্কৃতির মোহাচ্ছন্ন থেকে রক্ষা করার কোন বাস্তব কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে ইন্টারনেট, ফেসবুক ও BOP ব্যবসায় এবং মোবাইল ব্যবহারের নেতিবাচক ও ক্ষতিকারক দিক থেকে জাতিকে কিভাবে সুরক্ষা করা যেতে পারে সে বিষয়েও শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বেড়ে উঠার দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন ছিলো।

অধ্যায়- ১৩. ব্যবসায় শিক্ষা

৪৩. মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব বাংলাদেশেও বিদ্যমান। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। তবে কিভাবে এ মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হবে তার কোন কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়নি।

৪৪. বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসার পাচ্ছে। কিন্তু এ শিক্ষা ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিকতার মূল্যবোধ বিবর্জিত হওয়ায় মানবজীবনের ক্ষতি করে ও অবাধ প্রতিযোগীতার মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে ব্যবসায়ীগণ অনুরূপ কুণ্ঠাবোধ করছেন না। ব্যবসায়শিক্ষার পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক মূল্যবোধ অন্ত র্ভুক্ত করা ব্যতীত এহেন দূরাবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোন বিকল্প নেই।

অধ্যায়- ১৪. কৃষি শিক্ষা

৪৫. বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। ব্যাপক জনসংখ্যার তুলনায় কৃষিজ ভূমির পরিমাণ অত্যল্প। এ অবস্থায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও কৃষি শিল্প সম্প্রসারণের নিমিত্ত, কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন কর্মকৌশল শিক্ষানীতিতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

৪৬. কৃষি শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, কৃষকের স্বার্থরক্ষাসহ সার্বিক বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষি শিক্ষায় ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক শিক্ষা অর্ন্তভুক্ত করা অপরিহার্য।

অধ্যায়- ১৫. আইন শিক্ষা

৪৭. আইন শিক্ষার বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার পাঠ্যক্রমে বেশ কয়েকটি অতিরিক্ত বিষয় যোগ করার কথা বলা হলেও ইসলামী আইন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কোন কিছুই বলা হয়নি। এর ফলে ইসলামী আইনের বিশাল ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত থেকে যাবেন।

৪৮. পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও শিক্ষাক্রমে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন কর্মকৌশল অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি।

অধ্যায়- ১৬. নারী শিক্ষা

৪৯. শিক্ষানীতিতে "নারী শিক্ষাকে শুধু পরিবারের মঙ্গল, শিশু যত্ন ও ঘরকন্যার কাজে সীমাবদ্ধ রেখে জাতীয় উন্নয়নে নারীকে নিষ্ক্রিয় রাখার বিরাজমান প্রবণতা দূর করা হবে" মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন বাক্য সংযোজনের মাধ্যমে নারী সমাজের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। এতে মানব সভ্যতার আদি বুনিয়াদ পরিশীলিত পরিবার প্রথাকে অবজ্ঞা করে তা ভেঙ্গে দেয়ার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ধ্যানধারণার অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির নীলনক্শা আঁকা হয়েছে।

৫০. নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে-তা নারী ও মাবনতার জন্য শোভনীয় নয়। ইসলাম নারী ও পুরুষকে মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদা প্রদান করেছে। কিন্তু নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক ও কর্মক্ষেত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান আছে বিধায় তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। এহেন কারণবশত ইসলাম নারী ও পুরুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে। বরং কতক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে বেশি অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ করে থাকে। এমতবস্থায় নারী ও পুরুষের ন্যায্য অধিকারের পরিবর্তে সকলক্ষেত্রে সমান অধিকারের কথা বলে শিক্ষানীতিতে ইসলাম প্রদত্ত নারী পুরুষের অধিকারের বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

৫১. 'জেন্ডার স্টাডিজ', 'প্রজনন স্বাস্থ্য' বিষয়ক শিক্ষা সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর হওয়ায় উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে অবাধে বিষয়টি চালু করলে লজ্জাহীনতা ও শালীনতাবোধের অবনতি ঘটতে পারে।

৫২. "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত"-বলে মা বা নারী জাতিকে যে মর্যাদা ও অধিকার ইসলাম দিয়েছে-এ শিক্ষানীতিতে মায়ের মর্যাদা দানের ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

অধ্যায়- ১৭. কারুকলা ও সকুমারবৃত্তি শিক্ষা

৫৩. একটি সংস্কৃতিবান, সুরুচি সম্পন্ন ঐতিহ্য সচেতন সুশৃঙ্খল জাতি ও নাগরিক গোষ্ঠী সৃষ্টির জন্য কারুকলা ও সুকুমারবৃত্তি অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য, অঙ্গবিক্ষেপ, ভাস্কর্য, যাত্রা সিনেমার কথা বলা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে যুব সমাজের অবক্ষয় ও মাদকের ভয়াবহ বিস্তার রোধের কথা বলা হয়েছে। এটা আসলে অযৌক্তিক ও অসুস্থ কল্পনা বিলাস এবং ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সংস্কৃতির পরিপন্থী।

অধ্যায়- ১৮. বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল-গাইড এবং ব্রতচারী

৫৪. এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কৌশলে কিছু ইতিবাচক প্রস্তাব উল্লেখ থাকলেও শিশু-কিশোরদের সৎ, চরিত্রবান, কর্মোদ্যোগী, সেবা পরায়ণ, সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলার জন্য ধর্মীয় সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার কথা নেই। তাছাড়া সর্বজন স্বীকৃত স্কাউটিং, গার্ল-গাইডিং এবং বিএনসিসি কার্যক্রমের সমান্তরালে হিন্দু ধর্মের কিছু অনুসারীদের আঞ্চলিক ও দুর্বোধ্য ব্রতচারী শিক্ষা চালুর প্রস্তাব অস্বাভাবিক।

অধ্যায়- ১৯. ক্রীড়া শিক্ষা

৫৫. সুস্থ্য, সবল, সাহসী কর্মক্ষম প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য ক্রীড়া শিক্ষার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের আলাদা ক্রীড়া ও শিক্ষা প্রোগ্রাম এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদ তৈরির উপযুক্ত ব্যবস্থার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৫৬. প্রতিরক্ষা ও সামরিক শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষানীতিতে কোন বক্তব্য নেই। ক্রীড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার মত সাহসী প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

৫৭. দেশের কারাগারগুলোতে যেসব কয়েদী রয়েছে তাদেরকে সংশোধনের জন্য ধর্মীয় অনুশাসনভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন দিক-নির্দেশনা শিক্ষানীতিতে নেই, যা থাকা খুবই জরুরি।

৫৮. দেশে শিশু-কিশোর অপরাধীদের জন্য শিশু-কিশোর সংশোধনাগার রয়েছে। অনুরূপভাবে দেশে ব্যাপকহারে মাদকাসক্তদের জন্য নিরাময় কেন্দ্রও রয়েছে। কিন্তু তাদেরকে ধর্মীয় অনুশাসন শিখিয়ে নৈতিকমান উন্নত করার কোন দিক-নির্দেশনা শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৬০. বিদেশী সাহায্যপুষ্ট অনেক এনজিও শিশু শিক্ষার নামে এদেশে তারা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোমলমতি শিশুদেরকে কি শেখাচ্ছে সে সম্পর্কে অনেকেরই পুরোপুরি ধারণা নেই। বিদেশী এনজিওদের শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত থাকা কি উচিত কি উচিত নয়, সে সম্পর্কে শিক্ষানীতিতে কিছুই বলা হয়নি। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রের সচেতনতা অপরিহার্য।

অধ্যায়- ২০. গ্রন্থাগার

৬১. গ্রন্থাগার বিষয়ক উদ্দেশ্য-লক্ষ্যে সুন্দর কথা ফুটে উঠেছে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ সাধন মুসলিম সমাজ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কৌশলে বর্ণিত ক্ষেত্র ছাড়াও প্রওতিটি গৃহ, গ্রাম, মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য উপসানালয়কে গ্রন্থাগার বা পাঠশালা প্রতিষ্ঠার আওতায় আনা যেতে পারে।

৬২. মুক্তিযুদ্ধের দলিলসহ দেশের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্বলিত দলিল পত্রাদি পাঠাগারে থাকতে হবে। তাছাড়া কোরআন-হাদিস, ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত এবং আন্তঃধর্ম অধ্যয়নের উপযোগী বই-পুস্তক থাকার বিষয় থাকলে ভাল হয়।

অধ্যায়- ২১. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

৬৩. বিভিন্ন ধারায় পরীক্ষা হবে- মূল্যায়ন হবে- এটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ৫ম শ্রেণী, ৮ম শ্রেণী, ১০ম শ্রেণী ও দ্বাদশ শ্রেণীতে সীমিত সময়ে শিক্ষকদেরকে অনেক পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে ও জবাবদিহির সাথে পালনের জন্য প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের সাথে সাথে ধর্মভিত্তিক নৈতিক প্রশিক্ষণ দরকার। এ শিক্ষানীতিতে সে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি।

অধ্যায়- ২২. শিক্ষার্থী কল্যাণ ও নির্দেশনা

৬৪. শিক্ষার্থী কল্যাণ ও নির্দেশনা বিষয়ের উদ্দেশ্য ও কৌশলে ভাল কথা বলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ঋণের প্রস্তাব না করে শিক্ষাবৃত্তির কথা অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার ছিল।

৬৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য পৃথক ব্যায়ামাগার তৈরির প্রস্তাব করা হলেও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্ত জুরে দিয়ে একটি অকাট্য বিষয়কে অস্পষ্ট করা সমীচীন হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬. শিক্ষার্থীদের জন্য একজন পরামর্শক নিয়োগের বিধান রাখার যৌক্তিকতা বোধগম্য নয়। এ কাজ প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকগণ করে থাকেন। নতুন করে এই পদ সৃষ্টি করলে প্রধান শিক্ষকের দয়িত্ব ও অধিকার খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া রাজনীতিকরণের বিষয়টি তো থেকেই যাচ্ছে।

অধ্যায়- ২৩. শিক্ষার্থী ভর্তি

৬৭. লেখা-পড়া করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে-এটাই স্বাভাবিক। প্রথম শ্রেণীসহ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ভর্তির জন্য কোচিং-এর যে ছড়াছড়ি তা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা এতে নেই।

৬৮. অতিমাত্রায় ভাল ফলাফল নিয়েও উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়া যায় না। পাশের মান ও সংখ্যার অনুপাতে উচ্চশিক্ষার আসন ও প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ বাড়ানোর কোন কথা এতে নেই।

৬৯. ভর্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার এবং ভর্তিকৃত ছাত্ররা মেধার সর্বোচ্চ স্বাক্ষর রাখা সত্ত্বেও মাদরাসা ছাত্রদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তি বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেয়ার পক্ষে একটি কথাও বলা হয়নি।

অধ্যায়- ২৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণ

৭০. শিক্ষক-প্রশিক্ষণ উপযুক্ত শিক্ষার্থী গঠনের উপায় সকল ধারায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা বলা হলেও মাদরাসা শিক্ষকদের ব্যাপারে এতে যা বলা হয়েছে তা অপ্রতুল।

৭১. শিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও কৌশলে ৩১টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হলেও শিক্ষক প্রশিক্ষণে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মুল্যবোধের অনুপস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জনে ফলদায়ক হচ্ছে না।

অধ্যায়- ২৫. শিক্ষকের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব

৭২. শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষায় পদোন্নতি বিষয়ে অনেক ভাল কথা বলা হয়েছে। তবে শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের যে দাবি অপরাপর ক্ষেত্রের চেয়ে সর্বোচ্চ স্বতন্ত্র বেতন স্কেল প্রদান সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

৭৩. পদোন্নতির জন্য পেশাগত দক্ষতা ও বয়সকে গুরুত্ব দেয়া হলেও শিক্ষকের নৈতিকমান সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। শিক্ষক নিয়োগে দলীয় বিবেচনা যেন না হয়, সে বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের ন্যায় উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদেরও কর্মঘন্টা থাকা দরকার, এ শিক্ষানীতিতে তা প্রকাশ পায়নি।

অধ্যায়- ২৬. শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক

৭৪. এ অংশে পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচি ধর্মীয় বিশ্বাস, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর গড়ে উঠা বাঞ্ছনীয় বলা হয়েছে। এটা ভাল। কিন্তু এক ও অভিন্ন পাঠ্যক্রম মাদরাসাসহ সকল ধারায় চালুর ঘোষণায় বাংলা, ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ স্টাডিজসহ মৌলিক বিষয়গুলোতে ইসলামী ভাবধারা জানা থেকে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে। কারণ এসব অভিন্ন পাঠ্যক্রমে ইসলামী ভাবধারা থাকার কোনই নিশ্চয়তা নেই। অনুরূপভাবে কারিগরি শিক্ষার্থীদের জন্য এ পাঠ্যক্রম অনেকটা কঠিনতর হতে পারে।

৭৫. খসড়া শিক্ষানীতি ২০০৯ এ পাঠ্যক্রমের সূচিপত্র সংযোজনী আকারে সন্নিবেশিত ছিল, যা ২০১০-এর শিক্ষানীতিতে অনুপস্থিত। এতে করে শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় ও স্তরে আদৌ ধর্মীয় বিষয় থাকবে কি-না? তা নিয়ে জাতি অন্ধকারে আছে।

৭৬. অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি মাদরাসাকে সেক্যুলার করার লক্ষ্যেই কাজ করবে। পরিণামে মাদরাসাগুলো স্কুলে পরিণত হবে।

৭৭. ধনাঢ্য ও সমাজের প্রভাবশালী পরিবারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ইংলিশ মিডিয়ামে অধ্যয়ন করছে। তাদের স্বীয় মাতৃভাষা, ধর্ম, দেশ ও জাতি গঠনমূলক কর্মে দীক্ষাদানের মত কোন সুস্পষ্ট কর্মকৌশল এ শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

অধ্যায়- ২৭. শিক্ষা প্রশাসন

৭৮. শিক্ষা প্রশাসনের জন্য 'স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠনের কথা বলা হয়েছে। তবে তা কাদেরকে দিয়ে গঠন করা হবে-এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের' ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। কোন ক্রমেই তা যেন জাতীয় স্বার্থ বিবেচনার পরিপন্থি না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৭৯. সরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় ন্যায় বেসরকারি এমপিওভুক্ত এবং এমপিও বর্হিভূত স্কুল-কলেজ, মাদরাসার শিক্ষকদের চাকুরিতে বদলীনীতির প্রয়োগ সঠিক হবে না। বরং এ নীতির প্রয়োগ হলে মানসম্পন্ন শিক্ষার ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে।

৮০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ অনার্স-মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এমপিওভুক্ত হবেন কি-না সে সম্পর্কে শিক্ষানীতিতে কিছুই বলা হয়নি।

৮১. বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, এমপিওভুক্তকরণ এবং এমপিও অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষার্থীর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এমপিও অব্যাহত রাখা ও বিষয় স্বীকৃতি নবায়নের জন্য শিক্ষার্থীর একটি নির্দিষ্ট হার থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়ে থাকে। আমরা মনে করি এ নীতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা, সবসময় সকল বিষয়ের গুরুত্ব একরকম থাকে না। তাছাড়া বিষয় নির্বাচনে গুচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা থাকায় সকল শিক্ষার্থী পছন্দ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে পারে না। আর এ কারণেই অনেক বিষয়ের শিক্ষার্থী কম হয়ে থাকে। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের এমপিওভুক্ত হওয়া এবং অব্যাহত থাকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বস্তুত কোন একটি বিষয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা যাই হোক না কেন, তা বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের এমপিও প্রদান ও তা অব্যাহত রাখা এবং বিষয়ের নবায়ন ও স্বীকৃতি অব্যাহত রাখা উচিত। অথচ এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্ট কোন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি।

৮২. মাদরাসায় ফাযিল অনার্স, কামিল,্াতকোত্তর কোর্স চালু করা হলে সেই কোর্সের জন্য নতুনভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এমপিওভুক্ত হবেন কি-না সে ব্যাপারেও এ শিক্ষানীতিতে কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা না থাকা একান্ত অপরিহার্য।

৮৩. মাদরাসার শিক্ষার্থীরা যাতে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে থেকেই এমফিল এবং পিএইচডি করার সুযোগ পায় সে সম্পর্কে শিক্ষা প্রশাসনের পরিকল্পনায় দিক-নির্দেশনা থাকা উচিত।

অধ্যায়- ২৮. শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে বিশেষ কয়েকটি পদক্ষেপ

৮৪. এ অধ্যায়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে-যা যৌক্তিক। তবে দীর্ঘদিনের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে নিবন্ধন বিড়ম্বনার শিকার না হয় সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকা একান্ত জরুরী।

ষষ্ঠ অধ্যায়
মতামত জরিপ ও ফলাফল

শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি

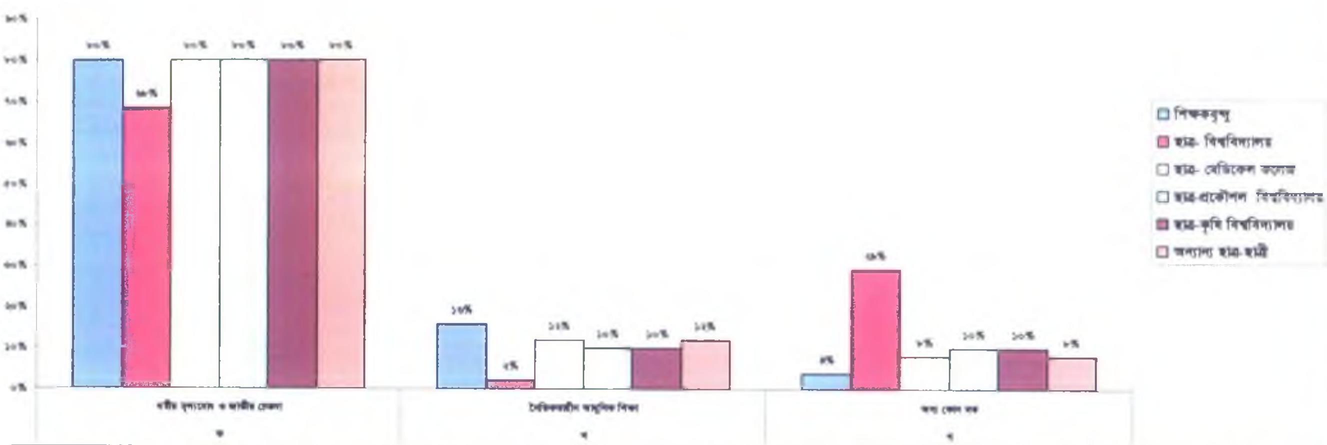

বাংলাদেশের উপযোগী একটি কার্যকর শিক্ষাপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত এবং এর নানাদিকের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। জরিপে অংশগ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র শিক্ষক, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক। তাদের কাছ থেকে লিখিত মতামত নেওয়া হয়। তাদের কাছে প্রথম প্রশ্ন ছিল আমাদের শিক্ষার আদর্শীক ভিত্তি কী হওয়া উচিত?

এই জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ উত্তরদাতাই ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনাকে শিক্ষার আদর্শীক ভিত্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন। যেখানে সর্বনিম্ন ৬৮ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এর পক্ষে রায় দিয়েছে। খুব নগণ্য সংখ্যক উত্তরদাতা নৈতিকতাহীন আধুনিক শিক্ষা বা অন্য কোন মতকে শিক্ষার আদর্শিক ভিত্তি হিসেবে দেখতে চান। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ২৯% বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অন্য কোন মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

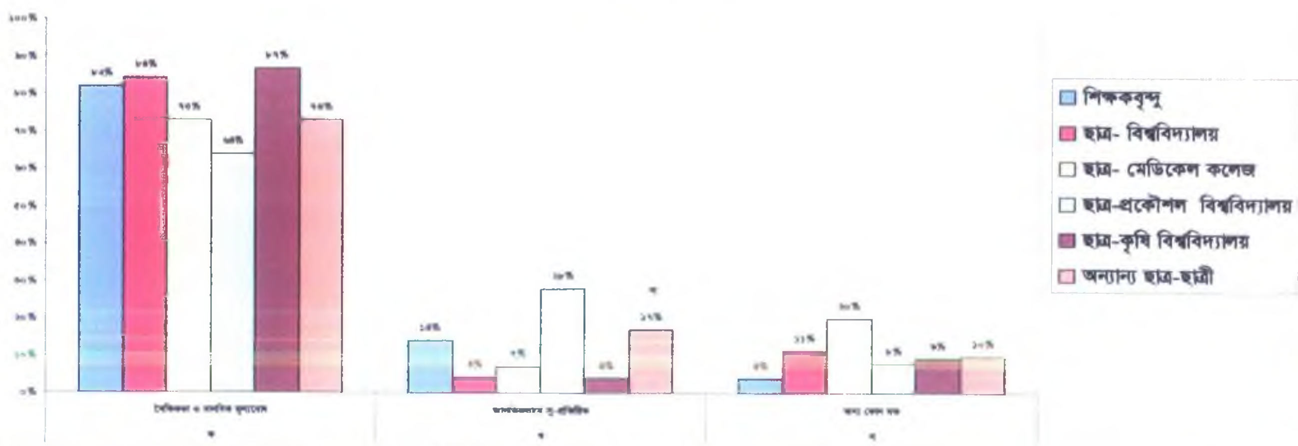

মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত?

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ সবচেয়ে বেশিসংখ্যক উত্তরদাতার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮৭% ছাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বনিম্ন ৬৪% ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর কাছে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রাধান্য পেয়েছে। সবেচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (২৮%) জাগতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়কে এবং সর্বোচ্চ ২০% ছাত্র মেডিকেল কলেজ অন্য কোনো মতকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা সমৃদ্ধ জাতি গঠনে ধর্মীয় শিক্ষা

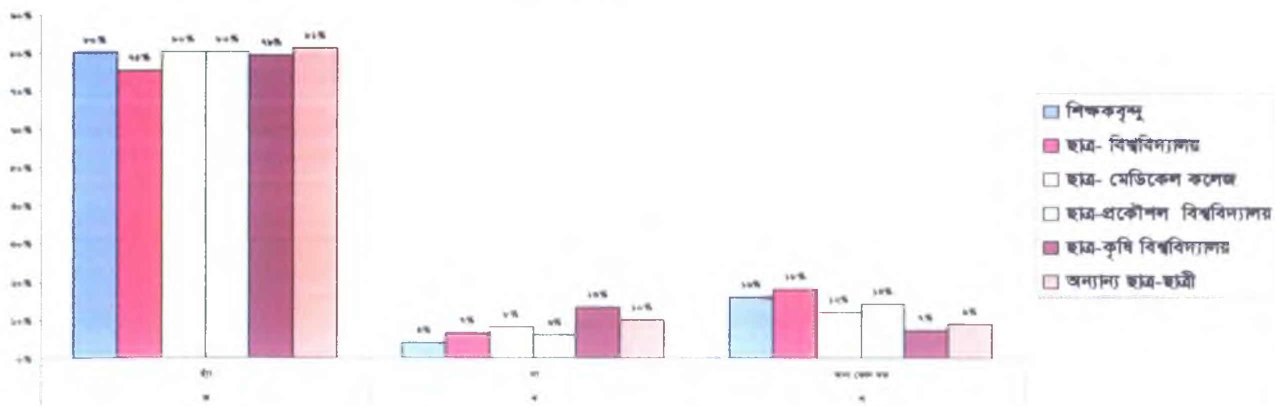

নৈতিকতা সমৃদ্ধ জাতি গঠনে ধর্মীয় শিক্ষার ভূমিকা কেমন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকল শ্রেণীর উত্তরদাতাদের মধ্যে গড়ে প্রায় ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা নৈতিকতা সমৃদ্ধ জাতি গঠনে শিক্ষার সকল স্তরে ধর্ম বা নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। কিন্তু গড়ে প্রায় ৮ শতাংশ উত্তরদাতা এর বিপক্ষে রায় দিয়েছেন এবং গড়ে প্রায় ১৩ শতাংশ অন্য কোনো মতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষানীতি

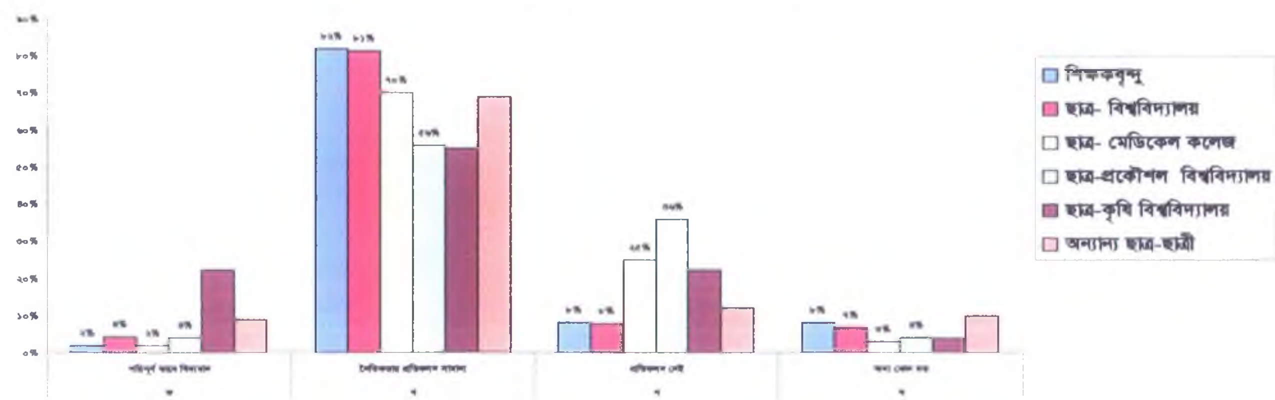

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিফলন কেমন আছে এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতা বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিফলন সামান্য। যার মধ্যে রয়েছেন সর্বোচ্চ ৮২% শিক্ষকবৃন্দ এবং সর্বনিম্ন ৫৫% ছাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যদিকে নগন্য সংখ্যক উত্তরদাতা ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিফলন পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান বা অন্য মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, গড়ে ১৯ শতাংশ উত্তরদাতা এর প্রতিফলন নেই বলে মনে করেন যার মধ্যে অধিকাংশই কারিগর শিক্ষার ছাত্রছাত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা বিজ্ঞান,কৃষি ও প্রকৌশল শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনিয়তা

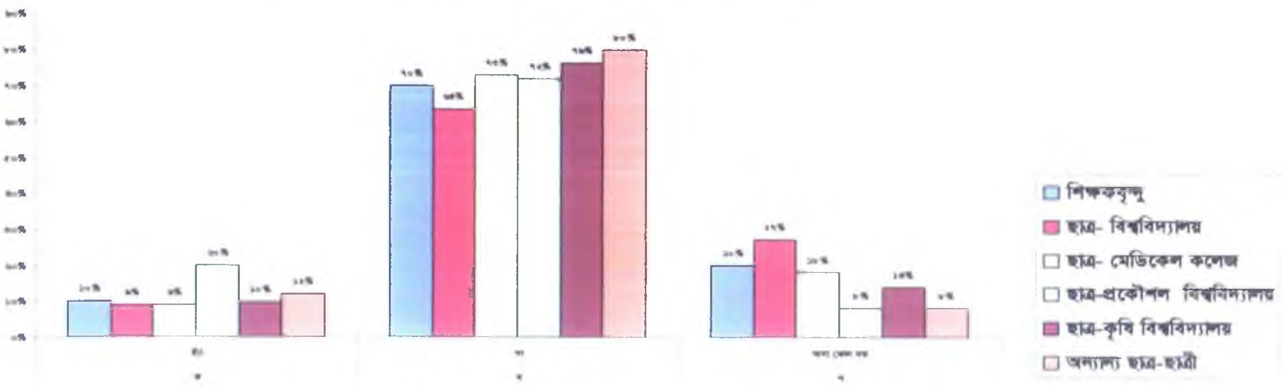

শিক্ষার সকল স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অবস্থান কেমন হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশের মতে চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি ও প্রকৌশল শিক্ষায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকা উচিত, যার মধ্যে মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের ৭০% প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ৭২% এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের ৭৬% রয়েছেন। ২৭% বাধ্যতামূলক ভাবে নয়, বরং ঐচ্ছিকভাবে থাকার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত শিক্ষা ব্যবস্থাই পারে সমাজ ও জাতীকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে

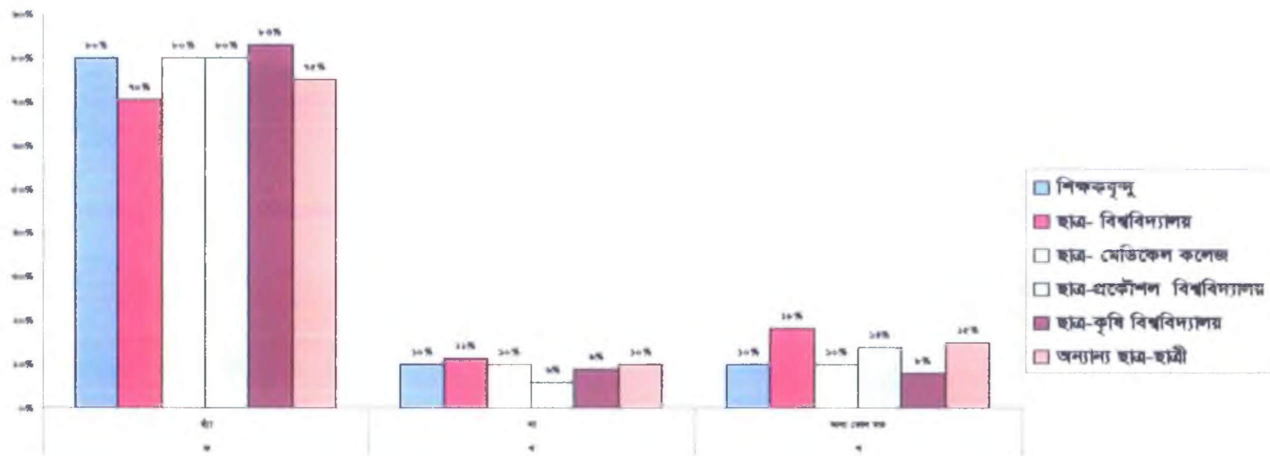

আমরা কেমন শিক্ষানীতি চাই? এ ব্যাপারে মতামত দিয়ে গিয়ে তারা বলেন, ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত শিক্ষাব্যবস্থাই পারে সমাজ ও জাতিকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে। গড়ে প্রায় ৭৮ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত শিক্ষাব্যবস্থাই পারে সমাজ ও জাতিকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে। এর বিপরীতে গড়ে মাত্র ১০ শতাংশ জনমত ধর্মীয় শিক্ষাকে এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন এবং গড়ে প্রায় ১২ শতাংশ জনমত ভিন্ন কোনো মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এখানে লক্ষ্যণীয়, ইতিপূর্বেও অধিকাংশ উত্তরদাতা সকল শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে ধর্ম ও নৈতিকতাকেই দুর্নীতি দূর করার প্রধান পথ বলে মনে করেন।

উচ্চ শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থান

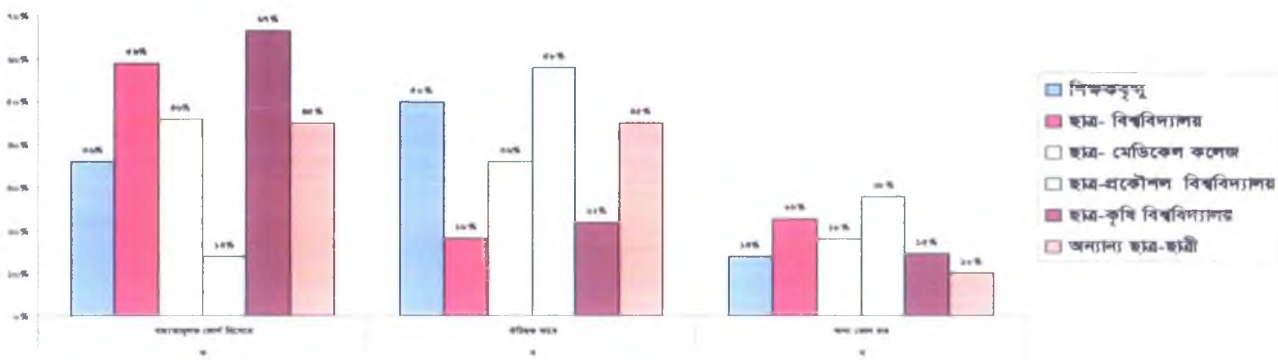

উচ্চশিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থান সংক্রান্ত মতামত জরিপে শ্রেণীভেদে উত্তরদাতাদের স্পষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬৭ শতাংশ ছাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সর্বনিম্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ১৮ শতাংশ ধর্মীয় শিক্ষাকে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকবৃন্দ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা ঐচ্ছিকভাবে দেখতে চান, যাদের পরিমাণ শ্রেণীভেদে যথাক্রমে ৫০%, ৫৮% এবং ৪৫%। আবার গড়ে প্রায় ১৮% জনমত ভিন্ন কোনো মতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, অধিকাংশ উত্তরদাতা বাধ্যতামূলক অথবা ঐচ্ছিক হিসেবে ধর্মীয় বা নৈতিক শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার অংশ হওয়া উচিত বলে মনে করেন।

বাংলাদেশে প্রকৃত মানবিক আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ উপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ন করা দরকার

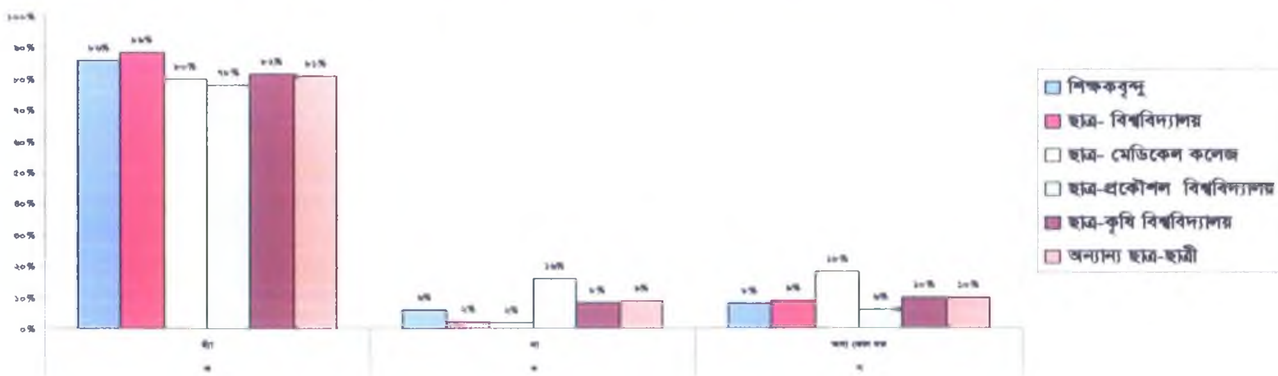

শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্ট কি হওয়া উচিত? তার উত্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের প্রকৃত মানবিক আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ উপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ন করা দরকার। সকল প্রকার ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে গড়ে প্রায় ৮৩ শতাংশ মনে করেন যে, বাংলাদেশে প্রকৃত মানবিক আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধ উপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা দরকার। অপরদিকে গড়ে প্রায় ৬% উত্তরদাতা এর বিরোধিতা করেছেন এবং গড়ে প্রায় ১১ শতাংশ অন্য কোন মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

যুগোপযোগী,উন্নয়নমুখী,সমাজ চাহিদা ও জাতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা

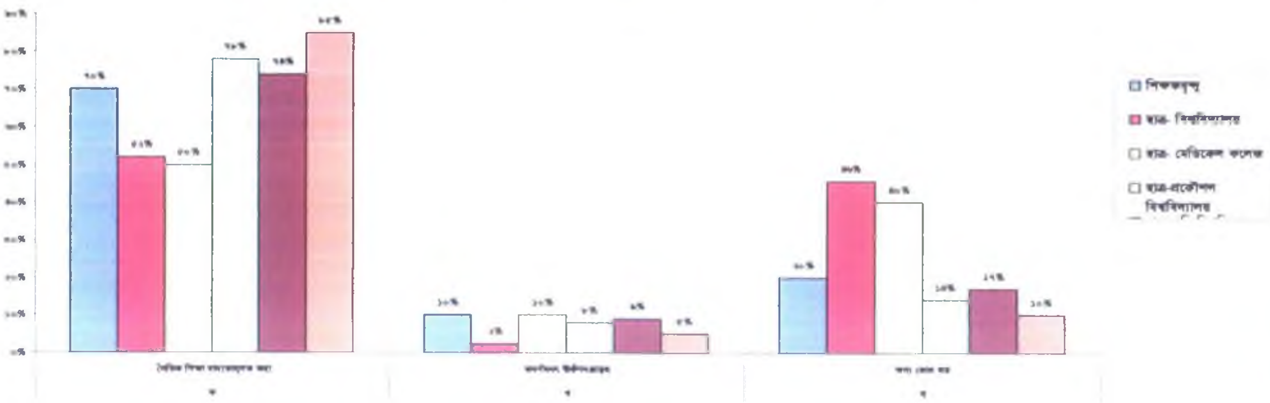

যুগোপযোগী, উন্নয়নমুখী, সমাজ চাহিদা ও জাতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হলে ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থান কেমন হওয়া উচিত? এ ব্যাপারে মতামত পেশ করতে গিয়ে তারা বলেন, যুগোপযোগী, উন্নয়নমুখী, সমাজ চাহিদা ও জাতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হলে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্ম তথা নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন বেশিরভাগ উত্তরদাতা (যার পরিমাণ গড়ে প্রায় ৬৮%)। এর বিপরীতে গড়ে প্রায় ৭% উত্তরদাতা সেকুলার শিক্ষা এবং প্রায় ২৩% উত্তরদাতা অন্য কোনো মতের প্রতি রায় দিয়েছেন।

শিক্ষা নীতি কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়,মেডিকেল কলেজ এর ছাত্র-শিক্ষক ও বিশিষ্ট জনদের লিখিত মতামত:

একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের সাথে বহুমুখী, যুগোপযোগী ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত চালু করা প্রয়োজন।[৫৬৪]

ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকলে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। তাই নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।[৫৬৫]

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা বিষয়গুলি আলোচনা করা। মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও কাউমি মাদ্রাসার আধুনিক প্রয়োগ ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োগ।[৫৬৬]

শিক্ষাকে ধর্মীয় আলোকে গবেষণা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরী।[৫৬৭]

মাদ্রাসা শিক্ষা যেন নৈতিকতা বিসর্জনকারী উগ্রবাদের জন্ম না দেয় সেদিকে খেয়াল রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগপযোগী করতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হবে। ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠানে ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।[৫৬৮]

---

[৫৬৪] খান মুহাঃ নুরুদ্দীন ফয়সল। ২০৮, শেরেবাংলা হল, এম.এস. জুলাই-ডিসেঃ ০৭ইং, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।
[৫৬৫] আশিকুল ইমরান। ১১৫, এস.ডি.হল, লেভেল-৪, কৃষি, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।
[৫৬৬] মাহবুব। L-4, S-II, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৬৭] নাঈম। স্নাতক শেষ বর্ষ কৃষি, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৬৮] মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম। ১৩৫, এস-ডি-ল, বি.এস.সি (এজি) অনার্স, কৃষি, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।

Dhaka University Institutional Repository

একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা অতীব জরুরী। তবে মনে রাখতে হবে নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ বাদ দিয়ে নয়, বাধ্যতামূলক করে।[৫৬৯]

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমকুখী করতে হলে জীবন মাত্রার মান পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কখনই সম্ভব নয়।[৫৭০]

শিক্ষানীতি এমন হতে যা তে বর্হিবিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে দেশকে সামনে নিয়ে যাবার জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ, আধুনিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব এমন হওয়া উচিত।[৫৭১]

শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যেন, উচ্চ শিক্ষার সাথে সাথে নৈতিক ও মূল্যবোধ সহকারে দেশ ও জাতির কল্যাণে অবদান রাখতে পারে।[৫৭২]

একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত যেমন- কলেজ পর্যায়ে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা হলে পূর্বক কারিগরি ও কর্মমূখী শিক্ষাকে যুগপযোগী ও আরও উৎসাহিত করা উচিৎ বলে মনে করি।[৫৭৩]

কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা সকল স্তরে চালু করা দরকার। সরকারকে এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিয়ে কাজ করানো দরকার।[৫৭৪]

আমার দৃষ্টি কোণ থেকে একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা আবশ্যই দরকার। দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের শিখরে পৌছানোর সাথে সাথে উন্নত বিশ্বে পরিণত করার প্রয়োজন।[৫৭৫]

বাংলাদেশকে একটি আদর্শ ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে নৈতিকতাও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।[৫৭৬]

বাস্তব বিজ্ঞানসম্মত কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং উচ্চ পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক করা উচিৎ। প্রাথমিক পর্যায় থেকে নৈতিক শিক্ষার জীবন বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকর।[৫৭৭]

দেশ প্রেম সর্বপ্রথম থাকতে হবে-প্রণেতার এবং যারা বাস্তবায়ন করবে। নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ফুটোকরা সদৃশ। যতই জ্ঞান আহোরণ করুক না কেন তার দ্বারা মানবকল্যাণ তথা দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আলাদা করা কখনোই উচিৎ নয়।[৫৭৮]

ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষতাকে ভাগ করা হবে, এক্ষেত্রে একমুখী হগচ্ছে একত্রিকরণ। এটা বেশী কার্যকরী আবার জাতীয় মূল্যবোধে অভাবে মেধাপাচার থেকে দেশকে রক্ষা করবে।[৫৭৯]

ধর্মীয় এবং জাতীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে যদি একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যায় তাহলে ভাল।[৫৮০]

---

[৫৬৯] মোঃ কামরুজ্জামান। ১৩৬, সিরাজ উদ-দৌলা হল, বি.এসসি, কৃষি (অনার্স), বিজ্ঞান, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭০] মোছাঃ নুর জাহান খাতুন। L-4, S-II, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭১] মোঃ মাজিটুল আলম। ৩১৭, এস.বি.এইচ, L-4, S-II, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭২] শাহাবুদ্দিন আহমেদ। ২০৮, শেরেবাংলা বাংলা হল, L-4, S-II, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭৩] সেলিম। ৩৩৫, শেরেবাংলা বাংলা হল, L-4, S-II, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭৪] মোঃ মনজুর আলী। ২০৮, শেরে বাংলা হল, এম.এস. ইনটোমোলজি, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭৫] কে.এম. শাহাবুদ্দিন আহমেদ। ২০৯ শেরে বাংলা হল, L-4, S-II, কৃষি, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭৬] ফয়সাল আহমেদ। শেরে বাংলা হল, রুম নং- ২১০, L-4, S-II, কৃষি, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭৭] মোহাম্মদ ইউসুফ। ২০৮, এস.বি হল, এম.এস, মাটিবিজ্ঞান, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭৮] শামীম আহমেদ। শেরেবাংলা হল, রুম নং- ২০৮, L-4, S-II, শেরেবাংলা কৃষি বিদ্যালয় কলেজ।
[৫৭৯] মোঃ সরোয়ার জামান। এম.এস, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৮০] মোঃ বিল্লুর রহমান। এম.এ, ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় ও জাতীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা।[৫৮১]

কোরআন ও হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাস গবেষণা করে ধর্মীয় ভিত্তির উপর নির্ভরশীল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আবশ্যক।[৫৮২]

যদি ও রাতারাতি এ রকম মূল্যবোধ ভিত্তিক একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তবে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এটা আজ সময়ের অপরিহার্য।[৫৮৩]

একমুখী বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কখনো নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারে না।[৫৮৪]

অনেকে বলে থাকেন যে, শিক্ষা মৌলিক অধিকার। এটা সম্পূর্ণ ভুল উক্তি। কারণ আমাদের সংবিধানে যে সমস্ত মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ আছে তার মধ্যে শিক্ষার কথা উল্লেখ নাই। তাই শিক্ষা একটি মানবিক অধিকার। এই মানবিক অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে সচেষ্ট হতে হবে। তবে পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর দিকে সুদৃষ্টি রাখতে হবে।[৫৮৫]

যে শিক্ষা গ্রহণ করলে মানুষের মেধা মননকে জাগ্রত করে না তা আদৌ কোন শিক্ষা নয়। তাই আমি চাইব সমাজে একজন সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে নৈতিক শিক্ষার অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে।[৫৮৬]

বর্তমানে আমাদের দেশে দুর্নীতির মূল কারণ হচ্ছে আমাদের নৈতিকতা এটা রোধ করতে নৈতিকতা ও জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা জরুরী।[৫৮৭]

নৈতিকতাকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে ত্রিমুখী শিক্ষার পরিবর্তে আদর্শ জাতি গঠনে কল্যাণ ধর্মী শিক্ষার জন্য উচিত একটি কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থার প্রচলন করা। এ বিষয়ে সরকারকে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে হবে।[৫৮৮]

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং এই বিষয়ে বেশী জোর দিতে হবে।[৫৮৯]

আমাদের একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত এবং ইহাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো উচিত।[৫৯০]

যে শিক্ষা গ্রহণ করলে মানুষের মধ্যে মনুষত্বের সৃষ্টি হয় না তা আদৌ কোন শিক্ষা হতে পারে না। তাই আমি মনে করি সমাজে একজন সচেতন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে নৈতিক শিক্ষার অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে।[৫৯১]

একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং মুসলিম দেশ হিসাবে শিক্ষায় কুরআন, হাদীস, অ্যান্য ধর্মালম্বীদের জন্য তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল শিক্ষা, বাণিজ্যিক বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা।[৫৯২]

---

[৫৮১] মোঃ আলমগীর হোসেন, বি.এস.এস. (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৮২] শাসুজ্জামান। ৪র্থ বষ, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৮৩] ফয়সাল খান। ৩য় বর্ষ, অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৮৪] আব্দুল ওয়াহাব। ৩য় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৮৫] এস.কে নুরুজ্জামান। ২য় বর্ষ, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৮৬] মোঃ সিরাজুল ইসলাম। বি.এস.সি সম্মান ৪র্থ বর্ষ, ভূগোল ও পরিবেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৮৭] মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। সম্মান, (৩য় বর্ষ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৮৮] মোজাম্মেল হক। এম.এ. আরবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৮৯] শামীম আহমেদ। চতুর্থ বর্ষ, বি.এ অনার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৯০] মোঃ হানিফ মিয়া। দ্বিতীয় বর্ষ, বিএ (অনার্স) ফার্সি সাহিত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৯১] শরিফুল ইসলাম। ২য় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৯২] গোলাম সরোয়ার। বি.এস.সি অনার্স, ভূগোল ও পরিবেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে সেমিনার, টকশো, পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার এবং জনসমর্থ তৈরী করতে হবে। বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করতে হবে। নৈতিবাচক ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক দিক এবং এর সুদুর প্রসারী পলাফল ও প্রভাব সম্পর্কে সমাজ ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি।[৫৯৩]

পাঠ্য পুস্তক কুরআন শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ অন্তর্ভূক্ত হওয়া। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করা।[৫৯৪]

একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং তা শিক্ষার সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করা।[৫৯৫]

বর্তমান ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত।[৫৯৬]

আধুনিক সময়পযোগী বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা।[৫৯৭]

স্কুল পর্যায় হতে ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা উচিত।[৫৯৮]

উপরিল্লেখিত কারণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেকোন মাধ্যমে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এজন্য সরকারের পাশাপাশি আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।[৫৯৯]

শুধু নীতি নৈতিকতা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরী নয়। বাস্তব প্রচরণ ঘটাতে হবে। পুঁথিগত নীতিমালা ফলাফল আনবে না তাই বাস্তবসম্মত নৈতিকতাযুক্ত ও শিক্ষানীতি তৈরী করে তার যথার্থ প্রয়োগ।[৬০০]

একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা উচিত।[৬০১]

জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মীয় মূল্যবোধই একজন মানুষকে ন্যায় পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধান পরিচালক হিসেবে কাজ করে। তাই জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নে ধর্মীয় মূল্যবোধকে অন্যতম একটি প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান দেওয়া উচিত।[৬০২]

যদি ও এট একটি দীর্ঘ প্রক্রিতা তবুও এটা করা গেলে ভাল হবে। কিন্তু তড়িৎ প্রক্রিয়া হিসাবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধের সংযোগ ঘটালেই আমার মনে হয় ভাল ফল পাওয়া যাবে।[৬০৩]

আমার মতে একমুখী ব্যবস্থার পরিবর্তে ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট যুগোপযোগী। ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাই চলমান রাখা উচিত। তবে শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন আছে।[৬০৪]

শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি পর্যায় পর্যন্ত নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা হবে আধুনিক। শিক্ষা ব্যবস্থা হবে জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক ও রাজনৈতিক খোলস মুক্ত।[৬০৫]

---

[৫৯৩] মাসুম বিল্যাহ, বি.এস.সি (অনার্স), ৪র্থ বর্ষ, সমাজকল্যাণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৯৪] মোঃ ইমদাদুল হক, বি.এ অনার্স, আরবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৯৫] মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। ৩১৫ বঙ্গবন্ধু হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৯৬] মৌরী। বি.এস.এস অনার্স (চতুর্থ) সমাজ বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৯৭] ঈশিতা শহীদ সাময়, ৪র্থ বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
[৫৯৮] মোঃ জাহিদ হাসান। এম.বি.বি.এস, ৪র্থ বর্ষ, বিজ্ঞান, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
[৫৯৯] মোঃ আব্দুল কাফী। ভর্তি পরীক্ষার্থী। ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
[৬০০] তাসনিম। ২য় বর্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
[৬০১] সাজ্জাদ হোসেন ভূঁইয়া। ৪র্থ বর্ষ, এম.বি.বি.এম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
[৬০২] মোঃ হাসান জুবায়ের রুমেল। এম.বি.বি.এস (১ম বর্ষ) ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
[৬০৩] মোঃ মেফতাই-উল-ইসলাম। এম.বি.বি.এস (৩য় বর্ষ) ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
[৬০৪] মোঃ সাকিবুর রহমান। এম.বি.বি.এস (২য় বর্ষ) ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
[৬০৫] মনিরুল ইসলাম। যন্ত্র কৌশল, ৩য় বর্ষ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে এস.এস.সি লেভেল পাশ করার পর প্রত্যেকে অবশ্যই নিজ ধর্মীয় পুস্তক অর্থসহ অবশ্যই পড়তে পারে। বর্তমান প্রচলিত মাদ্রাসার মত নয়।[৬০৬]

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস যুগোপযোগী হওয়া উচিৎ।[৬০৭]

শুধু শিক্ষানীতি প্রবর্তন করে লাভ নেই। পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।[৬০৮]

একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন না করে, ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সংস্কার করে এর মধ্যে নৈতিকতা জাতীয় মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভূক্তিকরণ ত্বরাণিত করতে হবে।[৬০৯]

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইসলামী নীতি ও আদেশের প্রতিফলনের জন্য ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার চালু করা জন্য, সরকারসহ আমাদের সকলের এগিয়ে আসা দরকার বলে আমি মনে করি।[৬১০]

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর জন্য একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে আমাদের সকলের অংশগ্রহন করা উচিত।[৬১১]

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, নূন্যতম একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা সাধারণ করা উচিত এবং সে অনুযায়ী সিলেবাস কারিকুলাম পূর্ণবিন্যস্ত করা উচিত।[৬১২]

একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয়তা মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্তার মাধ্যমে মানুষের নৈতিকতাকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে সন্ত্রাস দুর্নীতিহীন মুখী সমৃদ্ধি দেশ গড়ে তোলা সম্ভব।[৬১৩]

ইংরেজী শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা ও ধর্ম তথা নৈতিক শিক্ষাকে একটি সাধারণ রূপ দেওয়া যাতে মানুষ নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানবিক শিক্ষা অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে পারে।[৬১৪]

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। বাস্তবমুখী কর্মসূচী চালু করা। শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।[৬১৫]

ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা, ভ্রান্তিকর। তাই শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত।[৬১৬]

শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত নৈতিক ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রণীত।[৬১৭]

আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা। নৈতিকতা সম্পন্ন লোক তৈরী ও ধর্মীয় শিক্ষার ফলে দেশ প্রেম সুদূর প্রসারীভাবে বৃদ্ধি পাবে।[৬১৮]

---

[৬০৬] মোঃ মফিজুল ইসলাম। লে-৩, টি-২, কেমিকৌশল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬০৭] কাজী মাশফিক হোসেন। লে-১, টি-১, মেকানিক্যাল, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬০৮] আকিবুল হাসান। লে-১, টি-২, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬০৯] মোঃ মাযহারুল ইসলাম। লেভেল-১, সেমিষ্টার-১, কৃষি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬১০] মুহাঃ তানভীর রহমান। বি.এসসি, লেভেল-১, সেমিষ্টার-২, কৃষি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬১১] এ.কে.এম আশরাফুল আলম। লেভেল-১, সেমিষ্টার-২, কৃষি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬১২] মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ, লেভেল-১, সেমিষ্টার-২, ভেটেরিনারি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬১৩] মোঃ আব্দুল্লাহিল কাফি। বি.এসসি (অনার্স) ভেটেরিনারি বিজ্ঞান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬১৪] মোঃ আঃ লতিফ। ডিভি এম, লে-১, সে-২, ভেটেরিনারি বিজ্ঞান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬১৫] মোঃ নাজিম উদ্দিন। এইচ.এস.সি, বিজ্ঞান, গুরুদয়াল সরকারী কলেজ।
[৬১৬] মোহাম্মদ গিয়া উদ্দিন। লে-১, সে-১, ডি.ডি.এম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬১৭] ডা. শহিদুল্লাহ শরীফ। এম.এস এন মনোবিজ্ঞান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬১৮] মোঃ আসাদুজ্জামান। বি.এসসি (অনার্স) লে-১, সে-২, ভেটেরিনারি বিজ্ঞান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ সুতরাং নৈতিকতাসহ সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিজ্ঞান ও নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন ।[৬১৯]

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একমুখী নয় বরং ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে (সাধারণ, টেকনিক্যাল, ধর্মীয়) সমমান প্রদান করে । নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধকে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি করে একটি সমন্বিত ও তুলনামূলক (সাদৃশ্যতা) শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে যথেষ্ট হলে বা রূপরেখা তৈরী করতে পারলে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দুরাবস্থা কাটানো যাবে বলে মনে হয় ।[৬২০]

সকল ক্ষেত্রে ধর্ম তথা নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা । উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু করা । কর্মমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা ।[৬২১]

জাতীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতামূলক শিক্ষা একমাত্র দুর্নীতির প্রতেষেধক । জাতীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষাই জাতিকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌছাতে পারে । সর্বোপরি পারলৌকিক জীবনের জন্য নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই ।[৬২২]

কোরআন এবং হাদীসের আলোকে নৈতিক এবং কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা ।[৬২৩]

একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের কোন প্রয়োজন নেই । তবে বর্তমান ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা দরকার ।[৬২৪]

উচ্চ শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তরে একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হোক ।[৬২৫]

বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে হবে । কারণ বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা না হলে, দেশের উন্নতি সম্ভব নয় । এজন্য আমি মনে করি ৫০% বিজ্ঞান, ২০% কমার্স, ২০% কলা এবং ১০% ধর্ম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া উচিত ।[৬২৬]

নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মিশ্রণ থাকা একান্ত অপরিহার্য । কারণ বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ছাড়া বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলা একান্ত অসম্ভব ।[৬২৭]

প্রাথমিক স্তর থেকেই একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে ।[৬২৮]

১ম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব স্কুল, মাদ্রাসার সিলেবাস একই রকম হওয়া উচিৎ । ইংরেজী শেকার উপর গুরুত্ব দেয়া দরকার । দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার ।[৬২৯]

বর্তমান ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা অবশ্যই দরকার ।[৬৩০]

---

[৬১৯] মোঃ ফিরোজ আহম্মেদ । লে-২, সে-১, কৃষি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২০] ফাহাদ আবদুল লাহ আল রাজী । বি.এসসি (অনার্স) ভেটেনারী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২১] মোঃ সুলাইমান হোসাইন । ডি.ভি.এম, লে-২, সে-১, ভেটেরিনারি বিজ্ঞান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২২] জি.এম. কামরুল হাসান । এম.এস, প্রাণ রসায়ন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২৩] বাদশাহ্ মিয়া । লে-২, সে-১, বি.এসসি ফু ইঞ্জিঃ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২৪] মোঃ আব্দুল মালেক । ইন্টার্ণ, ভেটেনারী মেডিসিন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২৫] সরকার মোঃ ইব্রাহীম খলিল । লে-১, সে-২, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২৬] হাবিবুল্লাহ । এম.এস, মাটি বিজ্ঞান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২৭] মোঃ সালাহ উদ্দীন । লে-১, সে-২, কৃষি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২৮] আবুল ফজল মোঃ গোলাম রব্বানী । এম.এস.ইন মেডিসিন, ভেটেনারী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬২৯] ফয়সাল আরমান । গ্র্যাজুয়েট, কৃষি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।
[৬৩০] মোঃ আব্দুল আলিম । লে-১, সে-১, বি.এসসি (অনার্স) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ।

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ ব্যাক্তিত্ব তথা আদর্শ জাতি গঠনের জন্যনৈতিকতা ওজাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য আমি স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার এই বিশেষ উদ্যোগ তথা প্রচেষ্টা সফল হলে জাতি আশার আলো খুঁজে পাবে।[৬৩১]

একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।[৬৩২]

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা সেই সাথে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী জোর দেওয়া। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করনে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। যাবতীয় অনাচার, ধর্মীয় গোড়ামী পরিহার করতে আদর্শিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রণয়ন সময়ের দাবী মাত্র। রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশকৃত দুর্নীতি বন্ধ করার প্রধান হাতিয়ার হতে পারে মানিবক তথা সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ। ধর্ম ছাড়া শিক্ষা পঙ্গু আবার শিক্ষা ছাড়া ধর্ম অস্তি ত্বহীন।[৬৩৩]

বর্তমান ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমি এর চরম বিরোধীতা করি। কারণ ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন একজন Student সে গোড়া থেকে যেদিকে যাবে সেদিকে Specialize হতে পারবে। But যখন তাকে একমুখী শিক্ষার নামে একটা হ-য-ব-র-ল Situation এ ফেলা হবে তার পক্ষে আমার মনে হয় চরম সমস্যা হবে।[৬৩৪]

একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার নেই। তবে নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি করার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব বাড়ানো উচিৎ।[৬৩৫]

জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে এবং সরকার পর্যায়ে সেমিনার ও সেমপজিশনের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে।[৬৩৬]

শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার সমাবেশ ঘটানো। শিক্ষার মাধ্যমে পরকালীন মুক্তির চিন্তা উদ্রেক করা, যাতে মানব কল্যাণ সৃজিত হয়।[৬৩৭]

দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে জাতিকে রক্ষা করতে এবং একটি সুস্থ্য, চরিত্রবান মননশীল জাতি গঠনে বর্তমান নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এখন সময়ের দাবী। তাই আমাদের সকলকে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে সোচ্চার ভূমিকা রাখতে হবে। যাতে করে আমাদের জাতি সঠিক ও নৈতিকতা সম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারে।[৬৩৮]

এই ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিতে করা উচিত বলে আমার কাছে মনে হয়।[৬৩৯]

বিজ্ঞান ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাই পারে সমাজ ও জাতকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে। নৈতিকতা চরম। উৎকর্ষ সাধনে ও অর্থনৈতিক শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনে এরকম শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন একান্ত অপরিহার্য।[৬৪০]

---

[৬৩১] মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। অনার্স, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৩২] মোঃ আবুল কালাম আজাদ। সেমিষ্টার-১,
[৬৩৩] মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন। এম.এস.ইন একোয়াকালচার, মৎস বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৩৪] মোঃ কামরুল হাসান। লে-১, সে-২, মৎসবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৩৫] মোহাঃ নুর আলম। ডি.ভি.এম, লে-২, সে-১, খুলনা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৩৬] এন.এ সিদ্দিক। বি.এসসি., এ.এইচ (অনার্স) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৩৭] ডাঃ মুহাম্মদ আল মাহমুদ। ডি.ভি.এম, লে০৪, সে-২, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৩৮] মোঃ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ। ডি.ভি.এম, লে-৪, সে-২, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৩৯] মোঃ ফারুক হোসাইন। লে-৪, সে-২, কৃষি অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৪০] মোঃ আব্দুল মজিদ শাহ। ফিশারিজ, লে-৪, সে-১, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রিমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক সকল স্তরে হওয়া উচিৎ।[৬৪১]

বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে না। কেননা এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা উচিত। যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম তথা নৈতিক শিক্ষা অর্জন করে তাদের নিজেদের চরিত্র গঠনের পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে দেশ ও জাতিকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।[৬৪২]

ইহকাল ও পরকালের মুক্তির জন্য ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সিলেবাস প্রণয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস আধুনিকীকরণ যাতে মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যহত না হয়।[৬৪৩]

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পর্যন্ত সকল স্তরেই ধর্মীয়/নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি বিশ্বের ইতিহাস (বিশেষভাবে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস) গুরুত্ব পাওয়া উচিত। যে কোন জাতির কর্মদক্ষতা অর্জন ও উন্নয়নের জন্য অবশ্যই কারিগরি শিক্ষা বিজ্ঞান ও টেকনোলজী ভিত্তিক হওয়াই বাঞ্চনীয়। কিন্তু স্নাতক পর্যায়ের সকল শিক্ষাই অন্তত: একটি মৌলিক নৈতিকতা ভিত্তিক কোর্স থাকতে পারে।[৬৪৪]

আমি মনে করি বর্তমান ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করে একমুখী নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করলে একটি সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।[৬৪৫]

ত্রিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্বয়ে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।[৬৪৬]

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যবধান কমিয়ে আনা। বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধের সমস্বয় সাধন করা। বাস্তবমুখী শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া।[৬৪৭]

সময়ের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা করে তার সাথে নৈতিকতা ও জাতীয় মূল্যবোধ সংযুক্ত করে একটি যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।[৬৪৮]

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করে অতিদ্রুত একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করা এবং একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা, জাতীয় মূল্যবোধ, কর্মমূখী ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেয়া।

একমুখী হলে কোন স্তর পর্যন্ত তা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।[৬৪৯]

একমুখী শিক্ষায় একজন ছাত্রের পরিপূর্ণতা ও জ্ঞানের বিকাশ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবে না বলে আমার অভিমত। একমুখী শিক্ষার মাধ্যমে বিভেদায়ন ও বিশেষজ্ঞ তৈরীর পথে অন্তরায় বলে আমর অভিমত।[৬৫০]

---

[৬৪১] মোঃ মুকুল হোসেন। এম.এস.ইন, হর্টিকালচার, কৃষি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৪২] মোঃ রওশন হাবীব (রোকন)। লে-১, সে-১, পশুপালন অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৪৩] মুহাঃ জোনায়েদ হাবিব। লে-১, সে-১ (অনার্স) কৃষি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৪৪] ড. মোঃ আজিজুর রহমান। উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৪৫] মোঃ বেলাল হোসেন। প্রফেসর, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৪৬] নাজমুন নাহার তনু। প্রফেসর, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৪৭] আবু নোমান ফারুক আহম্মেদ। প্রভাষক, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৪৮] মোঃ তোহিদুল ইসলাম। প্রভাষক, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৪৯] মোঃ তাজুল ইসলাম চৌধুরী। প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৫০] মোঃ আব্দুর রহিম। প্রভাষক, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রখ্যাত আলেম, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনা ক্রমে জাতীয় চেতনা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ভিত্তিক একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নে সরকারের আশু পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ।[৬৫১]

মেডিকেল পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আমার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ নিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) গত সোমবার সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনকে চিঠি দিয়েছে। অধিদপ্তর সূত্র বলছে আগামী জুলাই মাস থেকে নতুন পাঠ্যসূচি চালু করা হবে। মূলত দুটি কারণে পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনা হোক বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান। অধিদপ্তরের পরিচালক (শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) অধ্যাপক খন্দকার মোঃ সিকদার উল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন। দেশে অসঞ্চালন ব্যাক্তির (Non Communicable Discear) প্রকাশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডায়াবেটিক, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ ও শ্রমতাত্তিক জটিলতা অংগের চেয়ে দেশে বেশী দেখা যাচ্ছে। অথচ এসব বিষয়ে বর্তমান পাঠ্যসূচিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়অ হউক। নতুন পাঠ্যসূচিতে নীতি-নৈতিকতা, আইন এসব বিষয়কে আরও বেশী গুরুত্ব দেয়ার কথা ভাবছে সরকার। অধ্যাপক সিফায়েত বলেন এদেশের চিকিৎসকদের প্রতিভা ও দক্ষতার কমতি নেই। কিন্তু রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের আচরন নিয়ে অনেক অভিযোগ শোনা যায়। তাই আচরণ ও নৈতিকতার বিষয়গুলোকে আরও গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের নীতি নৈতিকতা বিষয়ে জানানোর প্রয়োজন রয়েছে।[৬৫২]

তিনি আরও বলেন ছাত্রছাত্রীদের উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। যাতে তারা আল্লাহর একজন খলিফা হিসেবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সমাজ ও জাতীয় জীবনে অবদান রাখতে পারে। এ জন্য ইসলামি ও আধুনিক শিক্ষার সমম্বয়ে কারিকুলাম তৈরির পাশাপাশি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।[৬৫৩]

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ বলেছেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সত্যিকারের মানুষ হতে পারে। তারা নিজের সম্পর্কে জানতে পারে। বর্তমান বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থা একটা অসম্পূর্ণ শিক্ষা দিচ্ছে। যেখানে মানুষ পিএইচডি নিয়েও নিজের সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষা আমাদের এমনভাবে পশ্চাৎপদ করছে যে আমাদের আগের প্রজন্মকে আমরা অশিক্ষিত বলছি। অবজ্ঞা করছি। অথচ তারাই ছিলেন আসল জ্ঞানী মানুষ।[৬৫৪]

দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক, জনাব আলমগীর মহিউদ্দিন বলেন, বর্তমান বিশ্বে সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের যে অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য ইসলামি ও আধুনিক জ্ঞানের সমম্বয়ে কার্যকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে।[৬৫৫]

অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী বলেন, আজকের শিশুরা আগামীর দেশ ও মানুষ গড়ার কারিগর। দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে শিশুদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশে বিজ্ঞানভিত্তিক নৈতিক ও আধুনিক শিক্ষা অপরিহার্য।[৬৫৬]

সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির বলেছেন, নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়রোদে প্রত্যেক ধর্মের লোককে নিজ নিজ ধর্ম মেনে চলা, শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ধর্ম বিষয় বাধ্যতামূলক করা এবং ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিতদের বাড়াবাড়ি না করে শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির আরো বলেন, ইসলামি অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে নৈতিকতাসম্পন্ন দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। ইসলাম শুধু ঘরে বা মসজিদে বসে এবাদত করার কথা বলে না, কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনার কথা বলে।[৬৫৭]

---

[৬৫১] মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান। প্রভাষক, কৃষি বিজ্ঞান, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৫২] বুধবার-১১ ফেব্রুয়ারী-২০০৯- দৈনিক প্রথম আলো
[৬৫৩] ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম। প্রফেসর, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
[৬৫৪] দৈনিক নয়াদিগন্ত, বৃহস্পতিবার, ২৫ মাঘ ১৪১৪, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৮, পৃষ্ঠা নং-৩।
[৬৫৫] দৈনিক নয়াদিগন্ত বৃহস্পতিবার, ৯ মাঘ ১৪১৪, ২২ জানুয়ারী ২০০৮, পৃষ্ঠা নং-৩।
[৬৫৬] দৈনিক নয়াদিগন্ত, বৃহস্পতিবার, ৪ মাঘ ১৪১৪, ১৭ জানুয়ারী ২০০৮, পৃষ্ঠা-৩।
[৬৫৭] দৈনিক নয়াদিগন্ত, মঙ্গলবার, ১৬ মাঘ ১৪১৪, ২৯ জানুয়ারী ২০০৮, পৃষ্ঠা নং-৩।

Dhaka University Institutional Repository

জরিপের শতকিয়া প্রতিবেদন নিন্মে প্রদান করা হলোঃ

	১	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনা	৮০%	৬৮%	৮০%	৮০%	৮০%	৮০%
খ	নৈতিকতাহীন আধুনিক শিক্ষা	১৬%	২%	১২%	১০%	১০%	১২%
গ	অন্য কোনো মত	৪%	২৯%	৮%	১০%	১০%	৮%

	২	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ	৮২%	৮৪%	৭৩%	৬৪%	৮৭%	৭৩%
খ	জাগতিকভাবে সু-প্রতিষ্ঠিত	১৪%	৪%	৭%	২৮%	৪%	১৭%
গ	অন্য কোন মত	৪%	১১%	২০%	৮%	৯%	১০%

	৩	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	হ্যাঁ	৮০%	৭৫%	৮০%	৮০%	৭৯%	৮১%
খ	না	৪%	৭%	৮%	৬%	১৩%	১০%
গ	অন্য কোনো মত	১৬%	১৮%	১২%	১৪%	৭%	৯%

	৪	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান	২%	৪%	২%	৪%	২২%	৯%
খ	নৈতিকতায় প্রতিফলন সামান্য	৮২%	৮১%	৭০%	৫৬%	৫৫%	৬৯%
গ	প্রতিফলন নেই	৮%	৮%	২৫%	৩৬%	২২%	১২%
ঘ	অন্য কোনো মত	৮%	৭%	৩%	৪%	৪%	১০%

	৫	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	হ্যাঁ	১০%	৯%	৯%	২০%	১০%	১২%
খ	না	৭০%	৬৪%	৭৩%	৭২%	৭৬%	৮০%
গ	অন্য কোন মত	২০%	২৭%	১৮%	৮%	১৪%	৮%

	৬	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	হ্যাঁ	৮০%	৭০%	৮০%	৮০%	৮৩%	৭৫%
খ	না	১০%	১১%	১০%	৬%	৯%	১০%
গ	অন্য কোন মত	১০%	১৮%	১০%	১৪%	৮%	১৫%

	৭	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে	৩৬%	৫৯%	৪৬%	১৪%	৬৭%	৪৫%
খ	ঐচ্ছিক ভাবে	৫০%	১৮%	৩৬%	৫৮%	২২%	৪৫%
গ	অন্য কোন মত	১৪%	২৩%	১৮%	২৮%	১৫%	১০%

Dhaka University Institutional Repository

	৮	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	হ্যাঁ	৮৬%	৮৯%	৮০%	৭৮%	৮২%	৮১%
খ	না	৬%	২%	২%	১৬%	৮%	৯%
গ	অন্য কোন মত	৮%	৯%	১৮%	৬%	১০%	১০%

	৯	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা	৭০%	৫২%	৫০%	৭৮%	৭৪%	৮৫%
খ	Secular Education	১০%	২%	১০%	৮%	৯%	৫%
গ	অন্য কেনো মত	২০%	৪৬%	৪০%	১৪%	১৭%	১০%

	১০	শিক্ষকবৃন্দ	ছাত্র- বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র- মেডিকেল কলেজ	ছাত্র-প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র-কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	অন্যান্য ছাত্রছাত্রী
ক	হ্যাঁ	৮৮%	৮৪%	৮০%	৮০%	৮২%	৮৫%
খ	না	৮%	৪%	১৫%	১৪%	৯%	৯%
গ	অন্য কোন মত	৪%	১১%	৫%	৬%	৯%	৬%

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়
শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যসূচিতে ধর্ম তথা নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা

পাঠ্যক্রম বলিতে ঐ সকল শিক্ষণীয় বিষয়কে বুঝায় যা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিকল্পিত ও নির্দেশিত। আরও বলা হয় যে, স্কুলে যাই শিক্ষার্থীর ভালোর জন্য এবং স্কুলের সুনামের জন্য করা হয় তাহাই পাঠ্যক্রম।[৬৫৮] শিক্ষাক্রমের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো কারিকুলাম। কারিকুলাম শব্দটি ল্যাটিন 'currere' শব্দ হতে উদ্ভুত। এর অর্থ course of studies বা বিশেষ স্তরে পঠনীয় বিষয়। অন্যভাবে বলা যায়- It is the hue print of particular stage of education of a system. It is of recent origin.[659] পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা বিকাশের জন্য মানবধর্ম, সেবাব্রত, দাসব্রত ও মহৎ লোকদের জীবনী পাঠের ব্যবস্থা থাকবে। এই খানে মানবধর্মের মধ্যে থাকিবে প্রত্যেক ধর্মের মূলনীতি[৬৬০] শিক্ষাক্রম একটি জাতির প্রকৃত দর্পণ[৬৬১] স্বাধীনতার সাথে সাথে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে এমন একটা শিক্ষাক্রম হাতে পেয়েছি যা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আশা আকাঙ্খা ও বর্তমান সমাজের চাহিদা পূরণের সহায়ক নয়। দীর্ঘদিন ধরে আটকেপড়া একটি গোলক ধাঁধা থেকে বের হয়ে আসার জন্য প্রয়োজন একটি যুগোপযোগী জীবনী ভিত্তিক শিক্ষাক্রম যার সাহায্যে পরনির্ভরশীলতার মন-মানসিকতার পরিবর্তন করে আমরা একটি গতিময় পথ ধরে জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।[৬৬২] পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচিত হওয়া উচিত যাতে ঐ দেশের জনগণের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য প্রতিফলত হয়। প্রত্যেক জাতির স্বকীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যার নিজস্ব কৃষ্টি ও ঐতিহ্য নেই। জাতীয় জীবনে এই কৃষ্টি ঐতিহ্যের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যকে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।[৬৬৩] পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থীর নৈতিকতা শিক্ষার নির্দেশনা থাকা উচিত।[৬৬৪] ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে থেকে বিশ্লেষণ করলে পাঠ্যক্রমে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো থাকা অপরিহার্য।

1. The Islamic view of the creator (Tawhid, Iman, and Akhlaq)
2. The creation of Man and his purpose
3. Man's relationship with the creator
4. Man's relationship with the others.
5. Man's relationship with the environment
6. Self development
7. Man's destination
8. Development of an Islamic ethos so as to create an environment conducive to Islamic practice.[665]

দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের দেশের পাঠ্যক্রমে এমন কিছু বিষয় উঠে আসে যা অপ্রাসঙ্গিক এবং জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং তেমন কোনো শিক্ষণীয় বিষয়ও নয়। যেমন-

"হাটটিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং" ইত্যাদি।

এগুলোর পরিবর্তে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতিফলন সম্বলিত কবিতা গল্প বা ছড়া আসতে পারে। যেমন-

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী
সদা সত্য কথা বলিবে ইত্যাদি।[৬৬৬]

---

৬৫৮ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা নং-২০

৬৫৯ জবভবৎবহপব ঈড়ষষবপঃরড়হ করতে হবে।

৬৬০ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-১৩৯

৬৬১ শিক্ষাক্রমের ভাবনা, উপাদান ও প্রক্রিয়া, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

৬৬২ প্রাগুক্ত ....

৬৬৩ আনসার আলী, শিক্ষানীতি পরিক্রমা, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃষ্ঠা-৯২

৬৬৪ প্রাগুক্ত

665 Rosnani Hasuim, Islamization of the curriculum.IIT, USA, P-31

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা গঠনে পাঠ্যক্রমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ছাত্র ছাত্রীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ জাতীয় চেতনা সৃষ্টি সর্বোপরি ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করনের লক্ষ্যে পাঠ্যক্রম তৈরী করা আবশ্যক। Books on Alphabet" Plays a vital role in shaping the minds of children. Any body can check the overflow of subsidized Indian books for the children in most of our houses. Which imprints Indian and Hindu ideologies in children's minds?[667]

জাতীয় দর্শন ও মূল্যবোধকে সামনে রেখে পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হয়। সুতরাং যে কোন ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত জ্ঞানকে আমাদের কৃষ্টি এবং সামাজিক মূল্যবোধের নীতিভিত্তিক করিতে হইবে।[৬৬৮] এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তিকে জাতীয় কৃষ্টির উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী হিসাবে প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা করে।[৬৬৯] A text book is difficult from other books in the sense that it has specific defectives to fulfill ic, to imbibe certain knowledge values etc.[670]

সত্য ও সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে জাতীয় সংস্কৃতি বিকাশের উপযোগী জীবনভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষ। যে কোন দেশের নিজস্ব অর্থনীতি ও সামাজিক দর্শনকে অবহেলা করে কোনো কার্যকরী শিক্ষাক্রম তৈরি করা সম্ভব নয়। নিজস্ব রাষ্ট্র ও মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ নিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা উচিত।[৬৭১] শিক্ষাকে জীবনভিত্তিক করে গড়ে তোলার জন্য জনমানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিশেষে গুরুত্ব প্রদান করে শিক্ষক্রম প্রণয়ন করা প্রয়োজন। একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক, ঐতিহাসিক পরিবেশ, কৃষ্টি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদী, হস্তশিল্প, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড ও বিষয়াবলি ও প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রচলিত ক্রিয়াকর্মের ধরন ও গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে তথ্যাবলী সংগ্রহ করার কাজ শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারীদের জন্য একটি পূর্বশর্ত বিশেষ।[৬৭২] মূল্যবোধ ভিত্তিক পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর অতি কার্যসচেতনতা, অন্যের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া তা ছাড়া অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সাথে সাথে শিক্ষার্থী একটা নৈতিক ধর্মের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী হয়।[৬৭৩] শিক্ষাক্রম যে কোন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোন দেশের জনগণের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা মেটাতে এবং পরিবর্তিত অবস্থায় উদ্ভুত সমস্যার সমাধানে শিক্ষার্থীদেরকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম সর্বদা যুগোপযোগী হওয়া অপরিহার্য।[৬৭৪] বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সাথে ধর্মের প্রভাব গভীর ভাবে জড়িত। বিশেষ করে আমাদের এ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তাই তাদের জীবনব্যবস্থার সাথে ইসলামের প্রভাব একান্ত কাম্য। কাজেই এদেশের পাঠ্যক্রম শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী মূল্যবোধ অবশ্যই প্রতিফলিত হওয়া উচিত।[৬৭৫]

পাঠ্যক্রম রচনায় ধর্মের প্রেরণা থাকা যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত। Expressing Religious Impulses (Morality, Religious organization. The charch religious practices, Philosophy of life)[676] ইত্যাদি বিষয়গুলোকে পাঠ্যক্রমের উপাদান গণ্য করা হয়।

---

666 Kee note paper. Guide lines for formulation and imple mentation of school curriculum in Bangladesh- (8 April, 1995). Report (NAIM) Ministry of Education, Dhanmondi, Dhaka.

667 A.Z.M. Obaidullah, executive views. Vol.2, No.-1, March-2003. (A journal of Business Administration, IIUC)

668 শিক্ষাক্রম উন্নয়ন। পৃষ্ঠা-১৯

669 প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা-১৮

670 Guidelines for fromulation and implementation of school curriculum is Bangladesh. (8 April 1995) Report. (NAEM) Ministry of Educations, Dhanmondi, Dhaka, August, 1995.

671 শিক্ষাক্রম: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক। পৃষ্ঠা-১৫

672 প্রাগুক্ত: পৃষ্ঠা-৩১

673 শিক্ষাক্রম উন্নয়ন। পৃষ্ঠা-১২৬

674 শিক্ষাক্রমের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য-পৃষ্ঠা-৫৯

675 মোঃ আযাদ রহমান-ক্রমিক নং-৮৬০৩-যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আলোকে পঞ্চম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের মূল্যায়ন- (এম.এড কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরনের জন্য দাখিলত গবেষণা পত্র) শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢা.বি. পৃষ্ঠা-৩

676 Exploring the curriculum, H.H. Giles, S.P.MC cutcuen and A.N. Zechiel. NewYork and London-Page-04

Dhaka University Institutional Repository

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রদান, মুল্যবোধের উজ্জীবন ও নতুন প্রজন্মকে সচেতন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। ঔপনৈবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় সিলেবাস, পাঠ্যবই ও শিক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা স্বাধীন দেশের উপযোগী যোগ্য জনশক্তি তৈরি সম্ভব নয়।[৬৭৭]

মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান, মানবিকতা ও সংবেদনশীল মনোভাবের প্রয়োজনীয় জ্ঞান। আর সে জ্ঞান প্রতিফলিত হতে হবে পাঠ্যক্রমে। মানুষ, জ্ঞান ও পাঠ্যক্রমের সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িত।

B. Man

His various faculties and senses
Physical and spiritual
His sow and inner being

B. Knowledge

Rational or intellactual knowledge (ford kifayan) for service to society
Revealed knowledge (Fard ain) required for ever individual

C. Curriculum

Intellectual Sciences corres ponding to man's various physical faculties and senses.
Revealed sciences from the core curriculum
S pecialization requires both kind of sciences[678]

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সমস্যাটি প্রকট আঁকার ধারণ করেছে যে, শিক্ষাক্রমকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা। ফলে এমন সব শিক্ষার্থী বের হচ্ছে যারা চিন্তা-চেতনায় মননে ও কর্মে ধর্ম বিদ্বেষী কিংবা ধর্ম সম্পর্কে সচেতন নয়। এটি আজকে মুসলিম বিশ্বের প্রধানতম সমস্যাগুলোর একটি। The university curriculum is Muslim countries are still compartmentalized into the various divisions of natural sciences, social sciences, applied sciences, humanities and religious sciences. Without having any core fundamental knowledge to find them together and give them unity. Each division maintains a watertight separation from the other divisions, thereby despairing all sciences of the foundational basis is faith.[679]

- শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য মহান সৃষ্টিকর্তাকে জানা।

  কুরআন বর্ণিত হয়েছে-

- পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।
  সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।
  পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু।
  যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।
  শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না[৬৮০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

- নুন–শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে[৬৮১]

সূরা আর-রহমানের এ আয়াতেও পাঠ্যক্রমের বর্ণনা রয়েছে:

---

677 জাতীয় সেমিনার-ইসলামী শিক্ষা দিবস-১৫ ও ১৬ই আগষ্ট-২০০৮, পৃষ্ঠা-১৩
678 প্রাগুক্ত
679 প্রাগুক্ত
680 সূরা আলাক ১-৫
681 সূরা আলকলম-আয়াত ১

Dhaka University Institutional Repository

- করুণাময় আল্লাহ।
  শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন।
  সৃষ্টি করেছেন মানুষ।
  তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।[৬৮২]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

- সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।[৬৮৩]

  নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন কীভাবে পাঠ্যক্রম রচিত হওয়া উচিত:

- আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করুন। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি।[৬৮৪]

  পাঠ্যক্রম হতে হবে পরকাল নির্ভর। দুনিয়ার জীবনের পর অনন্ত এক জীবন মানুষের জন্য অপেক্ষমাণ এ অনুভূতি সর্বদা জাগরুক থাকবে এমন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন দরকার।

- তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না[৬৮৫]

  মানুষ সব সময়ই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল তা পাঠ্যক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

- সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে। এ কারণে যে সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।[৬৮৬]

  পাঠ্যক্রমকে আল্লাহর স্মরণ বিমুখ করা যাবে না।

- এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফেরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উপস্থিত করব।[৬৮৭]

মহান আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালার উপরোক্ত ঘোষণাবলিথেকে আমরা পাঠ্যক্রমে সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন তথা ধর্মের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। Without the guided intellect, there is every opportunity for man to become arrogant and ungrateful to his creator.[688] আমাদের পাঠ্যক্রমে সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টিজীব হিসেবে মানুষের কী সম্পর্ক সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব আজ নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য অনেকটা দায়ী। It is common knowledge that the content of the curriculum, that is courses or suspects offered in Muslim educational Institutions from the elementary to the tertiary levels, darticularly in the acquired sciences is borrowed from the western, secular worldview.[689] এ ক্ষেত্রে আমরা ধর্মবোধ বা ধর্মবিশ্বাসকে সামনে রেখে পাঠ্যক্রম তৈরি করতে পারলে সেটাই হতো মানবতার জন্য কল্যাণকামী। কেননা সব ধর্মই মানুষকে মানবিক হতে বলে নৈতিক হতে বলে। সৃষ্টিকর্তার বিধান মোতাবেক জীবন যাপন

---

[682] সূরা আর রহমান- ১-৪
[683] সূরা বনী ইসরাইন-৪৪
[684] সূরা আল ফায়েদাহ-৪৮
[685] সূরা আর রুম-০৭
[686] সূরা আলাক-৬-৭
[687] সূরা হোয়া হা-১২৪
[688] Rosnani Hasim- প্রাগুক্ত page-34
[689] প্রাগুক্ত-পৃ. 36

Dhaka University Institutional Repository

করতে বলে। ধর্মভিত্তিক পাঠ্যক্রম হচ্ছে- Breaking of the connection between the Scientific achievements of human civilization and the transmutations of postulative philosophy, so that science may be employed by means of a methodological order which is religious rater than speculative in nature.[690]

নৈতিক উন্নতি সাধনই শিক্ষাক্রমের মূল উদ্দেশ্য- The curriculum tends towards intellectual and physical development have shown that good moral habits and character are inculcated at an early age.[691]

পাঠ্যক্রম এমনভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন যা শিক্ষার্থীর মনে মহান আল্লাহ সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করবে; এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে যে, তিনি এক, একক ও লা-শরীক। তিনিই সমগ্র সৃষ্টি লোকের একমাত্র স্রষ্টা, রক্ষাকর্তা, পরিচালক ও শিক্ষাদাতা এবং প্রতিটি জীব ও প্রাণীর রিযিকদাতা।[৬৯২]

পবিত্র কালামে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে-

স্মরণ করো তোমার রব যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি মানুষকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করব, যখন তাকে পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ অবয়ব দান করলাম এবং তাতে আমার রুহ ফুঁকে দিলাম, তখন সকলেই-সবকিছুই তার জন্যে সিজদায় পতিত হলো।[৬৯৩]

পাঠ্যক্রম এমন হতে হবে যেন মানুষ তার শেষ পরিণতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারে। পবীত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

আসমান ও জমিনে বসবাসকারী সকলেই মহান দয়াবানের সমীপে একান্ত দাস হিসেবেই আসবে। তিনি তাদের বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদের ভালোভাবে গণনা করে রেখেছেন। আর তারা সকলেই কিয়ামতের দিন তার সমীপে একক ও নিঃসঙ্গভাবে আসবে।[৬৯৪]

পাঠ্যসূচিতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি শামিল থাকা উচিত। প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার্থীদের ধারণ ক্ষমতার মান অনুযায়ী সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমিক ধারায় শামিল থাকতে হবে।[৬৯৫]

এ শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহীর পূর্ণাঙ্গ ধারণার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। শিক্ষাথীরা জানতে চায় মন্দ কি, হালাল কি, হারাম কি, কোন কাজ কিভাবে করলে পরকালের শাস্তি বা শান্তি হবে।[৬৯৬]

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছে-

- হে ঈমানদার লোকেরা। এই মদ, জুয়া, আস্তানা ও পাশা- এ সবই না-পাক শয়তানি কাজ। তোমরা ইহা পরিহার কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।[৬৯৭]

পাঠ্যবিষয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ ও বিশ্বাস জাগাবে যে ইসলামে সামাজিক শৃংখলামূলক ঐক্য-একতা, সমতা-সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের উপর ভিত্তিশীল।[৬৯৮]

মুসলিম উম্মাহ এক ও অভিন্ন, ভাষা-বর্ণ, বংশ-অঞ্চল, অর্থ-সম্পদ প্রভৃতির দিক দিয়ে মুসলিম মুসলিমে কোন পার্থক্যই স্বীকার করে না।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন বর্ণিত হয়েছে-

- আর তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি আর তোমাদের ভাষাসমূহ ও তোমাদের বর্ণের পার্থক্য।[৬৯৯]

পাঠ্যতালিকায় অবশ্যই এমন বিষয়াদি শামিল থাকতে হবে যা প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অনুকম্পাশীল ও দয়ালু বানাবে এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে। এ ক্ষেত্রে কুরআন ঘোষণা করছে–

---

[690] Taha J. al Alwani, The Islami of knowledge, yesterday and today, ADISS-Volume-12-Spring-1995.
[691] Rosnani Hashim-Page-36
[692] মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি খায়রুন প্রকাশনী-ঢাকা, পৃ-১৪৮
[693] সূরা সাদ- ৭০-৭১
[694] সূরা মরিয়ম- ৯৩-৯৫
[695] মওলানা আব্দুর রহীম প্রাগুক্ত- পৃ.-১৪৯
[696] প্রাগুক্ত-পৃ. 149
[697] সূরা মায়িদা-৯০
[698] মওলানা আব্দুর রহীম- প্রাগুক্ত-পৃ.-১৫০
[699] সূরা রুম-১২

Dhaka University Institutional Repository

হে নবী (সাঃ) এটা আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি সেইসব লোকের জন্য খুবই নম্র-স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষান হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এরা তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত। অতএব এদের অপরাধ মাফ করে দাও, এদের মাগফিরাতের জন্যে দোয়া কর এবং দ্বীন-ইসলামের কাজকর্মে এদের সাথে পরামর্শ কর।[৭০০]

পাঠ্য বিষয়বস্তু দিয়ে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তারা কাউকে অপমাণিত, লাঞ্ছিত বা বিদ্রূপ করবে না। কার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে না বা কার দোষ রটিয়ে বেড়াবে না। কেউ কাউকে শোষণ করবে না বা কাউকে ঠকাবে না। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের দিকনির্দেশনা হচ্ছে-

হে ঈমানদার লোকেরা! না কোন পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে-হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোন মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে- হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিসম্পাৎ করবে না এবং না একজন অপরজনকে খারাপ উপনামে ডাকবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজ অত্যন্ত গর্হিত ও মন্দ।[৭০১]

পাঠ্য তালিকায় দায়িত্বানুভূতি, আদর্শ নৈতিকতা দৃঢ়তা থাকা বাঞ্ছনীয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি রক্ষা ও পরস্পরের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার উপাদান থাকবে।

পবিত্র কুরআনুল কারীম এরশাদ হয়েছে-

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির ওপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান ও ইসলামের সাক্ষ্যদাতা হও। কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, (এর ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো, কেননা খোদাপ্রাপ্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত।[৭০২]

ধর্মীয় শিক্ষা নৈতিকতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যুক্তরাজ্যের কারিকুলামে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠে নিম্নোক্ত বক্তব্যেঃ

Religious education actively promotes the values of truth, justice, respect for all and care of the environment. It places specific emphasis on:

- pupils valuing themselves and others
- the role of family and the community in religious belief and activity
- the celebration of diversity in society through understanding similarities and differences
- sustainable development of the earth.

Religious education also recognizes the changing nature of society, including changed in religious practice and the influence of religion in the local, national and global community.[703]

ধর্মীয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তারা বলেনঃ

Aim 1: The school curriculum should aim to provide opportunities for all pupils to learn and achieve.

Aim 2: The school curriculum should aim to promote pupils spiritual, moral, responsibilities and experiences of life.[704]

700 সূরা আল এমরান-১৫৯

701 সূরা আল হুজরাত-১৯

702 সূরা মায়িদা-০৮

703 Religious education: The non-statutory national framework, Qualifications and Curriculum Authority, U.K, p-8,10,13-14,21,24,26,28,30

704 Religious education: The non-statutory national framework, Qualifications and Curriculum Authority, U.K, p-8,10,13-14,21,24,26,28,30

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মীয় শিক্ষার আইনগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে UK কর্তৃপক্ষ বলেনঃ

Religious education must be taught to all registered pupils in maintained schools, including those in the sixth form, except to those withdrawn by their parents. This requirement does not apply to nursery classes in maintained schools. Religious education is a component of the basic curriculum, to be taught alongside the National Curriculum in all maintained schools. In all maintained schools, other than voluntary aided schools with a religious character, it must be taught according to a locally agreed syllabus.[705]

সিলেবাস পর্যালোচনাঃ

আজকে পর্যালোচনার দাবি রাখে আমাদের দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সাধারণ উচ্চশিক্ষা কিংবা মেডিকেল, প্রকৌশল শিক্ষায় যে পাঠ্যক্রম আছে তাতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রতিফলন কতটুকু বিদ্যমান আছে।

[705] Religious education: The non-statutory national framework, Qualifications and Curriculum Authority, U.K, p-8,10,13-14,21,24,26,28,30

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক সিলেবাস
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১০

নং-শিম/শাঃ১০/বিবিধ ১৫-১৩/৯৬/৮০৮ তারিখঃ ১৩/১১/৯৬ইং

"পরিপত্র"

জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে প্রবর্তিত মাধ্যমিক স্তরের (৯ম ও ১০ম শ্রেণী ১৯৯৮ সাল হতে অনুষ্ঠিতব্য এস.এস.সি. পরীক্ষার জন্য) পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে সরকার বিষয় ও নম্বর বিন্যাস প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন:

বিজ্ঞান শাখা		মানবিক শাখা		ব্যবসায় শিক্ষা শাখা	
ক. আবশ্যিক বিষয়-৭০০		ক. আবশ্যিক বিষয়-৭০০		ক. আবশ্যিক বিষয়-৭০০	
১. বাংলা	২০০	১. বাংলা	২০০	১. বাংলা	২০০
২. ইংরেজি	২০০	২. ইংরেজি	২০০	২. ইংরেজি	২০০
৩. গণিত	১০০	৩. গণিত	১০০	৩. গণিত	১০০
৪. ধর্ম শিক্ষা	১০০	৪. ধর্ম শিক্ষা	১০০	৪. ধর্ম শিক্ষা	১০০
(ইসলাম ধর্ম অথবা হিন্দু ধর্ম অথবা বৌদ্ধ ধর্ম অথবা খ্রিষ্টান ধর্ম)		(ইসলাম ধর্ম অথবা হিন্দু ধর্ম অথবা বৌদ্ধ ধর্ম অথবা খ্রিষ্টান ধর্ম)		(ইসলাম ধর্ম অথবা হিন্দু ধর্ম অথবা বৌদ্ধ ধর্ম অথবা খ্রিষ্টান ধর্ম)	
৫. সামাজিক বিজ্ঞান	১০০	৫. সাধারণ বিজ্ঞান	১০০	৫. সাধারণ বিজ্ঞান	১০০
খ. নৈর্বাচনিক বিষয় (৩টি)	৩০০	খ. নৈর্বাচনিক বিষয় (৩টি)	৩০০	খ. নৈর্বাচনিক বিষয় (৩টি)	৩০০
১. পদার্থ বিজ্ঞান	১০০	১. ইতিহাস	১০০	১. ব্যবসায় পরিচিতি	১০০
২. রসায়ন বিজ্ঞান	১০০	২. ভূগোল	১০০	২. হিসাব বিজ্ঞান	১০০
৩. জীব বিজ্ঞান	১০০	৩. অর্থনীতি	১০০	৩. ব্যবসায় উদ্যোগ	১০০
অথবা		অথবা		অথবা বাণিজ্যিক ভূগোল	
উচ্চতর গণিত		পৌরনীতি			
মোট = ১০০০		মোট = ১০০০		মোট = ১০০০	
গ. ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) - ১০০		গ. ঐচ্ছিক বিষয় (১টি) - ১০০		গ. ঐচ্ছিক বিষয় (১টি)- ১০০	
১. উচ্চতর গণিত		১. অর্থনীতি		১. বাণিজ্যিক ভূগোল	
২. জীববিজ্ঞান		২. পৌরনীতি		২. ব্যবসায় উদ্যোগ	

Dhaka University Institutional Repository

৩. কৃষিশিক্ষা

৪. গার্হস্থ্য অর্থনীতি

৫. ভূগোল

৬. কম্পিউটার শিক্ষা

৭. কর্মমুকী শিক্ষা

৮. বেসিক ট্রেড

৯. হিসাব বিজ্ঞান

১০. আরবি অথবা সংস্কৃত অথবা পালি

১১. সংগীত

*১২. শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া

৩. কৃষিশিক্ষা

৪. গার্হস্থ্য অর্থনীতি

৫. উচ্চর বাংলা

৬. উচ্চতর ইংরেজি

৭. উচ্চতর গণিত

৮. আরবি অথবা সংস্কৃত অথবা পালি

৯. কম্পিউটার শিক্ষা

১০. কর্মমুখী শিক্ষা

১১. বেসিক ট্রেড

১২. চারু ও কারুকলা

১৩. হিসাব বিজ্ঞান

১৪. সংগীত

*১৫. শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া

৩. কৃষিশিক্ষা

৪. গার্হস্থ্য অর্থনীতি

৫. অর্থনীতি

৬. কম্পিউটার শিক্ষা

৭. উচ্চতর গণিত

৮. কর্মমুখী শিক্ষা

৯. বেসিক ট্রেড

১০. আরবি অথবা সংস্কৃতি অথবা পালি

১১. সংগীত

মাধ্যমিক স্তরের সিলেবাস ও পাঠ্যসূচী বিশ্লেষণ করলে আমরা যা দেখতে পাই–

- টোটাল ১০০০ মার্কস এর মধ্যে ১০০ মার্কসের ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক ভাবে আছে।
- অপরাপর বিষয় বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা শাখার বিষয়সমূহ যেমন ব্যবসায় পরিচিতি, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় উদ্যোগ এ সকল বিষয়সমূহের সূচীতে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন নেই।
- শিক্ষার্থীর মাঝে কিশোর বয়স থেকেই নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিফলনের জন্য অপরাপর বিষযসমূহের পাঠ্যসূচীতে নৈতিকতার উপাদান থাকা প্রয়োজন ছিলো।

* নং-শিম/শাঃ১০/বিবিধ ১৫-১৩/৯৬/৮০৮

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাস
উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-২০০৯
শিক্ষাক্রম

আবশ্যিক বিষয়সমূহ	৪০০ নম্বর
নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ	৬০০ নম্বর
	মোট: ১০০০ নম্বর

ঐচ্ছিক বিষয়- (১টি) ২০০ নম্বর

সকল শাখার জন্য প্রযোজ্য আবশ্যিক বিষয়সমূহ

১. বাংলা	২০০ নম্বর
২. ইংরেজি	২০০ নম্বর
	মোটঃ ৪০০ নম্বর

বিজ্ঞান শাখা

ক. গুচ্ছ

নৈর্বাচনিক বিষয় (৩টি): ৬০০

১. পদার্থবিজ্ঞান
২. রসায়ন
৩. গণিত/জীববিজ্ঞান

খ. গুচ্ছা

ঐচ্ছিক বিষয়- (১টি) : ২০০

১. গণিত
২. জীববিজ্ঞান
৩. ভূগোল
৪. মনোবিজ্ঞান
৫. কম্পিউটার শিক্ষা
৬. প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশ প্র্যাকটিস
৭. পরিসংখ্যান
৮. কৃষিশিক্ষা
৯. হিসাববিজ্ঞান

মানবিক শাখা

ক. গুচ্ছ

নৈর্বাচনিক বিষয়- (২টি): ৪০০

১. অর্থনীতি
২. পৌরনীতি
৩. সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকল্যাণ
৪. ইতিহাস/ ইসলামের ইতিহাস

খ. গুচ্ছ

নৈর্বাচনিক বিষয়- (১টি)(ও

ঐচ্ছিক বিষয়ঃ (১টি)

(২০০+২০০) = ৪০০

১. যুক্তিবিদ্যা
২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
৩. ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য
৪. গণিত
৫. পরিসংখ্যান
৬. ভূগোল

১০. আরবি/সংস্কৃত/পালি

*১১. ক্রীড়া

ফুটবল/হকি/ক্রিকেট/টেনিস/ ভলিবল/

সাঁতার/অ্যাথলেটিক্স/বক্সিং/জিমন্যাস্টিক্স

৭. মনোবিজ্ঞান

৮. সমাজবিজ্ঞান/সমাজকল্যাণ

৯. ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস

১০. গার্হস্থ্য অর্থনীতি

১১. আরবি/সংস্কৃত/পালি

১২. ইসলাম শিক্ষা

১৩. সমরবিদ্যা

১৪. লঘু সঙ্গীত

১৫. উচ্চাঙ্গ সংগীত

১৬. চারু ও কারুকলা

১৭. নাট্যকলা

১৮. কৃষি শিক্ষা

১৯. কম্পিউটার শিক্ষা

২০. হিসাববিজ্ঞান

*২১. ক্রীড়াঃ

ফুটবল/ হকি/ ক্রিকেট/ টেনিস/ ভলিবল/ সাঁতার/ অ্যাথলেটিক্স/ বক্সিং/ জিমন্যাস্টিক্স

পর্যালোচনাঃ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পর্যবেক্ষণ করলে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়

টোটাল ১০০০ নম্বরের মধ্যে আবশ্যিক বিষয়সমূহ	৪০০ নম্বর
নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ	৬০০ নম্বর
মোট মার্কস	১০০০ নম্বর
ঐচ্ছিক বিষয় ১টি	১০০ নম্বর

- নৈতিকতার মূল উৎস ধর্মশিক্ষাকে আবশ্যক বিষয় হিসেবে রাখা হয়নি। বিজ্ঞান ও ব্যবসার শিক্ষা বিভাগে আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নেই।
- মানবিক শাখাতেও ইসলামী শিক্ষাকে গুচ্ছের অর্ন্তভূক্ত করে ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী এমনভাবে সাজানো হয়েছে এ বিষয়টি খুঁজে পেতেও সময় লাগে।
- অর্থাৎ বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষাতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। মানবিক বিভাগ থাকলেও তা গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে।
- আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচিতে ও ধর্ম নৈতিকতার উপাদান নেই।
- কিশোর বয়স থেকেই ধর্ম ও নৈতিকার ভিত্তিতে জীবনবোধ গড়ে তোলার জন্য ধর্ম শিক্ষাকে আবশ্যক বিষয় হিসেবে রাখা অপরিহার্য ছিল।

* উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাস উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা-২০০৯

Dhaka University Institutional Repository

Department of civil engineering (BUET)[706]

পর্যালোচনাঃ

বুয়েট এর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এর সিলেবাসে আমরা দেখতে পাই ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত কোনো কোর্স নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সভ্যতা বিনির্মাণে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য। সঙ্গত কারণেই প্রকৌশলীদেরকে ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত কোর্স পাঠদান জরুরী। একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত জীবন যাপনে ধর্ম ও নৈতিকতার ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আজকের সমাজে প্রকৌশলীদের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা শোনা যায়। আমরা মনে করি পাঠ্যসূচিতে ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত কোর্স বাধ্যতামূলক করে শিক্ষার্থীর মাঝে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব।

EEE Undergraduate Programme (BUET)[707]

পর্যালোচনাঃ

BUET এর EEE এর সিলেবাস আমরা দেখতে পাই ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কিত কোন কোর্স নেই। Professional Ethics নামে 3 Credit hours এর যে কোর্স রাখা হয়েছে তাতে ধর্ম ও নৈতিকতার মূল উৎস ধর্ম ভিত্তিক নৈতিকতার কোন আলোচনা নেই। শিক্ষার্থীদেরকে নৈতিক ভাবে গড়ে তোলার জন্য Professional Ethics এর সাথে Religions and moral values এর সমন্বয় করা দরকার।

The University of Dhaka, Bangladesh, 2006
Syllabuses of the Department of Computer Science and Engineering
For B.Sc. Honours Course[708]

পর্যালোচনা

পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Computer Science and Eng. বিষয়ের সিলেবাস ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সংবলিত কোন কোর্স নেই। আজকের আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশে কম্পিউটার বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। সঙ্গত কারনেই এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছে। কিন্তু ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত কোর্স শিক্ষার্থীর নৈতিক মূল্যবোধ দৃঢ়করণে অধিকতর সহায়ক ভূমিকা রাখত বলে আমরা মনে করি।

Syllabuses of the Department of Sociology
For B.S.S. Honours And M.S.S. Course[709]

পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভূক্ত সমাজতত্ত্বের সিলেবাসে আমরা দেখতে পাই শিক্ষার্থীর মাঝে ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো কোর্স রাখা হয়নি। আমরা জানি সমাজ বিজ্ঞানে সামাজিক সমস্যা, সম্ভাবনা, উত্তরণের উপায় এ বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভাবে পঠিত হয়। অথচ আজকের বিশ্বে বা বর্তমান বাংলাদেশে দুর্নীতি, অনিয়ম, সমাজ ব্যবস্থাকে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। এ অভিশাপ থেকে জাতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য ধর্ম ও নৈতিকতার কোন বিকল্প নেই। দুর্নীতিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে অথচ দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার কোনো কোর্স থাকবে না তা আশা করা যায় না।

---

[৭০৬] দ্রষ্টব্য, বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সিলেবোস।

[৭০৭] দ্রষ্টব্য, বুয়েটের ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্টের সিলেবাস।

[৭০৮] দ্রষ্টব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সিলেবাস।

[৭০৯] দ্রষ্টব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোসিওলোজি ডিপার্টমেন্টের সিলেবাস।

Dhaka University Institutional Repository

Syllabuses of the Department of Geography and Environment For B.Sc. Honours Course[710]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Geography and Environment এ আমরা দেখতে পাই এখানে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত কোনো কোর্স নেই। অথচ পৃথিবীর প্রকৃতি, ভৌগলিক পরিচয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সর্বোপরী এ বিশাল মহাবিশ্বের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তার নির্দেশিত পথেই সব গ্রহ উপগ্রহ চলমান রয়েছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে এ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসকে সামনে রেখে বাস্তব জীবনে নৈতিকতার প্রতিফলনের জন্য ধর্ম ও নৈতিকতা শীর্ষক কোর্স প্রয়োজন ছিল।

Syllabuses of the Department of Law For LL.B. Honours Course[711]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের আইনের সিলেবাস পর্যালোচনা করলে আমরা যা দেখতে পাই- শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতিফলনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কোর্স নেই। অথচ মানব সভ্যতার সুচনালগ্ন থেকেই আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। এ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মজীবনে ন্যায়কে অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য সঠিক যুক্তি উপস্থাপন এবং বিচারক হিসেবে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সঠিক রায় দেবেন এবং সকল রাগ অনুরাগ ও ভয়ের ঊর্ধ্বে থাকবেন অথচ এ সব বিষয়গুলো বাস্তব জীবনে অনুশীলনের জন্য যে ধর্ম ও নৈতিকতার ভূমিকা অনস্বীকার্য সে ধর্ম ও নৈতকতার কোনো কোর্স নেই। পাশাপাশি ইসলামী আইন ও বিচার সংবলিত রাসুল (সাঃ) যুগের বিচারব্যবস্থা বা খেলাফায়ে রাশেদীনের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে জানানোর ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র ১০০ মার্কসের Muslim Law এর মধ্যে সামগ্রিক ইসলামী আইন ও বিধানকে জানা সম্ভব নয় বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

Curriculum Of Physiology Course For Undergraduate Medical Students Of Bangladesh

CURRICULUM Of BIOCHEMISTRY[712]

মেডিকেল কারিকুলাম পর্যালোচনা ও সুপারিশ

বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে (সরকারি এবং বেসরকারি) Anatomy ও Physiology এর সিলেবাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই শিক্ষার্থীর চিন্তা চেতনায় ও মানসে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এবং একে বিকশিত করার উপায় উপাদান অনুপস্থিত। পাশাপাশি চিকিৎসাসেবা একটি সংবেদনশীল ও মানবিক বিষয়। শিক্ষার্থীদের মানবিক ও সংবেদনশীল করে গড়ে তোলার প্রয়াস ও দৃশ্যমান নয়। সর্বোপরি মানব শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ রক্ত সঞ্চালনসহ Human body এবং তার Function সমূহ যখন আলোচনা হচ্ছে তখন সর্বশক্তিমান মহান রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টির অপার রহস্য এবং কতই না সুন্দর ও সুচারুরূপে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে এমন নিপুণ ও নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন এ সম্পর্কে কোন আলোচনা না থাকা এবং কেন কী জন্য সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার দায়িত্ব কর্তব্য কী এ সম্পর্কে ও কোনো বক্তব্য না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার কুদরত সৃষ্টি রহস্য এবং পৃথিবীতে তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার কোনো সুযোগ পাচ্ছে না।

মহান স্রস্টা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ, সৃষ্টির সেরা জীব আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং মানুষের সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন পরকালের জবাবদিহিতা জান্নাতে যাওয়ার তীব্র আকাংখা আকুতি এবং জাহান্নামের ভয় এ বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমান Curriculum এ না থাকার ফলে

৭১০ দ্রষ্টব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের সিলেবাস।

৭১১ দ্রষ্টব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ডিপার্টমেন্টের সিলেবাস।

৭১২ Academic Manual of MBBS Course 36th Batch (Session-2007-2008) Phase-1 Sir Salimullah Medical College, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

আজকের অধিকাংশ চিকিৎসকরা মানবিক, নৈতিক ও সংবেদনশীল হতে পারছেন না এ কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। মেডিকেল পাঠ্যসূচিতে Moral Value বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হলে আশা করা যায় শিক্ষার্থীরা নৈতিক মানবিক ও সংবেদনশীল রূপে গড়ে উঠবে এবং সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসেবে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ও স্বীয় স্বীয় ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। কেননা সব ধর্মই মানুষকে নৈতিক, মানবিক ও সংবেদনশীল রূপে দায়িত্ব পালন করতে বলে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা

একটি দেশের শিক্ষানীতি ঐ জাতির উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। যে শিক্ষানীতিতে জনমানুষের আশা আকাংখা, ইতিহাস ঐতিহ্য ও জাতীয় চেতনার প্রতিফলন থাকবে। একটি সুন্দর সুষ্ঠু ও প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমিক সৎ যোগ্য ও নৈতিক মূল্যবোধে বলীয়ান জনগোষ্ঠী। ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে একটি জাতীয় শিক্ষানীতিই পারে সমাজ ও জাতিকে উপহার দিতে সৎ ও যোগ্য দেশপ্রেমিক মানুষ। যারা হবে দুর্নীতি ও অনিয়মের উর্ধ্বে আদর্শ মানুষ। দেশ সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযোগী এ শিক্ষানীতির সুপারিশমালা পেশ করা হলো। ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধকে প্রধান্য দিয়েই এ শিক্ষানীতির সুপারিশমালা তৈরী করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে যদি ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধকে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে রাখা হয় তাহলেই এ গবেষণা সফল ও সার্থক হবে বলে মনে করি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ফরিয়াদ করি তিনি যেন আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের এ প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ ৪০ বছরেও দেশের উপযোগী একটি কার্যকর শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। সম্প্রতি বর্তমান সরকার শিক্ষানীতি ২০১০ নামে একটি শিক্ষানীতি অনুমোদন করেছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

পৃথিবীতে আশরাফুল মাখলুকাত বা সর্বশ্রেষ্ট জীব হিসেবে মানুষ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এবং প্রতিনিধির দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর এ দায়িত্ব পালনের অনুভূতি জাগ্রত করা এবং ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের চিন্তা চেতনায় ও মননে কর্মে প্রেরণা সৃষ্টি করা এবং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা:

১। দেশের সকল শিশুর সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং শিশুরা যেন আদর্শ মানুষ হওয়ার উপযোগী পরিবেশ পায় তার ব্যবস্থা করা।
২। প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসায় শিশু শ্রেণী চালুর ব্যবস্থা রাখা।
৩। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও শিষ্টাচার গড়ে তোলার ব্যবস্থা।
৪। শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা।

প্রাথমিক শিক্ষা:

১। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিভিন্ন প্রকার ও মানের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম প্রচলিত আছে, তার অবসান ঘটিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একই ধরণ ও মানের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা।
২। এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার সমমান-সম্পন্ন করা।
৩। এনজিওদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত করা দরকার এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এনজিও পরিচালিত যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রমকে জাতীয় শিক্ষানীতি ও কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিশ্চয়তা বিধান করা।
৪। বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আরবি পড়ানোর ব্যবস্থা করা, ইসলামিয়াতের প্রাথমিক বিষয়সমূহ শেখানো এবং সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা। অমুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্যও অনুরূপভাবে স্ব স্ব ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ রাখা।
৫। শিশুদের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা রাখা। পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসফর ও ভ্রমনের ব্যবস্থা করা।
৬। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণী থেকেই কম্পিউটার আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমিক শিক্ষাঃ

১। মাধ্যমিক স্তরে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ পৃথক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে থাকবে। অমুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের স্ব স্ব ধর্ম অর্থ অথবা ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামে আলাদা কোর্স থাকতে পারে।
২। সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, বাণিজ্য, সমাজবিজ্ঞান ও গার্হস্থ্যনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইসলামী নীতি-বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা।
৩। ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, কারিকুলামে তার প্রতিফলন রাখা দরকার।
৪। কম্পিউটার বিজ্ঞান সকল শাখার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে থাকতে পারে।
৫। ইলেক্ট্রনিক্স ও কম্যুনিকেশনসহ অন্যান্য আধুনিক বিষয়ও সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত রাখা যেতে পারে।
৬। সামরিক জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
৭। প্রতি বছর জেলা ও থানা পর্যায়ে সকল দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয় বলে ঘোষণা করা। যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো করার প্রতিযোগিতা করতে পারে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে মৎস চাষ, হাঁসমুরগি পালন, পশুপালন, মৌমাছি পালন, তাঁত ও হস্তশিল্প, গার্মেন্টস, কারুশিল্প, কাঠের কাজ, জলযান নির্মাণ, অটোমোবাইল, লৌহশিল্প, রাজমিস্ত্রির কাজ, গৃহ:নির্মাণ, মেরামত কাজ, মৃৎশিল্প, মুদ্রণশিল্প, রন্ধন, উদ্যানবিদ্যা, গার্হস্থ্য শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এজন্য গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপক ভিত্তিক টেকনিক্যাল স্কুল/ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে।
৩। হাতে কলমে শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া।
৪। শিক্ষার্থী/ প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ধর্ম ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামে একটি কোর্স আবশ্যক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা

১। দেশব্যাপী পর্যাপ্তসংখ্যক কারিগরি/ প্রকৌশলী বা পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
২। ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের উচ্চতর ডিগ্রী লাভের সুযোগ নিশ্চিত করা।
৩। 'মাস্টার ক্রাফটম্যান' ও 'মাস্টার টেকনিশিয়ান' বাছাই করে, তাদের আর্থ-সামাজিক স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করা।
৪। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি শিল্প ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদেরও প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান সুনির্দিষ্ট নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা যেতে পারে।
৫। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে আবশ্যক করা। যাতে শিক্ষার্থীদের জীবনাচার ও কর্মজীবনে তার প্রভাব থাকে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

১। বাংলাদেশে সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখের এবং শিক্ষকের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি। অতএব, মাদ্রাসা শিক্ষার মান, পরিসর ও ব্যাপকতা ইত্যাদির বিচারে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দান।
২। সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ এবতেদায়ী পর্যায়ও হবে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং এবতেদায়ী পর্যায় সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের জন্যও সাধারণ প্রান্তিক শিক্ষার সুযোগ রাখা যেতে পারে।
৩। মাদ্রাসার কারিকুলামে ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন বিধান হিসেবে বুঝার সুযোগ রাখা।
৪। মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী বাণিজ্যনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান যেমন ইংরেজি, ফার্সি, উর্দু ইত্যাদি বিষয় থাকতে পারে। অনুরূপভাবে ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদিও ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
* দাখিল ও আলিমে বর্তমান আবশ্যিক বাংলা ও ইংরেজি ১০০ মার্কস এর পরিবর্তে ২০০ নম্বরের ব্যবস্থা করা।
৬। শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তবে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরবি ও ইংরেজি অবশ্যই রাখা দরকার। যাতে আরবী ও ইংরেজিতে সমান দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
৭। আলিম পর্যায় সমাপ্তকারী প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে তরজমাসহ কুরআন পড়তে পারে অর্থাৎ কুরআনকে কুরআনের ভাষায় বুঝার দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৮। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যাতে সকল শাখার শিক্ষার্থীরা জানতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৯। দাখিল ও আলিম পর্যায়ের প্রান্তিক পরীক্ষা পরিচালনা করবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। উভয় পর্যায় মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ থাকবে। এ ক্ষেত্রে সারা দেশে কমপক্ষে আরো দুটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

১০। আলিম পর্যায়কে একটি টার্মিনাল পর্যায় হিসেবে গণ্য করা। ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শুধু সেসব শিক্ষার্থীরা পড়বে, যারা কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ধর্ম ও দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন বা গবেষণা করতে চায়।

১১। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষক শিক্ষণ অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য যথাযথ ও ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১২। ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ ইতিমধ্যেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে ফাজিল ও কামিলের সিলেবাস আধুনিক ও যুগোপযোগী করা। যাতে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন হয়। এজন্য ঢাকায় একটি পৃথক অনুষদ করা যেতে পারে।

১৩। কাওমী মাদ্রাসাসমূহকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে সিলেবাস কারিকুলাম যুগোপযুগি করা।

১৪। শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলা, ব্যায়াম, শরীরচর্চা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

১৫। ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের যথাক্রমে সাধারণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সমকক্ষ হিসেবে গণ্য করা এবং সরকারি বেসরকারি সকল চাকুরি ও প্রতিযোগিতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমমান ও সমঅধিকার সম্পন্ন বলে বিবেচনা করতে সরকারী গেজেট নোটিফিকেট করা।

১৬। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান প্রমুখ সম্প্রদায়ের জন্য তাদের স্ব স্ব ধর্ম শেখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা।

শিক্ষক শিক্ষণ

১। শিক্ষকরাই শিক্ষার মেরুদন্ড এবং শিক্ষকদেরই শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করে। বিধায় সকল স্তরের শিক্ষকরা যাতে ব্যক্তিগতভাবে আদর্শ মানুষ ও চরিত্রবান আদর্শ শিক্ষক হন, তার নিশ্চয়তা বিধানই হবে শিক্ষক শিক্ষণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

২। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক, আচরণগত, নীতিগত এবং কর্তব্য ও শৃংখলাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৩। পিটিআই এবং বিএড ও এমএড পর্যায়ে শিক্ষকদের নৈতিক চরিত্র গঠনের অন্যতম উপাদান হিসেবে ইসলামিক স্টাডিজকে আবশ্যকীয় কোর্স করা।

৪। বিশ্বের আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করা এবং এজন্য প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা

১। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় ধর্ম ও নৈতিকতা কোর্স আবশ্যক করা, যাতে কর্মজীবনে তার প্রতিফলন ঘটে।

২। শিক্ষার সকল শাখায় ডিগ্রিও একটি টার্মিনাল স্তর হবে। শিক্ষকতা ও গবেষণা ব্যতীত দেশের সকল সরকারী বেসরকারী সাধারণ চাকরির জন্য স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্তিকেই যথেষ্ট যোগ্যতা বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩। স্নাতকোত্তর স্তর হবে মূলত: গবেষণাভিত্তিক এবং বিশেষীকরণ ভিত্তিক। শুধুমাত্র উপযুক্ত মেধা ও প্রবণতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরাই স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুযোগ পাবে।

৪। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কেই হতে হবে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি। প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিকেও মাল্টি-ডিসিপ্লিনারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা।

৫। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে (ক) পর্যাপ্ত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক (খ) পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ (গ) যথোপযুক্ত গবেষণাগার/পরীক্ষাগার ও সরঞ্জাম এবং (ঙ) শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করা। মেধার বদলে অর্থদানের ক্ষমতা বিবেচনা করে শিক্ষার্থী গ্রহণের ভয়াবহ কুপ্রবণতা কঠোরভাবে রোধ করতে হবে। উপরোক্ত শর্তাবলি পূরণ না করলে কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদিকে অনুমোদন প্রদান না করা । প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদিতেও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃত্তি, ভর্তুকী ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬। যেসব সরকারি ও বেসরকারি কলেজে যথোপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শিক্ষক, লাইব্রেরি, পরীক্ষাগার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেসব কলেজে উপযুক্ত পড়াশোনার মান বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮। উচ্চতর শিক্ষায় কখন কতজন শিক্ষার্থী সুযোগ পাবে এবং উচ্চতর শিক্ষার পাঠ্যক্রম কি হবে, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হবে সমাজের চাহিদা।

৯। স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স কোর্স সর্বক্ষেত্রে দু'বছর মেয়াদী হওয়া প্রয়োজন।

১০। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায় যাতে আন্তর্জাতিক মানসম্মত ও স্বীকৃত হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

১১। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, ইনফরমেশন, জেনেটিক্স ইত্যাদি যুগোপযোগী বিষয়কে পাঠক্রমে অগ্রাধিকার দেওয়া।

১২। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী তত্ত্ব ও তথ্যাদি সংযোজন করা যাতে সাধারণ শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন হয়।

১৪। শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সহায়তা দানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

১৫। বিশ্বের উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবিড় সংযোগ ও ইন্টারঅ্যাকশন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১৬। দেশের অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্টসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, শিক্ষা, গবেষণা ও চরিত্র গঠনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ, সেশনজট দূরীকরণ, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জবাবদিহিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করা। ক্যাম্পাসগুলো থেকে জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি উচ্ছেদ করে একটি সর্বসম্মত একাডেমিক কোড অনুসরণের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের পবিত্রতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার নিয়োগ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও কঠোর নিরপেক্ষতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশের এই উচ্চতম বিদ্যাপীঠ সমূহকে যথার্থ অর্থে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করা এবং সকল সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ধর্ম ও নৈতিকতা কোর্স আবশ্যক করা।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

১। বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গগতিপূর্ণ এবং বাংলাদেশের জনগণের মনমানস ও চিন্তাচেতনা ধর্মবোধের পরিপন্থী কোনো বিষয় কোনো শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যপুস্তকে যেন অন্তর্ভূক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।

২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, তথ্য বিপ্লব, বিশ্বব্যাপী লব্ধ নব নব জ্ঞান, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, জনগণের মনমানস ও ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গগতি রেখেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করা।

৩। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি থাকবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে পরিমার্জন ও সময়োপযোগী করার ব্যবস্থা রাখা।

৪। মাদ্রাসার শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণের জন্য টেক্সট বুক বোর্ডের একটি পৃথক বিভাগ থাকবে। অন্যথায় এজন্য আলাদা টেক্সট বুক বোর্ড গঠন করা যেতে পারে।

৫। টেক্সট বই অবশ্যই টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মান ও বিষয়ভিত্তিক হতে হবে। মানসম্মত না হলে বোর্ড যে কোনো পুস্তক বাতিল ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করা।

৬। নোট বই, সাজেশন, গাইড বই চিরতরে বন্ধ করা।

৭। সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচনা করা প্রয়োজন যাতে ব্যক্তি জীবনে ধর্মবোধ ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হয়।

পরিবেশ রচনা

কেবল পাঠ্যপুস্তক মানুষকে শিক্ষিত করে না, শিক্ষার্থীর উপর একটি ব্যপক প্রভাব ফেলে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ। শিক্ষাঙ্গনে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে শিক্ষার্থীরা কাংখিত পরিবেশের আলোকে বেড়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

জনমত গঠনঃ

দেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন মানুষ যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নিয়ে জীবনযাপন করছেন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তারই অংশ। অতএব, জনমত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে। যদি তা নাও হয়ে থাকে তাহলে জনমতকে প্রেরণা ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে সবার মাঝে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য ধর্মের জন্যও স্ব স্ব ধর্ম পালনের সুযোগ রাখা।

মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষাঃ

প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা গড়ে উঠেছে। মুসলিম সমাজের প্রাত্যাহিক মিলনকেন্দ্র হিসেবে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়ার মডেলে মসজিদ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগ নেওয়া যায়। মসজিদ কেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা বা স্কুল পূর্ণ শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের কাজ সহজ হবে। কারণ, লক্ষাধিক মসজিদের সবকটিকেই স্কুল ভবনের মতো ব্যবহার করা সম্ভব। পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়সমূহকেও প্রাক প্রাথমিক বা প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোঃ

শিক্ষানুরাগী কিছু ব্যক্তিবর্গকে এগিয়ে আসতে হবে। যারা নিজ উদ্যোগে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে পঠন-পাঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করবেন।

প্রশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলী

ইসলামী নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হয়ে দেখা দেবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকমন্ডলীর অভাব। এই জাতীয় সংকট থেকে বাঁচার উপায় শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী। শিক্ষকমন্ডলীর ভেতর থেকেই ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একদল লোককে বেছে নিতে হবে। যারা ইসলামী শিক্ষায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত হবেন এবং একজন যোগ্য প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন। ফাজিল ও কামিলকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত করার পর এ কাজটি এখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ন্যস্ত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ণ করে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বর্তমান অবস্থায় কৃষি শিক্ষার ইসলামীকরণঃ

* কৃষি কৃষ্টির মূল। ইসলাম কৃষককে সম্মানিত ব্যক্তি এবং কৃষিকে মহাপুণ্যের কাজ বলে আখ্যা দিয়েছে। এই ভাবধারা সমাজের আপামর জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়াই হবে কৃষি শিক্ষা ইসলামী করণের প্রধান দায়িত্ব।
* কৃষি শিক্ষা একটি ফলিত বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা নিয়ে এটা গড়ে উঠেছে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন, আরোহণ ও সংরক্ষণ কৃষির প্রধান কাজ। তাই ফসল উৎপাদন, পশু-পাখি পালন, মৎস চাষ, মৌমাছি পালন, বন সংরক্ষন, রেশম কীট পালন, কৃষি বাজার, সমবায় ও গ্রামোন্নয়ন এসবই কৃষির অন্তর্ভুক্ত। সার্বিকভাবে এসব কিছুর উৎপাদন বৃদ্ধি করে মানব কল্যাণে তাকে কাজে লাগানো ইসলামেরই নির্দেশ।
* শিক্ষা জীবনের প্রতি পদে প্রভাব বিস্তার করে, তাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সমাজের কতটুকু প্রয়োজন, কিভাবে এ শিক্ষা মিটাতে সক্ষম তার একটি রূপরেখা তৈরী করতে হবে। ইসলাম কোন বৃথা উদ্দেশ্যে সময় ও মেধা ব্যয় করাকে সমর্থন করে না। মূলত কৃষি শিক্ষাকে বর্তমান অবস্থায় রেখে শুধুমাত্র ধর্ম ও নৈতিকতা কোর্স আবশ্যক করে দিয়ে কৃষি শিক্ষায় ইসলামী নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন সম্ভব।

চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা

দেশের সকল অধিবাসিকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে সুস্থ-সবল রাখার লক্ষ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। চিকিৎসা পেশা অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে স্পর্শকাতর। শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, অসুস্থতা তথা জীবন-মৃত্যুর সমস্যার সঙ্গে যেন বিবেকবান সংবেদনশীল আদর্শ মানুষ হিসেবে সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে পারে, সে লক্ষ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ধর্ম ও নৈতিকতা কোর্স বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। বর্তমান বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসার প্রায় সকল উপকরণ বিদ্যমান। কিন্তু চিকিৎসকদের আচরণ, ব্যবহার, সংবেদনশীলতা, মানবতা, মমত্ববোধ সর্বোপরি নীতি নৈতিকতা আজ চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। সর্বোপরি চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা পাওয়া গেলেও চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে এটা খুব কম লোকই বলতে পারবে। মনে হচ্ছে এ সমস্যাটি আজ সংক্রামক ব্যাধির মত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় মেডিকেল সিলেবাসে বর্তমান পাঠ্যপুস্তক ঠিক রেখে ধর্ম ও নৈতিকতা কোর্সকে বাধ্যতামূলক করে ৩য় ও ৫ম বর্ষে পড়ানো যেতে পারে। ধর্ম বিষয়ে ডিগ্রিপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞগণ উক্ত কোর্স পড়াবেন। আশা করা যায় বর্তমান দুরাবস্থা থেকে দেশ ও জাতি রক্ষা পাবে এবং সংবেদনশীল নৈতিকতা সম্পন্ন চিকিৎসক তৈরি হবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে ড. ওমর হাসান কাসুলী বলেন:

The most important manifestation of the knowledge crisis is dichotomy in the education system: traditional Islamic vs. imported European. Integration of the 2 systems has failed. Secularization of education eliminated the moral dimension and violated the aim of Islamic education to produce an integrated and *perfect individual, insan kaamil*. The *ummatic* malaise due to the knowledge crisis that started with the fall of the *khilafat rashidah* when the authentic *'ulama* were marginalized. Society became 'secularized' because the rulers were in one valley and the scholars in another valley. This dichotomy between the sources of Islamic guidance and the political leadership of society eventually led to and nurtured the knowledge crisis we have today.[713]

Ethics in Medical education বিষয়াক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ড. ওমর হাসান কাসুলী ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পন্ন মেডিকেল কারিকুলাম কেমন হবে তার একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। এ রূপরেখাটি সংক্ষেপে নিম্নে বিধৃত হলো। তিনি মনে করেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে ধর্ম ও নৈতিকতার সমন্বয়ের ৫টি উদ্দেশ্য রয়েছে।

(a) introduction of Islamic paradigms and concepts in general as they relate to medicine, *mafahim Islamiyat fi al Tibb*. (b) strengthening faith, *iman*, through study of Allah's sign in the human body (c) appreciating and understanding the juridical, *fiqh*, aspects of health and disease, al *fiqh al tibbi*. (d) understanding the social issues in medical practice and search and (e) Professional etiquette, *adab al tabiib*, from the Islamic perspective.[714]

তিনি মনে করেন এ সিলেবাসে চিকিৎসকদের মাঝে নিম্নোক্ত গুণাবলিসমূহ বিকশিত হবে:

The *amanat* of being professionally competent. He must be highly motivated. He must have personal, professional, intellectual, and spiritual development programs. He must know the proper etiquette of dealing with patients and colleagues. He also must know and avoid professional malpractice. He needs to re equipped with leadership and managerial skills to be able to function properly as a head of a medical team.[715]

DERIVATION OF MEDICAL ETHICS FROM THE MAQASID AL SHARI'AT

In my view the most significant aspect of IIMC is the derivation of medical ethics from Islamic sources as al alternative to western sources. The full impact of this will be appreciated in due course when these ideas-become widely adopted. Secularized European

---

713 'Ethics in Medical Education' Paper presented by Dr. Omar Hasan Kasule Sr. MB Ch B (MUK), MPH (Harvard) Dr. PH (Harvard) Professor or Epidemiology and Islamic Medicine at University Brunei and Visiting Professor of Epidemiology at University Malkaya at a Workshop at Dhaka on 30th March 2007. EM omarkasule@yahoo.com, WEB; http://omarkasule.tripod.com.

714 Teaching material can be accessed at http://omarkasule .tripod.com

715 Teaching material can be accessed at http://omarkasule .tripod.com

Dhaka University Institutional Repository

law denied moral considerations associated with 'religion' and therefore failed to solve issues in modern medicine requiring moral considerations. This led to the birth of the discipline of medical ethics that is neither law enforceable by government nor morality enforceable by conscience. On the other hand, Islamic Law is comprehensive and encompasses moral principles directly applicable to medicine.

ড. ওমর কাসুলী নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিকিৎসাবিদ্যার জন্য অপরিহার্য বলে মতামত পেশ করেন এবং এসব বৈশিষ্ট্যই চিকিৎসাবিদ্যার জন্য নৈতিক বলে মনে করেন। আর এসব বিষয়ের অনুপস্থিতিকে অনৈতিক বলেন মনে করেন।

The theory of medical ethics in Islam should be based on the 5 purposes of the Lae, *maqasid al sari' at*, that are also considered the 5 purpose of medicine, *maqasid al tibb.* The 5 purposes are preservation of religion and morality, *hifdh al ddiin;* preservation of life and health, *hifdh al nafs*; preservation of progeny, *hifdh al nasl*; preservation of intellect, *hifdh al 'aql*; and preservation of wealth, *hifdh al maal*. Any medical action must fulfill one of the above purposes if it is to be considered ethical. If any medical procedure violates any of the 5 purposes it is deemed unethical.

The challenge before Muslim physicians is to liberate themselves from confusing and inconsistent European ethical theories and principles and instead to work hard to develop specific regulations for various medical interventions, *dhawaabit al tibaabat*, by a renewal of *ijtihad*. This *ijtihad* will be bvased on primary sources of the Law (Qur'an and sunnat), secondary sources of the Law based on transmission, *masaadir naqliyyat (ijma and qiyaas)*; secondary sources of the Law based on reason, *masaadir 'aqliyyat (istishaab, istihasaan, & istilaah)*; the purposes of the Law, *maqasid al shari 'at;* principles of the Law, *qawa'id al fiqh*; as well as regulations of the Lae, *dhawaabit al fiqh.*

তিনি মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত পাঠ্যসূচি অনুসরণ করার জন্য মতামত দেন।

Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
BLK 1: 'Aqiidat	**BLK 1: Life & Health**	**BLK 1a: Elem clinic**	**BLK 1: Med Techan**	**BLK 1: Formations**
Intro to Islamic Input	Life, al hayaat,	History Taking	Assisted Reproduction	The study circle
Inslam, Iamn, & Ihsan:	Death, al mawt	Physical Exam & Investi	Contraception	Self study of Qur'an
Tauhid	Health, al sihhat	Adab: Patient & Families	Reproductive cloning:	Motivation in Islam
Risalat	Disease, al maradh	Adab: Health Care Team	Abortion	Medical Education
Akhirat	Disease treatment, al tibaabat	Adab: with the Dying:	Artificial Life Support	Personal Development
Qadar	al tasawwur al Islami		Euthanasia	Skill Develop Program
'Ubudiyyuat		**BLK 1b: Law/Ethics**	Organ Transplant	Quality Culture
Tazkiyat al Nafs	**BLK 2: Growth**	Over-view	Stem cell transplant	
Ithm & Shirk	Intra-uterine Life:	Sources of the Law	Cosmetic Surgery	**BLK 2a: Leadershi**

Dhaka University Institutional Repository

Al Milal wa al adyaan	Infancy & Childhood:	Purpose and Principles	Animal Research	Basic characteristics:
Concept of 'Ubudiyyah:	Youth	Purposes & Principles of Med	Human Research	Attributes and functions
	Middle Age	Medical Procedures:	Research Practice	Diseases of leaders
BLK 2: 'ILM	Old Age	Research Procedures:	**BLK 2a: Transact**	Communication
Nature of Knowledge		Physician Conduct:	Medical malpractice:	Negotitation
Crisis of Knowledge		Professional Misconduct:	Marriage	Value-based Leadership:
Method of Knowledge	**BLK 3: Bio Miracle**		Divorce & annulment:	**BLK 2b: Leaders**
Classical Islam Sciences	Perfection in Anatomy		Inheritance	The Prophet
History of Med Science	Perfection in Physiology	**BLK 2: Fiqh 'Ibadat**	Sales	The righteous khulafa
Islamization of Med Science	Perfection in Biochemistry	Taharat:	Personal Loans	Political leaders
Islamization: Other Disciplin	Control & Homeostasis	Rulings on Salat	Investments	Social role models
Islamic Educ in SE Asia	Interaction with the Environ	Physical Acts of Salat	Endowments	Scholars and reformers
	Epidemiology & Statistics:	Special Types of Salat:	**BLK 2b: Crimes**	Multicultural society
	Modernization:	Salat in Difficulties	Crimes	**BLK 3a: MGMT**
BLK 3: Tarikh		Saum	Legal competence:	Principles and concepts
Creation of the Universe I	**BLK 4: Stru & Func**	Zakat	Pleas, & evidence	Strategy
Creation of the Universe II:	Alimentary System	Hajj	Judgment, conviction	Planning & implementat
Creation of the Human I:	Locomotor System		**BLK 3: Sco Institu**	Control and evaluation
Creation of the Human II:	Protective Systems	**BLK 3: Norm Condit**	Family 1: Gender	Decisions & Problems
Khilafat I:	Genito-urinary System	Menstruation	Family 2: Marital Rel	**BLK 3b: Res MGMT**
Khilafat II:	Cardio-respiratory System	Human Sexuality	Family 3: rels & child	Time Management
Taskhiir	Sensory System	Pregnancy and Delivery:	The Masjid	Financial management
Imarat al Ardh	Nervous System	Breast feedng	Takaful	Information Management
Era of Risaalat:	Globalization	Hygiene	Shuura	Orgn management
Era of Khilafat Raashidat,		Foods & Drinks	Maal	Personnel management
Islam in the Malay World:		Activity, Rest, and Sleep:	**BLK 4a: Com Prob**	
			Lifestyle	
BLK 4:		**BLK 4: Path**	Sexual perversions	

Dhaka University Institutional Repository

Civilization		Conditi		
Concepts of Civilization		Uro-gential system	Addictions	
Ancient Civilizations		Cardio-respiratory system:	Poverty	
Cycle of Civilization		Connective tissue system:	Violence	
Umayyad Era:		Sensory systems:	**BLK 4b: Soc Acts**	
Abassid Era:		Gen systemic conditions:	Dawa:	
Osmanli Era:		Psychiatric conditions	Amr & Nahy	
Other Muslim Civilizations:		Neurological conditions:	Social Change	
Achiev of Islamic Civilization		Age-related conditgions:	Professional orgs	
Tajdid & Islah			Welfare and Disaster	
A common Civilization				

প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা:

বর্তমান উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রাণ হচ্ছে সে সব দেশের প্রযুক্তির প্রয়োগ ক্ষমতা। উন্নয়নশীল দেশসমূহেক প্রযুক্তির বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রকৌশলীদের ইতিবাচক ভূমিকা সর্বত্র স্বীকৃত। আমাদের দেশেও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে প্রকৌশলীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের নব নব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বোপরি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে চলতে হলে প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষার কেনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা দেশে ও বিদেশে বেশ সমাদৃত হচ্ছে। আমরা মনে করি বর্তমান সিলেবাসের পাশাপাশি প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে আবশ্যক করা প্রয়োজন। যাতে করে ব্যক্তিগত ও কর্ম জীবনে শিক্ষার্থীরা সৎ, দক্ষ ও যোগ্যতার পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মবোধ লালন করতে পারে এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এসব প্রকৌশলীরা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

Key stage 1

Knowledge, skills and understanding

Learning about religion

1. Pupils should be taught to:
   a. explore a range of religious stories and sacred writings and talk about their meanings
   b. name and explore a range of celebrations, worship and rituals in religion, noting similarities where appropriate
   c. identify the importance, for some people, of belonging to a religion and recognizes the difference this makes to their lives
   d. explore how religious beliefs and ideas can be expressed through the arts and communicate their responses
   e. identify and suggest meanings for religious symbols and begin to use a range of religious words.

Dhaka University Institutional Repository

Key stage 2

Knowledge, skills and understanding

Learning about religion

1. Pupils should be taught to:
   a. describe the key aspects of religions, especially the people, stories and traditions that influence the beliefs and values of others
   b. describe the variety of practices and ways of life in religions and understand how these stem from, and are closely connected with, beliefs and teachings
   c. identify and begin to describe the similarities and differences within and between religions
   d. investigate the significance of religion in the local, national and global communities
   e. consider the meaning of a range of forms of religious expression, understand why they are important in religion and note links between them
   f. describe and begin to understand religious and other responses to ultimate and ethical questions
   g. use specialist vocabulary in communicating their knowledge and understanding
   h. use and interpret information about religions from a range of sources.

Key stage 3

Knowledge, skills and understanding

Learning about religion

1. Pupils should be taught to:
   a. investigate and explain the differing impacts of religious beliefs and teachings on individuals, communities and societies
   b. analyze and explain how religious beliefs and ideas are transmitted by people, texts and traditions
   c. investigate and explain why people belong to faith communities and explain the reasons for diversity in religion
   d. analyze and compare the evidence and arguments used when considering issues of truth in religion and philosophy
   e. discuss and evaluate how religious beliefs and teachings inform answers to ultimate questions and ethical issues
   f. apply a wide range of religious and philosophical vocabulary consistently and accurately, recognizing both the power and limitations of language in expressing religious ideas and beliefs
   g. interpret and evaluate a range of sources, texts and authorities, from a variety of contexts
   h. Interpret a variety of forms of religious and spiritual expression.

Dhaka University Institutional Repository

Ages 14-19

Knowledge, skills and understanding

Learning about religion

Students should be taught to:

a. investigate, study and interpret significant religious, philosophical and ethical issues, including the study of religious and spiritual experience, in light of their own sense of identity, experience and commitments
b. think rigorously and present coherent, widely informed and detailed arguments about beliefs, ethics, values and issues, drawing well-substantiated conclusions
c. develop their understanding of the principal methods by which religions and spirituality are studied
d. draw upon, interpret and evaluate the rich and varied forms of creative expression in religious life
e. Use specialist vocabulary to evaluate critically both the power and limitations of religious language.

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

আল কুর'আনুল কারীম		
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র)	:	জামিউস সহীহ বুখারী, দিল্লী, ১৩২২ হিঃ
মুসলিম বিন হাজ্জায (র)	:	জামিউস সহীহ মুসলিম
শায়খ ওয়ালী উদ্দিন খতীব (র)	:	মিশকা'তুল মাসাবীহ, কানুপুর, ইণ্ডিয়া (তা.বি)
আবদুল মান্নান তালিব	:	উলূমূল কুরআন, (১ম খণ্ড) রাজশাহী, ২০০১ খৃ. ।
মোঃ ফজলুল রহমান আশরাফী	:	(অনুবাদ) রিযাদুস সালেহীন, ঢাকা, ১৯৮৬ খৃ. ।
ড. মুহাম্মদ শফিকুলাহ	:	শরীঅত ও তরীকত, অনুবাদ আব্দুল মজিদ ঢাকুবী, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৪ খৃ. ।
মাওলানা মোঃ দ্বীন	:	কোরআন পরিচয়, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ), ১৯৬২ খৃ. ।
মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ	:	নবী পরিচয়, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ) ১৯৬২ খৃ. ।
মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ	:	বাংলাদেশের গবেষণা পত্রিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২ খৃ. ।
মওদুদ আহমদ	:	বাংলাদেশের ঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৮ খৃ. ।
ডঃ মুহাম্মদ আবদুর, চৌধুরী, ডঃ আবদুল মমিন	:	বাংলাদেশের ইতিহাস ,নওরোজ কিতাবিস্থান
কেএম রইছউদ্দিন	:	বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগ),খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা ।

তালিব, আব্দুল মান্নান	:	বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ. । ইফাবা-১৯৮০ খ্রিঃ
নেছার উদ্দিন, ডঃ আ.ই.ম	:	ইসলামী শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ, ইফাবা-১৯৭২
জাকারিয়া ; মোঃ	:	বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ
মানচিত্রে কেমন আমার বাংলাদেশ	:	বিশ্ব সাহিত্য ভবন
মুহাম্মদ আব্দুর ; চৌধুরী, আব্দুল মমিন; মাহমুদ, ড: এবিএম ; ইসলাম, সিরাজুল	:	বাংলাদেশের ইতিহাস নওরোজ কিতাবিস্তান
রহিম, ডক্টর এম.এ	:	বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস,বাংলা একাডেমী
হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল	:	মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য
সাত্তার, ড. মোঃ আবদুল	:	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব , ইফাবা
আলিম, একেএম আবদুল	:	ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস , বাংলা একাডেমী
ডঃ রংগলাল সেন	:	জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার,দেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন , নীলক্ষেত, ঢাকা
আতাউর রহমান	:	বাংলাদেশের শিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা
প্রফেসর কবীর চৌধুরী	:	আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১,বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন
আনসার আলী	:	শিক্ষানীতি পরিক্রমা
ডঃ সৈয়দ সফিউলা	:	জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন প্রসঙ্গে, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১,বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২,

শহিদুল ইসলাম	:	আমাদের শিক্ষানীতি ঃ অতীত ও বর্তমান, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১,বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন,
হোসনে আরা	:	বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা,সূচীপত্র প্রকাশনা
বাংলা পিডিয়া	:	বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
মোহাম্মদ মাহ্বুব উলাহ	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, বাংলাদেশের শিক্ষা সমস্যার স্বরূপ বিশেষণ, বাণিজ্য খণ্ড-৮, ১৯৩২
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান	:	আমাদের জাতীসত্ত্বার বিকাশধারা,দারুস সালাম পাবলিকেশন্স
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব এ, এস, এম, আলাউদ্দীন	:	ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
আনসার আলী	:	শিক্ষানীতি পরিক্রমা, ঢাকা
মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী	:	যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ , জাগরনী প্রকাশন
মোঃ আবদুলাহ আল-মাসুম	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যাঃ ৮২, জুন ২০০৫,বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৩ ইং
শামসুল হক	:	শিক্ষা প্রসঙ্গ
অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক	:	মাননীয় উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ৪৫তম সমাবর্তন বক্তৃতা, ২০০৯
অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুর রব	:	বুলেটিন ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি
প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ	:	বক্তৃতা, ৪৪তম সমাবর্তন-২০০৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক খান আলাউদ্দিন	:	সম্পাদক শিক্ষানীতি আই, ই, আর,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পি, টি, আই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

Dhaka University Institutional Repository

আনসার আলী	:	শিক্ষানীতি পরিক্রমা
শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা	:	হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৯ইং
কাজী মোতাহার হোসেন	:	শিক্ষা প্রবন্ধ সংকলন,শিক্ষা পুস্তক প্রকাশ কমিটি, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ইং, ঢাকা
মোঃ হাস্‌মতুলাহ	:	শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান , জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা
আনোয়ারুল করিব	:	শিক্ষাঙ্গণ, প্রথম আলো, ২৫শে ২০০৬ইং
আকু গামিদ লতিফ	:	শিক্ষা শিখন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ,শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাবি, ঢাকা।
আবদুর নূর	:	শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিঃ শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম, ইফাবা
শামসুল হক	:	শিক্ষা প্রসঙ্গ,বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৩ ইং
এ. কে. এম আযহারুল ইসলাম	:	নিন্দিত বিশ্ব নন্দিত গন্তব্য,প্রকাশনায় আলামা ফজলুলাহ ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম
শিক্ষানীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা	:	হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা মার্চ ১৯৯৯ইং
এস.এম. ইব্রাহিম	:	বাংলায় ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার উপর প্রতিবেদন,মুখবন্ধ,
অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরাফ	:	'শিক্ষার উপর জাতীয় কর্মশালা' ১৯৯৭-এ ,উপস্থাপিত শিক্ষাকলার দর্শন
এইচ, এইচ, বিলগেরামী	:	ইসলামী মূল্যবোধ ও শিক্ষা; প্রথম সংস্করণ, ১৯৮১, প্রকাশক- ইসলামী কাউন্সিল অব ইউরোপ, পৃ.-২৫।
মো: ইসমাইল মিয়া	:	শিক্ষাদর্শন ও ইসলাম,ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ
মনজুরুল হক	:	শিক্ষা-কলার কোরানিক আদর্শ,ইসলামী শিক্ষা ত্রৈমাসিক

Dhaka University Institutional Repository

আবদুস শহীদ নাসিম	:	শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি,শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা-১২১৭
আশরাফী, মাওলানা ফজলুর রহমান	:	মদিনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষা ও শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলামিক নলেজ এণ্ড ডায়েরি ১২ নভেম্বও ১৯৯৪, ঢাকা,
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ. এস. এম আলাউদ্দিন	:	খুলাফায়ে-ই-রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা,ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ২৭ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৮, ঢাকা,
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও এ. এস. এম আলাউদ্দিন	:	ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকাঃ ১৯৯৯,
বজলুর রহমান খান	:	শক্তির বাণী, ৪২/২, আজিমপুর, ঢাকাঃ ১৯৯৪,
স্যার সৈয়দ আমীর আলী	:	দ্য স্পিরিট অব ইসলাম,প্রকাশনী- মলিক ব্রাদার্স, কলকাতা, সংস্করণ- ডিসেম্বর ১৯৯৫,
ফিলিপ কে, হিট্টি	:	আরব জাতির ইতিহাস,মলিক ব্রাদার্স, কলকাতা, মূলগ্রন্থ- হিস্ট্রি অব দি অ্যারবস, দশম সংস্করণ
ইবনে আল জাওযী	:	সীরাত উমার ইবন আবদ আল-আযিয , (কায়রো-১৩৩১), পৃ-৯৯-১০০ । কিতাব আল-উয়ুন-অ-আল হাদায়িক ফি আখবর
আল-হাকায়িক	:	গোজি সম্পাদিত (লিডেন, ১৮৬৫),
ইবন আল তিকতাকা	:	আল-ফাখরী,সম্পাদনা এইচ ডেরেনবুর্গ (প্যারিস ১৮৯৫), অনুবাদ সি-ই জে হুইটিং (লন্ডন, ১৯৪৭)
ইবনে সাদ	:	কিতাব আল তাবাকাত,আল-কাবীর সম্পাদনা, এডুয়ার্ড স্যাচো,
ইবন আসাকির	:	আল তারীখ আল কবীর, আদ-আল কাদির বদরান (দামাস্কাস)
ইবনে আল জাওযী	:	সীরাত উমার ইবন আবদ আল-আযিয (কায়কেরা-১৩৩১),
ইসলামিক বিশ্ব কোষ ৫ম খণ্ড	:	প্রকাশনাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ ।
কে. আলী, আলী পাবলিকেশনস	:	ইসলামের ইতিহাস,প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬ , ৪র্থ সংস্কৃরণ–১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

ইবন-আবি উসাইবিয়া	:	উয়ুন-আল- ।নবা' ফি তাবাকাত আল আতিব্বা
ইবনে আল ইবরি	:	তাবারী
ড. এম আবদুল কাদির ও ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	:	উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস,ঢাকা জাহানারা বুক হাউস, ১৯৯৭
মুহাম্মদ আব্দুর রহিম	:	হাদিস সংকলনের ইতিহাস,বাংলা একাডেমী: বর্ধমান হাউজ, ঢাকা, প্রকাশকাল-নভেম্বর, ১৯৭০,
মুসা আনসারী	:	মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯
আল-হাফিয আবু আল-ওয়ালীদ ইবনে আল ফারদী	:	তারিখ আল-উলামা ওয়া আল রুওয়াহ লি আল-ইলম বি আল-আন্দালুস ,আল-সায়্যিদ ইযযাত আল আত্তার, (১৯৫৪),
ইবন উমায়রাহ আল-দাব্বী	:	বুগইয়াহ আল মুলতামিস ফী তারীখ রিজাল আহ্ল আল-আন্দালুস ,মাতাবি সিজল আল-আরব, ১৯৬৭ খৃ
জাযওয়াহ আল-মুকতাবিস	:	সম্পাদনা ড. মাহমুদ মক্কী (বৈরুত),
শেখ মোহাম্মদ ইকরাম	:	পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার,পাকিস্তান পাবলিকেশন-১৯৬৬)
জোৎস্না বিকাশ চৌধুরী	:	শিক্ষার ইতিহাস, (ঢাকা-১৯৯৪)
আব্দুল করিম	:	ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন,বাংলা একাডেমী, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৮,
গিয়াসউদ্দীন বারনী	:	তারিখে ফিরোজ শাহী,কলকাতা, সং-১৮৬২
, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী	:	আখবারুল আখইয়ারস, দিল্লী, মুহাম্মদী প্রেস, ১২৮৩
, আব্দুল করিম	:	ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন,বাংলা একাডেমী, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৮,
ড. শিববীর আহমদ,	:	আরবী যবান ও আদব আহদে মোগলিয়া মে,কাদিরাবাদী, লক্ষ্মী ছাপাখানা, দিল্লী, ১৯৮২,

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়চিন্তা	:	শাহ্ আব্দুল হান্নান
আনোয়ারুল কবীর	:	দৈনিক প্রথম আলো-২৫শে মে শুক্রবার ২০০৬ (শিক্ষাঙ্গন পাতা মতামত
অধ্যাপক রাশিদুল আলম	:	মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, সাহিত্য কুটির, বগুড়া, প্রকাশ ১৯৬৯
মোঃ আব্দুল ।লাহ্ আল-মাসুম	:	অ্যাডামস্ রিপোর্ট (১৮৩৫-১৮০৮) ও বাংলার শিক্ষা পরিস্থিতি,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা-সংখ্যা ৮২ জুন-২০০৫-আষাঢ়-১৪১২
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান	:	সমাবর্তন-বক্তৃতা, দ্বিতীয় সমাবর্তন, ৫ডিসেম্বর ১৯৯৯, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ,
ডঃ এম শমশের আলী	:	সমাবর্তন-বক্তৃতা, তৃতীয় সমাবর্তন
প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী	:	প্রধান অতিথির ভাষণ,জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা
প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী	:	প্রধান অতিথির ভাষণ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা, সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, ঢাকা,
মাওলানা আব্দুল আউয়াল	:	বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ,সম্পাদক, ডাঃ শাহাদাত হোসেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা
আবুল কাসেম ফজলুল হক	:	বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রসঙ্গে, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন
আমিনুল ইসলাম	:	জগতজীবন দর্শন, ঢাকা
হাসনা বেগম	:	বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা
শাহ্ আব্দুল হান্নান	:	দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮, উপ-সম্পাদকীয়,
প্রফেসর কবীর চৌধুরী	:	আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন
প্রফেসর আনিসুজ্জামান	:	জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

শহিদুল ইসলাম,	:	আমাদের শিক্ষানীতি ঃ অতীত ও বর্তমান, শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনার ২৫, ২৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, বাংলাদেশ
মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ	:	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে অষ্টম সংশোধনী বিতর্ক, বিল ১৯৮৮, খণ্ড ১, সংখ্যা ২৩, সংবিধান,
সৈয়দ আলী আহসান	:	আমাদের আত্ম পরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ
আবু হামিদ লতিফ	:	শিক্ষা শিখন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউন
মোঃ জুলফিকার আলী	:	বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনবিংশ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১/পৌষ ১৪০৮,
হাসনা বেগম	:	বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন; প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমি পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা, সুশিক্ষাবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ২০০৩, মনসুর
লিয়াকত আলী,	:	বাংলদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন; হিপোক্রেটিসের শপথ ও বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষা সুশিক্ষা বর্ষ স্মারক গ্রন্থ-২০০৩
আব্দুর রশিদ,	:	সুশিক্ষাবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: ২০০৩ এর আলোকে সুশিক্ষা বর্ষ ঘোষণার ঐতিহাসিক তাৎপয
মাওলানা মওদুদী	:	শিক্ষা ব্যবস্থা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ
মোহাম্মদ হাবিউলাহ	:	বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য,
আবুল কাশেম ফজলুল হক	:	শিক্ষা-মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক হয়না কেন?, বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার দুশো বছর
মো: ইউসুফ ফারুক,	:	বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকরণের সমস্য,
ডঃ এ. এইচ. এম. ইয়াহ্‌ইয়ার রহমান	:	The Islamic University Studies, Part-A, Volume 6, No. 1, December:
P. K. Hitti	:	History of the Arabs, London, 1949.
Syed Amir Ali	:	Spirit of Islam, London, 1949.

মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী	:	যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ,ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ. ।
নুর মোহাম্মদ আ'জমী	:	হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৫ খৃ. ।
Dr. A.N.M. Rais Uddin	:	Spanis contribution to the study of Hadith Literature, University of Dhaka, 1984.
আব্দুল মান্নান তালিব	:	বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ. ।
আবুল আ'লা মওদূদী (র)	:	তাফহীমুল কুরআন (অনুবাদ) মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা, ১৯৭৯ খৃ. ।
মুফতী মোহাম্মদ শফি (র)	:	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন
যদুনাথ সরকার	:	হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, (২য় খন্ড)
রমেশ চন্দ্র মজুমদার	:	বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) ঢাকা, ১৯৭৮ খৃ. ।
গোলাম হোসাইন সলীম	:	রিয়াদুস সালাতীন (অনুবাদ) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬১ খৃ. ।
মাওলানা আকরাম খাঁ	:	মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১৯৬২ খৃ. ।
মোঃ আবদুর রশিদ	:	ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা, ইফাবা, ১৯৮২ খৃ. ।
মোহাম্মদ আবদুর রহীম	:	হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইফাবা, ঢাকা (৪র্থ সংস্করণ) ১৯৮৬ খৃ. ।
মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী	:	হায়াতে আতহার, পাকিস্তান, ১৯৭৮ খৃ. ।
মোঃ আবদুস সাত্তার	:	ফরিদপুরে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ. ।
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	:	সিলেটে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ. ।

মেহরাব আলী	:	দিনাজপুরে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯১ খৃ. ।
এ কে এম মহিউদ্দিন	:	চট্টগ্রামে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৬ খৃ. ।
শেখ মোহাম্মদ ইকরাম	:	পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাদিকার, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৬ খৃ. ।
মাওলানা মোশতাক আহমদ	:	তাহরীকে দেওবন্দ, ঢাকা, ১৯৯২, খৃ. ।
মুহাম্মদ আবদুর রশীদ	:	শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র), ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ. ।
ড. মোহাম্মদ আবদুলাহ	:	বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ইফাবা, ১৯৮৪ খৃ. ।
মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী	:	অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল বাংলাদেশ বুক কর্পো. ঢাকা, ১৯৯৪ খৃ. ।
জুলফিকার আহমদ কিসমতী	:	আযাদী আন্দোলনে সংগ্রামী 'ওলামাদের ভূমিকা' ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ. ।
গোলাম রসুল মিহ্র	:	আযাদ পত্রাবলী, অধ্যাপক আখতার ফারুক (অনূদিত),ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ. ।
এ. কে. এম নাজির আহমদ	:	বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ. ।
এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম	:	ইসলামে মসজিদের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৯৩ খৃ. ।
ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক	:	আরবী সাহিত্য সমালোচনা, ঢাকা, ১৯৮৯ খৃ. ।
মুফতী আমিনুল ইহসান	:	হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইসলামী একাডেমী ঢাকা, ১৪১১ হি. ।
সায়্যিদ আবদুল লতিফ	:	ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ, ইফাবা, ১৯৮৬ খৃ. ।
সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী	:	ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ইফাবা, ১৯৮২ খৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

Dr. A.K.M. Ayub Ali	:	History of Traditional Education in Bangladesh, IFB, 1983.
Dr. Syed Mohmudul Hassan	:	Dacca: The city of Mosque, IFB, 1981
Dr. Monzurur Rahman	:	The Philosophy of Al Ghazale, IFB, 1997.
মুহাম্মদ আবদুস শাকুর	:	মুসলিম বিশ্বের নৈতিক পাঠক্রম, ইফাবা,ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ. ।
মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	:	রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল ইসলাম, ঢাকা, ১৮৯৫ খৃ. ।
হোসেন সিরাজী	:	আদব কায়দা শিক্ষা, কলিকাতা, ১৯১৪ খৃ. ।
আব্দুল লতিফ মুন্সী	:	ইসলাম আভা, পাবনা, ১৯১৩ খৃ. ।
মাওলানা আকরাম খাঁ	:	এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ১৯১৯ ও ১৯২৪ খৃ. ।
ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	:	ইসলাম প্রসঙ্গ, (প্রবন্ধ সংকলন), রেনেসাঁ প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬২ খৃ. ।
মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ	:	পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৪৯ খৃ. ।
ড. এনামুল হক	:	ইসলাম ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (গ্রন্থের অনুবাদ)
মোঃ মতিয়ুর রহমান	:	ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৮ খৃ. ।
আব্দুল মান্নান তালিব (অনুবাদক)	:	ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ১৯৬৬ খৃ. ।
শেখ ওয়াজেদ আলী	:	ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, সম্পাদনা, সুনামগঞ্জ সোস্যাল আপলিফট সোসাইটি, ১৯৬৫ খৃ. ।
শাহেদ আলী	:	সমাজতন্ত্র ও ইসলাম, ইসলামিক পাবলিকেশনন্স, ১৯৬৫ খৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ আব্দুর রহীম	:	উম্মুল কিবাত, কলিকাতা, ১৯২৯ খৃ. ।
মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	:	কোরআন পরিচয়, ঢাকা, ১৯৩৯ খৃ. ।
মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী	:	কোরান ও জীবন দর্শন, রহমান এণ্ড সন্স, চট্টগ্রাম, ১৯৬৩ খৃ. ।
আব্দুর রহমান	:	বঙ্গে সুফী প্রভাব, মহসিন এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৫ খৃ. ।
ডক্টর এনামুল হক	:	সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ,ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯ খৃ. ।
আ.ন.ম. বজলুল রশীদ	:	ঢাকা জাতীয় পুণর্গঠন সংস্থা, ১৯৬৫ খৃ. ।
মাওলানা রুহুল আমীন	:	হজরত বড় পীর সাহেবের জীবনী,নারায়ণপুর, ১৯২৯ খৃ. ।
খান বাহাদুর আহছান উল্যাহ চুফী	:	খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী,
মৌলভী মুহাম্মদ ইছমত আলী	:	ছোটদের কারামত আলী, ঢাকা, ১৯৬৪ খৃ. ।
মুহাম্মদ আবু তালিব	:	শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, সিলেট, ১৯১৪ খৃ. ।
মুফতী আজহার উদ্দিন আহমদ	:	হযরত শাহজালাল ও ইতিহাস,
সৈয়দ মুরতজা আলী	:	পরিবাগের শাহ সাহেব রাহেমা হুলাহর জীবনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪ খৃ. ।
মাওলানা আতাহার আলী মোলা	:	ফরিদপুরে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৩ খৃ. ।
মোঃ আব্দুস সাত্তার	:	পীর দুদু মিয়া, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর, ১৯৮০ খৃ. ।
আসকার ইবনে শাইখ	:	মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ) (প্রবন্ধ)

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক আব্দুল গফুর	:	সূফী দর্শন, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৪ খৃ. ।
ফকীর আব্দুর রশীদ	:	চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০ খৃ. ।
আব্দুল করিম	:	মুসলিম ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খৃ. ।
এস. এম. জাফর	:	তাযকেরাতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ. ।
শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার	:	সোবহানিয়া লাইব্রেরী, ইসলামপুর, ঢাকা, ১৯৬৪ খৃ. ।
অনুবাদ মাওলানা শামছুল হক	:	রহুল আমীন প্রমুখ (অনূ), সহীহ আল-বুখারী
অধ্যাপক মোজাম্মেল হক	:	(৪র্থ খ.) আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২ খৃ. ।
আ. কা. মু. মুরশেদ	:	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৮২ খৃ. ।
আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন	:	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী,
আবদুল মওদূদ	:	বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, তা.বি ।
আর.সি. মজুমদার	:	বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, (সম্পাদনা) ঢাকা, ১৯৭২ খৃ. ।
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম	:	মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম,
খোন্দকার সিরাজুল হক	:	বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ খৃ. ।
ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান	:	ইসলামের ইতিহাস, গোব লাইব্রেরী, ঢাকা ও বরিশাল, ১৯৮১ খৃ. ।
নূর মোহাম্মদ আ'জমী (অনূ)	:	আত্মজীবনী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৫ খৃ. ।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ	:	ইরান ও ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯ খৃ. ।
মুহম্মদ মমতাজ উদ্দীন (অনু)	:	পারস্য প্রতিভা, গেট ইষ্ট লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬০ খৃ. ।
মোহাম্মদ বরকতুলাহ	:	ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা, বিশ্বভারতী গ্রন্থলয়, কলিকাতা, ১৩৫৬ বা. ।
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	:	কিমিয়ায়ে সা'আদত, (অনুবাদ), নুরুর রহমান,
আল-গাযালী	:	ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৪ খৃ. ।
মফিজুলাহ কবির	:	খতমে নবুওয়াত, ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৮৬ খৃ. ।
মুফতী মুহাম্মদ শফী	:	পায়গামে মুহাম্মদী, (অনুবাদ), আবদুল মান্নান তালিব চট্টগ্রাম, খেদমত কমিটি, ১৯৬৮ খৃ. ।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-২,
সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ	:	শিক্ষাও উন্নয়ন ঃ উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি, ঢাকা, ১৯৯১ খৃ. ।
ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন	:	বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা, ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ. ।
P. K. Hitti	:	History of the Arabs, London, 1949.
Syed Amir Ali	:	Spirit of Islam, London, 1949
মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী	:	যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ,ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ. ।
নুর মোহাম্মদ আ'জমী	:	হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৫ খৃ. ।
আব্দুল মান্নান তালিব	:	বাংলাদেশে ইসলাম, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ. ।
আবুল আ'লা মওদূদী (র)	:	তাফহীমুল কুরআন (অনুবাদ) মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা, ১৯৭৯ খৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী মোহাম্মদ শফি (র)	:	তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (অনুবাদ) মুহীউদ্দীন খান, ইফাবা ১৯৮৬ খৃ.
যদুনাথ সরকার	:	হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, (২য় খন্ড)
রমেশ চন্দ্র মজুমদার	:	বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ),ঢাকা, ১৯৭৮ খ
গোলাম হোসাইন সলীম	:	রিয়াদুস সালাতীন (অনুবাদ) বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৯৬১ খৃ. ।
মাওলানা আকরাম খাঁ	:	মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, ১৯৬২ খৃ. ।
মোঃ আবদুর রশিদ	:	ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা, ইফাবা, ১৯৮২ খৃ. ।
মোহাম্মদ আবদুর রহীম	:	হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইফাবা, ঢাকা (৪র্থ সংস্করণ) ১৯৮৬ খৃ. ।
মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদী	:	হায়াতে আতহার, পাকিস্তান, ১৯৭৮ খৃ. ।
মোঃ আবদুস সাত্তার	:	ফরিদপুরে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ. ।
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	:	সিলেটে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ. ।
মেহরাব আলী	:	দিনাজপুরে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯১ খৃ. ।
এ কে এম মহিউদ্দিন	:	চট্টগ্রামে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৬ খ
শেখ মোহাম্মদ ইকরাম	:	পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাদিকার, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৬ খৃ. ।
মাওলানা মোশতাক আহমদ	:	তাহরীকে দেওবন্দ, ঢাকা, ১৯৯২, খৃ. ।
মুহাম্মদ আবদুর রশীদ	:	শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (র)ঢাকা, ১৯৯৭ খৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোহাম্মদ আবদুলাহ	:	বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ, ইফাবা, ১৯৮৪ খৃ. ।
মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী	:	অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল বাংলাদেশ বুক কর্পো. ঢাকা, ১৯৯৪ খৃ. ।
জুলফিকার আহমদ কিসমতী	:	আযাদী আন্দোলনে সংগ্রামী 'ওলামাদের ভূমিকা' ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ. ।
গোলাম রসুল মিহ্‌র	:	আযাদ পত্রাবলীঅধ্যাপক আখতার ফারুক (অনূদিত), ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ. ।
এ. কে. এম নাজির আহমদ	:	বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ. ।
এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম	:	ইসলামে মসজিদের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৯৩ খৃ. ।
ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক	:	আরবী সাহিত্য সমালোচনা, ঢাকা, ১৯৮৯ খ
মুফতী আমিনুল ইহসান	:	হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ইসলামী একাডেমী
সায়্যিদ আবদুল লতিফ	:	ইসলামী সংস্কৃতির বুনিয়াদ, ইফাবা, ১৯৮৬ খৃ. ।
সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী	:	ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ইফাবা, ১৯৮২ খৃ. ।
Dr. A.K.M. Ayub Ali	:	History of Traditional Education in Bangladesh, IFB, 1983.
Dr. Syed Mohmudul Hassan	:	Dacca: The city of Mosque, IFB, 1981
মুহাম্মদ আবদুস শাকুর	:	মুসলিম বিশ্বের নৈতিক পাঠক্রম, ইফাবা,
মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ	:	রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল ইসলাম, ঢাকা, ১৮৯৫ খৃ. ।
সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসলাম হোসেন সিরাজী	:	আদব কায়দা শিক্ষা, কলিকাতা, ১৯১৪ খৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল লতিফ মুন্সী	:	ইসলাম আভা, পাবনা, ১৯১৩ খৃ. ।
মাওলানা আকরাম খাঁ	:	এসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ১৯১৯ ও ১৯২৪ খৃ.
ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	:	ইসলাম প্রসঙ্গ, (প্রবন্ধ সংকলন),রেনেসাঁ প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬২ খৃ. ।
মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ	:	মুসলিম প্রতিভা, নোয়াখালী, ১৯১১ খৃ. ।
ড. এনামুল হক	:	পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা
মোঃ মতিয়ুর রহমান	:	ইসলাম ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (গ্রন্থের অনুবাদ)ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৮ খৃ. ।
আব্দুল মান্নান তালিব (অনুবাদক)	:	মূল মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী, ঢাকা, ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ১৯৬৬ খৃ. ।
শেখ ওয়াজেদ আলী	:	ইসলামের ইতিহাস, (১৮৯০-১৯৫১ খৃ.) ঢাকা, (তা.বি) ।
শাহেদ আলী	:	ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, সম্পাদনা, সুনামগঞ্জ
মোহাম্মদ আব্দুর রহীম	:	সমাজতন্ত্র ও ইসলাম, ইসলামিক পাবলিকেশনন্স, ১৯৬৫ খৃ. ।
মোহাম্মদ আকরাম খাঁ	:	উম্মুল কিবাত, কলিকাতা, ১৯২৯ খৃ. ।
মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী	:	কোরআন পরিচয়, ঢাকা, ১৯৩৯ খৃ. ।
আব্দুর রহমান	:	কোরান ও জীবন দর্শন, রহমান এণ্ড সন্স, চট্টগ্রাম, ১৯৬৩ খৃ. ।
ডক্টর এনামুল হক	:	বঙ্গে সুফী প্রভাব, মহসিন এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৩৫ খৃ. ।
কাজী দ্বীন মোহাম্মদ	:	সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ,ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯ খৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

আ.ন.ম. বজলুল রশীদ	:	পাকিস্তানের সুফী সাধক,
মাওলানা রুহুল আমীন	:	হজরত বড় পীর সাহেবের জীবনী,
খান বাহাদুর আহছান উল্যাহ চুফী	:	মুখদুমী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৭ খৃ. ।
মোহাম্মদ কোরবান আলী	:	খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী,
গোলাম রসুল	:	জালালুদ্দীন রুমী, বগুড়া সাহিত্য কুটির,১৯৬৮ খৃ. ।
মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী	:	খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া,
খন্দকার আখতার আলী	:	হজরত শাহ মখদুম ও মহাকাল গড়ের ইতিকথা,
মৌলভী মুহাম্মদ ইছমত আলী	:	কেরামত আলী জোনপুরী, কলিকাতা, ১৯১১ খৃ. ।
মুহাম্মদ আবু তালিব	:	ছোটদের কারামত আলী, ঢাকা, ১৯৬৪ খৃ. ।
মুফতী আজহার উদ্দিন আহমদ	:	শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, সিলেট, ১৯১৪ খৃ. ।
সৈয়দ মুরতজা আলী	:	হযরত শাহজালাল ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪ খৃ. ।
মোমতাজ উদ্দিন আহম্মদ	:	পরিবাগের শাহ্ সাহেব রাহেমা হুলাহর জীবনী, পাক ফার্নিশার্স, ঢাকা, ১৯৬৯ খৃ. ।
শহীদুল ইসলাম ও আব্দুস সোবহান	:	আল গাযযালী, সুবহানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬৩ খৃ.
খোন্দকার এ.কে. হাফেজ উদ্দিন	:	হযরত মোজাদ্দিদে আলফে সানী (র), সোবহানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬১ খৃ. ।
মুহাম্মদ মুজাফফর হোসাইন	:	চারি ইমামের জীবনী, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫ খৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

আমীনুল ইসলাম	:	মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ খৃ. ।
আব্দুল মান্নান তালিব	:	সাহিত্য সংস্কৃতি : ভাষা ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯১ খৃ. ।
আবুল মনসুর আহমদ	:	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ. ।
আব্বাস আলী খান	:	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৪ খৃ. ।
এম. এ. রহিম	:	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৬ খৃ. ।
বশীর আল-হেলাল	:	ভালো আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৭ খৃ. ।
মোহাম্মদ মাহফুজ উলাহ	:	মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৭৭ খৃ. ।
অধ্যাপক আব্দুল গফুর	:	আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ. ।
এডভোকেট এ.এম.এম আব্দুল জলীল	:	দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ. ।
জালালুদ্দীন সয়ূতী	:	আল ইতকান, এদারায়ে ইসলামিয়া, লাহোর, ১৯৮৬ খৃ. ।
মুহাম্মদ আব্দুলাহ	:	নওয়াব সলীমুলাহ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খৃ. ।
মাওলানা শামছুল হক	:	হাক্কানী তাফসীর, খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স ঢাকা, ১৯৮২ খৃ. ।
সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী	:	সীরাতে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (র) (২য় খণ্ড) ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯১ খৃ. ।
সৈয়দ আব্দুল মান্নান	:	পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ইকবাল একাডেমী, করাচী, পাকিস্তান, ১৯৫৯ খৃ. ।
খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম	:	বাংলা বিশ্বকোষ, (১ম ও ২য় খণ্ড), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭২ খৃ. ।

আলহাজ্ব মৌলভী ফিরোজ উদ্দিন	:	ফিরোজুলাগাত, জে এস সঙ্গ, দিল্লী, ভারত, ১৯৭৬ খৃ. ।
আল মু'জামুল ওয়াসিত	:	দারুল ইসলাম, এশায়াত ইসলামিয়া, দিল্লী, ভারত, তা.বি.
নুরুল আমীন আনসারী	:	ইমাম বুখারী, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৮ খৃ. ।
সাদেক শিবলী জামান	:	ইমাম শাফেরী (র) রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮১ খৃ. ।
সাদেক শিবলী জামান	:	ইমাম মালেক (র), রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৩ খৃ. ।
মুহাম্মদ সোলায়মান ফররুখ আযাদী	:	কারবালা থেকে বালাকোট, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৮৭ খৃ. ।
মুহাম্মদ আবদুর রশীদ	:	আলামা নিয়াজ মখদুম খোতানী (র), ঢাকা, ১৯৯৪ খৃ. ।
আব্বাস আলী খান	:	মাওলানা মওদূদী (র), কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খৃ. ।
মাহবুবুর রহমান	:	মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়, তৌহিদ ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮ খৃ. ।
মাহবুবুর রহমান মোরশেদ	:	বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৬ খৃ. ।
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	:	জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম, ইফাবা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮৬ খৃ. ।
ড. ইউসুফ উদ্দীন	:	ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ (মুহাম্মদ আব্দুল মতিন জালালাবাদী অনূদিত) ১ম খণ্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ. ।
অধ্যাপক কে. আলী	:	পাক ভারতের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭০ খৃ. ।
মোঃ ফখরুল ইসলাম	:	বৃহত্তম নোয়াখালীর ইতিহাস, নোয়াখালী, ১৯৯৮ খৃ. ।
A. Board of Researchers	:	Scientific Indiction in the Holy Quran, IFB, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

ড. আব্দুল কাদের	:	নোয়াখালীতে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯১ খৃ. ।
মাওলানা আতাহার আলী মোলা	:	গাজী মাওলানা ইমামুদ্দীন, নোয়াখালী সমিতি, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ. ।
মোঃ আব্দুস সাত্তার	:	ফরিদপুরে ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৩ খৃ. ।
আসকার ইবনে শাইখ	:	পীর দুদু মিয়া, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর, ১৯৮০ খৃ. ।
অধ্যাপক আব্দুল গফুর	:	মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ) (প্রবন্ধ)
ফকীর আব্দুর রশীদ	:	সূফী দর্শন, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৪ খৃ. ।
আব্দুল করিম	:	চট্টগ্রামে ইসলাম, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮০ খৃ. ।
এস. এম. জাফর	:	মুসলিম ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খৃ. ।
শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার	:	তাযকেরাতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ. ।
অনুবাদ মাওলানা শামছুল হক	:	সোবহানিয়া লাইব্রেরী, ইসলামপুর, ঢাকা, ১৯৬৪ খৃ. ।
অধ্যাপক মোজাম্মেল হক	:	রহুল আমীন প্রমুখ (অনু), সহীহ আল-বুখারী (৪র্থ খ.) আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২ খৃ. ।
আ. কা. মু. মুরশেদ	:	আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ খৃ. ।
আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন	:	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৮২ খৃ. ।
আনিসুজ্জামান	:	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৪ খৃ. ।
আবদুল মওদূদ	:	ওহাবী আন্দোলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫ খৃ. ।

Dhaka University Institutional Repository

আর.সি. মজুমদার	:	বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, তা.বি।
খান বাহাদুর আবদুল হাকিম	:	বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, (সম্পাদনা) ঢাকা, ১৯৭২ খৃ.।
খোন্দকার সিরাজুল হক	:	মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঃ সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ খৃ.।
ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান	:	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯ খৃ.।
ডক্টর সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	:	ইসলামের ইতিহাস, গোব লাইব্রেরী, ঢাকা ও বরিশাল, ১৯৮১ খৃ.।
নূর মোহাম্মদ আ'জমী (অনু)	:	মেশকাত শরীফ, ৭ম খণ্ড, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭ খৃ.।
মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ	:	আত্মজীবনী, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৫ খৃ.।
মুহম্মদ মমতাজ উদ্দীন (অনু)	:	ইরান ও ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯ খৃ.।
মোহাম্মদ বরকতুলাহ	:	পারস্য প্রতিভা, গেট ইষ্ট লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬০ খৃ.।
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়	:	ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা, বিশ্বভারতী গ্রন্থলয়, কলিকাতা, ১৩৫৬ বা.।
আল-গাযালী	:	কিমিয়ায়ে সা'আদত, (অনুবাদ), নুরুর রহমান, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৪ খৃ.।
মফিজুলাহ কবির	:	মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খৃ.।
মুফতী মুহাম্মদ শফী	:	খতমে নবুওয়াত, ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৮৬ খৃ.।
সৈয়দ সুলাইমান নদবী	:	পায়গামে মুহাম্মদী, (অনুবাদ), আবদুল মান্নান তালিব চট্টগ্রাম, খেদমত কমিটি, ১৯৬৮ খৃ.।
সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ	:	(পরিশিষ্ট) ই.ফা.বা, ১৯৮৫ খৃ.।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন	:	শিক্ষাও উন্নয়ন ঃ উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি, ঢাকা, ১৯৯১ খৃ. ।
মোঃ ফজলুল রহমান আশরাফী	:	বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা, ঢাকা, ১৯৯৯ খৃ. ।
আবদুল মান্নান তালিব	:	(অনুবাদ) রিযাদুস সালেহীন, ঢাকা, ১৯৮৬ খৃ. ।
ড. মুহাম্মদ শফিকুলাহ	:	উলূমূল কুরআন, (১ম খণ্ড) রাজশাহী, ২০০১ খৃ. ।
মাওলানা মোঃ দ্বীন	:	শরীঅত ও তরীকত, অনুবাদ আব্দুল মজিদ ঢাকুবী, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৪ খৃ. ।
মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ	:	কোরআন পরিচয়, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ), ১৯৬২ খৃ. ।
মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ	:	নবী পরিচয়, ঢাকা (প্রথম সংস্করণ) ১৯৬২ খৃ. ।
ড. মজির উদ্দীন মিয়া	:	বাংলাদেশের গবেষণা পত্রিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২ খৃ. ।
মওদুদ আহমদ	:	বাংলাদেশের ঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৮ খৃ. ।
Dr. Shaikh Gulam	:	Islarni Attitude towards non Muslims. Rajshahi Printing Works. Rajshahi, 1952.
Muqsud Hilali	:	Islamic Fundation Bangladesh,Dhaka. 1989.
Iran and Islam	:	Arabic Literature, Clarendon press,Oxford, 1963
H.A.R. Gibb	:	Arabic Literature, Clarendon press,Oxford, 1963.
WAV. Hunter	:	The Indian Musalmans. (Rpt),
Hafiz Ghulam Sarwar	:	Muhammad the Holy Prophet, Lahore Muhammad Ashraf, n.d.

Dhaka University Institutional Repository

A.M.D. Spranger	:	The life of Muhammad, Allahabad Presbyterion Mission, 1851.
Dr. Yusuf Abbasi	:	The History of Tabari (Tarik al-Rusul Wal-Muluk)" Ed. Muhammad.
Niser Ahmed Faruqi	:	Islamic Studies, vol. 26, No. 1, Islamic Research Institute, Islamabad, 1987.
Khalid Masud	:	"Early Muslim Historiograph", Islamic Culture, The Islamic Culture Board, Vol. 54, No. 4, Hyderabad, 1980.